মনি সিংহ

দর্শন ও রাজনীতি

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

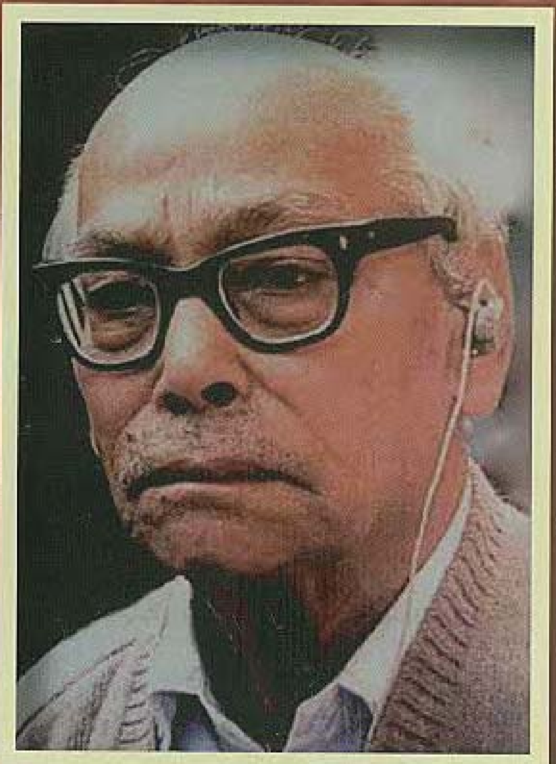

অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষাই সম্ভবত বাঙালি জাতিকে শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। তবে সুসংগঠিত আকারে শুরু হয় বিংশ শতাব্দির প্রাক্কালে কমিউনিস্ট পার্টির নের্তৃত্বে। শুরুতে এই গণ-আন্দোলনগুলো ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু সরকার ও সামন্ত শ্রেণীর নির্যাতনের কারণে কখনো কখনো তা সশস্ত্র রূপ নিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে মুক্তির স্বপ্নে বিভোর বাঙালি জাতির পূর্ব বাংলাবাসীর একাংশ পাকিস্তানী শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁদের এই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। মুক্তিপাগল জনতা ১৯৭১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসে। এরপরও কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসেনি। সামরিক বাহিনীর বন্দুকের নিশানায় গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বারংবার। স্বৈরতন্ত্র এসে এদেশের সমাজব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে। ধ্বংস করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। তারপরও থমকে যায়নি মুক্তিপাগল জনতা। গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটিয়েছে উর্দি পরা তথাকতিথ গণতন্ত্রের। কিন্তু তারপর? নব্বই পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্রের পোষাকে গড়ে ওঠা এই দলতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে...

গ্রন্থটিতে মণি সিংহের জীবন, দর্শন ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একইসাথে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামল এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংগ্রাম, উপমহাদেশ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমকালীন রাজনীতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। একইসাথে দীর্ঘ সাত দশক ধরে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত একজন নেতা, সংগঠক ও কমিউনিস্ট হিসেবে মণি সিংহের অবদানের মূল্যায়ন করা হয়েছে। গ্রন্থটি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা মণি সিংহ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং বাংলার মুক্তিপাগল জনতার বিভিন্ন গণ-আন্দোলন সম্পর্কে অনেক নতুন দিক উন্মোচন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মণি সিংহ
দর্শন ও রাজনীতি

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

shrabon

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রবীন আহসান

পৃষ্ঠা বিন্যাস
বিবেকানন্দ জয়ধর

শ্রাবণ প্রকাশনী
১৩২ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। ফোন : +৮৮ ০১৭১৫৭৫১১১৭

মূল্য : ৭০০ টাকা
Price € 20

ISBN : 978-984-92017-2-4

Moni Singha : Philosophy and Politics
by **Dr. Md. Mostafizur Rahaman**
Published by Shrabon Prokashoni
132, Aziz Supar Market (1st floor) Shahbag, Dhaka-1000
Cell : +88 01715751117
www.boinews24.com\category\shrabon-publication
www.shrabonbooks.com
shrabonbooks@gmail.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদু

মৌলভী কছিমুদ্দীন আহমেদ

যিনি কমিউনিস্ট ও নক্সালবাড়ী আন্দোলনের জন্য
১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে তৎকালীন
পূর্ব পাকিস্তানে পুনর্বাসিত হয়েছিলেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মণি সিংহ বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি অবিস্মরণীয় নাম। মূলত তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ লাভ করেছিল। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই দলের সাথে জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল মণি সিংহের হাত ধরে। দীর্ঘ সাত দশক তিনি বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নতুন প্রজন্মের অনেকেই হয়ত মণি সিংহ সম্পর্কে খুব বেশি অবগত নয়। পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির অবদানের কথাও আজ আমরা অনেকেই জানি না।

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে প্রচুর গবেষণা কর্ম ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তার নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে গবেষণা কর্ম নেই বললেই চলে। মূলত আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে আমি এই গবেষণাটি শুরু করেছিলাম। গ্রন্থটিতে উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সাথে একজন নেতা, সংগঠক ও কমিউনিস্ট হিসেবে মণি সিংহের মূল্যায়নও করা হয়েছে। এটি মণি সিংহ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রশস্তিমূলক কোন রচনা নয়। গবেষণার যে সকল ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি ও মণি সিংহের সমালোচনা প্রয়োজন সেখানে তার যথাযথ সমালোচনাও করা হয়েছে।

গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আর্কাইভ-এ রক্ষিত দলিল, কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশিত ও প্রচারিত মূল দলিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার, প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে রক্ষিত দলিলপত্র ও বইসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমি অনেকের সহযোগিতা গ্রহণ করে তাদের কাছে ঋণী হয়েছি। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মর্ত্তুজা খালেদের নিকট, যাঁর দিক নির্দেশনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে আমার এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তির সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁদে সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান খান, বর্তমান সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সরদার ফজলুল করিম, হেনা দাস, অসিত বরণ রায়, আমজাদ হোসেন, মণি সিংহের পুত্রবধূ ডা. সাকী খন্দকার প্রমুখ। অধ্যাপক তাইবুল হাসান খান, মেসবাহ কামাল তথ্য-উপাত্ত দিয়ে এবং আরকাইভের সাবেক পরিচালক ড. শরীফ উদ্দীন আহম্মেদ গবেষণার মৌলিক উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সিপিআইএম-এর সাধারণ সম্পাদক বিমান বসু, প্রয়াত কমরেড নিবেদিতা নাগ সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। এছাড়া স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রয়াত অধ্যাপক ড. অমিতাভ চন্দ্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সুস্নাত দাস, আলীপুর লাইব্রেরির জয়ন্ত আচার্য, কলকাতা আর্কাইভসের রতন চক্রবর্তী প্রমুখ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার বাবা মোঃ আব্দুজ জাহের সরকার এবং মা মোছাঃ হালিমা বেগমের কথা যাদের উৎসাহ ও সহযোগিতার কারণে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমার বন্ধু শহীদ জিয়াউর রহমান শারীরিক শিক্ষা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ সালাম এবং আমার সাবেক সহকর্মী জাভেদ হুসেন গবেষণা ও গ্রন্থটি প্রকাশনার কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আর একজনের নাম উল্লেখ না করলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, তিনি আমার সহধর্মিণী শেখ নিলুফা ইয়াসমিন। যার নীরব সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা গ্রন্থটি প্রকাশে আমাকে প্রণোদনা দিয়েছে। আমার মেয়ে রেনেসাঁ রহমান, যার মায়া ভরা মুখ আর বিরামহীন দুষ্টুমি আমার সকল ক্লান্তি দূর করে দেয় সেও এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ১৯-৫২

মণি সিংহের শৈশব ও কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ ২০

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মণি সিংহের যোগদান ২০

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ও প্রসার ২৪

প্রবাসে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও ভারতে তার কার্যক্রম ২৬

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বাম রাজনীতিতে যোগদান ৩০

ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি গঠন ৩২

ইয়ং কমরেডস লীগ ও মণি সিংহ ৩৭

মণি সিংহের শ্রমিক রাজনীতি ১৯২৮-১৯৩০ ৪২

ক্লাইভ জুট মিল ৪৮

কলকাতার মেথর ও ঝাঁড়ুদার আন্দোলন ৪৮

চটকল আন্দোলন ৫১

ব্রিচ ওয়ার্কসপ হরতাল ৫২

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৩-৮২

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ৫৩

বাংলায় নতুন মাত্রার কমিউনিস্ট আন্দোলন ৫৬

বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম, ১৯৩০-১৯৩৫ ৫৭

ইউনাইটেড ফ্রন্ট নীতি ৬০

ময়মনসিংহের কৃষক আন্দোলন ৬১

টঙ্ক আন্দোলন ৬২

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ৬৬

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন, নলিতাবাড়ী ৬৯

নেত্রকোণার সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন ৭০

তে-ভাগা আন্দোলন ৭৩
টঙ্ক আন্দোলন (দ্বিতীয় পর্ব) ৭৫
১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ৭৮

তৃতীয় অধ্যায় ৮৩-১২০
কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস ৮৪
কংগ্রেস পরবর্তী পার্টি কার্যক্রম ও সঙ্কট ৮৬
কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র সংগ্রাম ৮৯
শেষ পর্যায়ের টঙ্ক আন্দোলন ৯১
নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ ৯৬
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ৯৯
রণদীভের রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তন ১০৬
ভাষা আন্দোলন ১০৯
১৯৫৪ সালের নির্বাচন ১১৬

চতুর্থ অধ্যায় ১২১-১৫২
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ১২১
অস্থিতিশীল গণতন্ত্র ১২৪
সামরিক শাসনের অভ্যুদয় ১৩১
সামরিক শাসনবিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভাবনা ১৩৩
ছাত্র আন্দোলন ১৩৭
ছয় দফা আন্দোলন ১৪০
পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তি ১৪২
১৯৬৮ সালের সম্মেলন ১৪৮

পঞ্চম অধ্যায় ১৫৩-১৮২
উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ১৫৩
গণ-অভ্যুত্থানত্তোর কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম ১৬১
১৯৭০ সালের নির্বাচন ১৬৬
নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির ভাবনা ১৬৯

৭ মার্চ ও পরবর্তী কয়েকদিন ১৭১
মুক্তিযুদ্ধ ও কমিউনিস্ট পার্টি ১৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৮৩-২১৪
বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ১৮৩
গঠনমূলক সমালোচনা ও সহযোগিতার রাজনীতি ১৮৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ১৯৫
১৯৭৩ সালের নির্বাচন ২০০
কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ২০২
১৯৭৪ সালের জাতীয় সঙ্কট ২০৫
বাকশাল গঠন ও কমিউনিস্ট পার্টি ২১০

সপ্তম অধ্যায় ২১৫-২৪৮
সামরিক শাসন ও কমিউনিস্ট পার্টি ২১৬
কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস ২২২
সরকারবিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা ২২৫
জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন ২২৬
কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস ২৩২
এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ২৩৪
পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২৩৯
মণি সিংহের জীবনের শেষ দিনগুলো ২৪১

শেষ কথা ২৪৯

পরিশিষ্ট ২৫৫-৩৮৬
সংযোজনী-১ ২৫৫
১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের আহ্বান সম্বলিত প্রচারপত্র
সংযোজনী-২ ২৬৫
১৯৫০ সালে পুলিশ কর্তৃক ইলামিত্র নির্যাতিত হবার পর কোর্টে দেওয়া জবানবন্দির লিফলেট

সংযোজনী-৩ ২৬৮

ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত দলিলপত্র

সংযোজনী-৪ ৩০৭

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৬৮ সালের কংগ্রেসের রিপোর্ট

সংযোজনী-৫ ৩৩৭

মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত দলিলপত্র

ক) হানাদারদের খতম করুন! বাংলাদেশকে মুক্ত করুন!!

খ) গেরিলা যোদ্ধাদের অবশ্য পালনীয় নীতিমালা

গ) মুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্য পালনীয় রাজনৈতিক নীতিমাল

সংযোজনী-৬ ৩৪৬

১৯৭২ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট

সংযোজনী-৭ ৩৬৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা, ১৯৭২

সংযোজনী-৮ ৩৬৮

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর্যালোচনা রিপোর্ট

গ্রন্থপঞ্জি ৩৮৭

নির্ঘন্ট ৪১৩

আলোকচিত্র ৪১৭

ভূমিকা

সুপ্রাচীন কাল থেকে সম্পদের বৈষম্য ও অসম সামাজিক বিন্যাস দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তার বিষয়বস্তু হয়েছে। সেই সাথে তাঁরা এর অবসান ঘটানোর উপায় নিয়ে ভেবেছেন এবং বিভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো সামাজিক সমতা বজায় রাখার বিষয় চিন্তা করতে গিয়ে রচনা করেন 'রিপাবলিক'। এখানে নাগরিকদের বিভক্ত করে প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী শাসক, কর্মী বা যোদ্ধা শ্রেণির দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব করেছেন। মধ্যযুগে খ্রিস্টান মঠের সন্ন্যাসীগণ ভূমি ও ব্যবহার্য জিনিস ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতেন। মঠ সন্ন্যাসীগণ মনে করতেন ব্যক্তিগত সম্পদের চিন্তা মানুষকে ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক টমাস মুর সামাজিক বৈষম্যহীন এক আদর্শ সমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন তার গ্রন্থ 'ইউটোপিয়া'তে (১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ)। এখানে দেখা যায়, সমাজের সকল মানুষ তাদের সম্পদ নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগাভাগি করছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ডিগার (Diggers) নামের পিউরিট্যান্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পদকে মানুষের অনিষ্টের মূল হিসেবে চিহ্নিত করে ভূমির উপর ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ দাবি করেছিল। অষ্টাদশ শতকজুড়ে ইমানুয়েল ক্যান্ট ও রুশোর মতো দার্শনিকগণ তাদের দর্শনে প্রচার করেছেন সম্পদ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব ফরাসি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের সাথে সাথে তা মানুষের সমতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই সাথে এই বিপ্লব সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণী তুলে ধরেছিল। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম নেতা ফ্রান্সিস নয়েল বাবুফ (François Noël Babeuf, 1760-1797) এ মত তুলে ধরেন যে, ফ্রান্সের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পদ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকতে হবে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বাইফকে গিলোটিনে হত্যা করা হলেও তার দর্শন বাবেইজম (Babouvism) নামে পরিচিত হয় এবং তা উনিশ শতকের ফরাসি ও ইতালীয় চিন্তাবিদদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং তা দ্রুত সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে বড় বড় কল কারখানার সাথে সাথে গড়ে ওঠে নতুন নতুন শহর। সমাজে সৃষ্টি হয় সম্পদশালী শিল্পপতি ও দরিদ্র

শ্রমিক শ্রেণি। সামাজিক বৈষম্য ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হতে থাকে। সেই সাথে শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা দূর করার চিন্তাও শুরু হয়। জন্ম নেয় সমাজতন্ত্রী দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির। এ পর্যায়ে সমাজতন্ত্রী লুই ব্যাঙ্ক (১৮১১-১৮৮২), শ্রমিকদের দরিদ্রতা দূর করার উপায় হিসেবে তাদের সংগঠন গড়ার উপর গুরত্ব আরোপ করেন।

পরবর্তীকালের চিন্তাবীদ লুই অগাস্টো ব্লাঙ্কি (১৮০৫-১৮৮১) সাম্যবাদী চিন্তার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেন এই তত্ত্ব যোগ করে যে, শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব সফল করার জন্য প্রয়োজন তাদের পক্ষ সমর্থনকারী একদল বুদ্ধিজীবী ও সংগঠনকারী কর্মীর। লুই ব্যাঙ্ক ও অগাস্টো ব্যাঙ্কো উভয়ে ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটনকে প্রভাবিত করেছিল যা পুনঃস্থাপিত ফরাসি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। পরবর্তীতে পূর্ববর্তী দর্শন ও দার্শনিকদের চিন্তাধারার সাথে নিজের চিন্তার সমন্বয় করে জার্মান দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কস প্রণয়ন করেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো এবং সেই লক্ষ্যে সমাজকে অগ্রসর করার জন্য সংগ্রামের রূপরেখা। কার্ল মার্কস তার তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলেন, কারণ পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতো তিনি শুধু শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা বর্ণনা করেই থেমে থাকেন নি বরং এই বঞ্চনা ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে কিভাবে যথার্থ সাম্যবাদী সমাজ গড়া যাবে তার রূপরেখাও প্রণয়ন করেন। এ কাজে সহযোগী হিসেবে কার্ল মার্কস লাভ করেন বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলসকে।

কার্ল মার্কস স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্ব বিপ্লবের। সারা বিশ্বের নির্যাতিত প্রলেতারিয়েত শ্রেণি ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষক বুর্জোয়াতন্ত্রের অবসান ঘটাবে। কোন নির্দিষ্ট দেশে এককভাবে যে শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করে সেখানে শ্রমিক রাজ কায়েম করতে পারে তা ভাবেন নি তিনি। আর তার এ বিপ্লব প্রচেষ্টাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেল ইউরোপে শ্রমিক সংগঠন গঠন ও তাদের নিয়ে আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করেছেন। কার্ল মার্কস সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য গঠন করেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক। প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠিত হয় ১৮৬৪ সালে লন্ডনে। পরবর্তীতে ১৮৮৯ সালে এঙ্গেলসের প্রচেষ্টায় প্যারিসে গঠিত হয় দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক যা ১৯১৬ সাল পযর্ন্ত টিকে ছিল।

মার্কসের বিপ্লব প্রচেষ্টা সফল না হলেও তার মতানুসারী ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) সফল করেন মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিক শ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। মার্কসীয় তত্ত্বে অনেক নতুন তত্ত্ব যোগ করলেও লেনিন তার কৃতিত্ব

নিজে না নিয়ে তা মার্কসবাদের বিকশিত রূপ বলে অভিহিত করেছেন ও তার কৃতিত্ব মার্কসকেই প্রদান করেছেন। লেনিন মার্কসীয় তত্ত্বের বাইরে গিয়ে বিশ্ব বিপ্লবের পরিবর্তে একদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেন। তবে তিনি বিশ্ব বিপ্লবের ধারণা ত্যাগ করেন নি। মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী অত্যাসন্ন বিশ্ব বিপ্লব সফল করার জন্য ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে গঠন করেন তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক।[১] এই আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালের জুলাই থেকে আগস্ট মাসে মস্কোতে। সম্মেলনে যোগ দেন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায় বা এম এন রায়। তিনি কংগ্রেস শেষে গঠন করেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও এম এন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৯২০-এর দশকে অবিভক্ত বাংলাসহ ভারতবর্ষে গড়ে উঠে কমিউনিস্ট আন্দোলন।

অবশ্য ভারত ও তার জনগণ বরাবরই ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস বরাবরই আগ্রহ দেখিয়েছেন ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে। ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে কার্ল মার্কস ২৩টি এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ৮টি প্রবন্ধ রচনা করেন। এসব লেখায় তাঁরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অপশাসন ও ভারতে তার প্রভাব পর্যালোচনা করেছেন। মার্কস তার আলোচনায় দেখিয়েছেন ভারতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা যা সুপ্রাচীন কাল থেকে টিকে ছিল, ব্রিটিশগণ তাঁদের উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে নৃশংসভাবে তা ভেঙ্গে ফেলছে।[২] অবশ্য মার্কস ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের সমালোচনা ছাড়া ভারত সম্পর্কে আশাবাদও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভেঙ্গে পড়া ভারতীয় উপমহাদেশকে ব্রিটিশ শক্তি একত্রিত করে এক গঠনমূলক কাজ করেছে। ভারতের পশ্চাৎপদ সামন্তবাদী সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে ফেলে তাকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ও তার ঘটনা প্রবাহের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন। মার্কস আমেরিকার প্রগতিশীল সংবাদপত্র *New York Daily*

---

১. Degras, Jane (ed.) *Communist International 1919-1943*, Vol. I. (Honolulu: University of Hawaii Press, 1989), p. 2-3.

২. Marx, Karl, "The British Rule in India" *The First Indian War of Independence, 1857-1859*, (Moscow: Progress Publishers, 1988), p. 8-9.

Tribune-এ ভারতীয় এই বিদ্রোহ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখেছেন। এসকল লেখায় মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ও ব্যর্থতার কারণ এবং ভারতের উপর তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে পর্যালোচনাও করেছেন। ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহকে মার্কস ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন।[৩] শেষে মার্কস ও এঙ্গেলস আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি ভারতীয়দের যে ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে তার চূড়ান্ত পরিণতিতে একসময় এই শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।

কার্ল মার্কসের মতো লেনিনও ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কাঠোর সমালোচনা করে এ সম্পর্কে লিখেছেন, "There is no end to the acts of violence and plunder which go under the name of the British system of Government in India. No where in the world will you find such abject mass poverty, such chronic starvation among the people"[৪] এভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্থপতিগণ গভীর আগ্রহের সাথে ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এখানে বিপ্লব সংঘটনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন।

তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার পর তা ভারতীয় কমিউনিস্টদের বিপ্লব সংঘটনের পথনির্দেশ প্রদান করেছিল। ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্ত উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করে গেছেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তাত্ত্বিকেরা। ১৯৪৩ সালের ১৫ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতি জনিত কারণে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বিলোপ করা হয়।[৫] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর এক সম্মেলনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পরিবর্তে গঠন করা হয় 'Communist Information Bureau' যা ছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিকল্প। ১৯৫৬ সালে যোসেফ স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত কমিউনিস্ট

---

৩. Marx, Karl, *"The Revolt in the Indian Army," Ibid.* p. 33-34.

৪. Lenin, V.I., "Thesis for a Report on the Tactics of the R.C.P. to the Third Congress of the Communist International" in On Colonialsm (Moscow: Progress Publishers, 1976), p. 33.

৫. "Comintern " in Wikipedia, the free encyclopedia in Internet

পার্টির বিশতম কংগ্রেসে এ সংগঠন বাতিল করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে তত্ত্ব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতের সত্যিকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা কি? এ দেশে বিপ্লব ঘটাতে কাদের সমন্বয়ে করতে হবে? সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনের ক্ষেত্রে কারা শত্রু, কারা মিত্র আর কারাই বা সহযোগী মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হবে? এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের ভূমিকা কি হবে? বিপ্লব সংঘটনের পথে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সহায়ক না বৈরী শক্তি? কংগ্রেসকে সাথে নিয়ে না একা বিপ্লবের পথে এগোতে হবে প্রভৃতি বিষয় ছিল কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদদের চিন্তার বিষয়বস্তু। ১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক বি টি রণদীভ বিশ্ব বিপ্লব আসন্ন- এই সম্ভাবনার কথা বলে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে যান সশস্ত্র বিপ্লবের পথে। বিপ্লব সংঘটনে ব্যর্থ হয়ে দুই বছর পরে কমিউনিস্ট পার্টি ফিরে আসে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে।

পঞ্চাশের দশক থেকে উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্ব আর তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নি। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসে এবং ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা অধিকার করায় সচেষ্ট হয়। তার পরও অবশ্য ষাটের দশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবে উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

পঞ্চাশের দশকের পূর্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার নেতা যোসেফ স্ট্যালিন। ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় চীনে। ১৯৫৩ সালে যোসেফ স্ট্যালিনের মৃত্যু এবং ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নিঃস্ট্যালিনীয় নীতি (De-Stalinization) এবং বিশ্বে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্বের সাথে একমত হতে পারেনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টি। চীন ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব গভীরভাবে প্রভাবিত করে উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে। এই দুই কমিউনিস্ট পার্টির বিভেদ বিভক্ত করে বাংলাদেশসহ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে। দুই দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে চীনপন্থী ও সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভক্ত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মণি সিংহ ছিলেন সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতা। এই দুই দেশের অনুসারী কমিউনিস্টগণ জাতীয় ইস্যুগুলোকে দেখতে থাকেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট

আন্দোলনের প্রেক্ষিত বিচার করে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি তাকে জনযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করলেও অধিকাংশ চীনপন্থী কমিউনিস্টগণ তাকে 'সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী দুই কুকুরের যুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করে।[৬] বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৪ সালে তারা তাদের ভুল সংশোধন করে এ দেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ও তার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলে মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের এ কাজে সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হলে বাংলাদেশের অর্জিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সেনা শাসন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে।

উপরিউক্ত রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ সাত দশকেরও অধিককাল ধরে কমিউনিস্ট রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন এ আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মণি সিংহ। ১৯০১ সালে বিত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী মণি সিংহ প্রথম জীবনে ১৯১০-এর দশকে সম্পৃক্ত হন সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সাথে। পরে মার্কসবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন করার মাধ্যমে দীক্ষিত হন কমিউনিস্ট রাজনীতিতে। ১৯২০-এর দশকে তিনি কলকাতার শ্রমিক আন্দোলনের সাথে জড়িত হন এবং একপর্যায়ে কারারুদ্ধ ও দণ্ডিত হন। জেল থেকে মুক্তির পর সরকার তাকে নজর বন্দি করে রাখে তার গ্রামের বাড়ি তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার সুসং-দুর্গাপুর গ্রামে। এখানে অবস্থানকালে তিনি দরিদ্র কৃষকদের উপর সামন্ত প্রভুদের শোষণ দেখে এলাকায় শুরু করেন কৃষক আন্দোলন যা টঙ্ক আন্দোলন নামে পরিচিত। অবশ্য ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টি এ দেশের কৃষকদের সংগঠিত করে দেশে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির এ কাজে সাফল্যও এসেছিল। টঙ্ক, তে-ভাগা, নানকার প্রভৃতি

---

৬. পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) চিঠি নং-৫, জুলাই ৩০, ১৯৭১ উদ্ধৃত হয়েছে (১) আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, (ঢাকা: পড়ুয়া, মার্চ ১৯৯৭), পৃ,৭৪-৭৫।

নামে পরিচিত বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনগুলোর সবই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা সংঘটিত কৃষক আন্দোলন।

পাকিস্তান সৃষ্টি ও জমিদারি প্রথার বিলোপের পর সশস্ত্র আন্দোলনে সাফল্য না আসায় ১৯৫০-এর দশকে বাংলার রাজনীতিতে কৃষক ও কৃষক আন্দোলনের গুরুত্ব কমে যায়। এ ছাড়া নবসৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী একের পর এক বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উপর হামলা চালায়। ফলে এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্ব শর্ত হিসেবে গণতান্ত্রিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।[৭] পাকিস্তানি শাসনামলে কমিউনিস্ট পার্টি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বল্প সময়ের জন্য অর্থাৎ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে গঠনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৫ সালে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর আবারও নির্যাতনের খড়গহস্ত নেমে আসে কমিউনিস্ট পার্টির উপর। ১৯৭৫ সালের পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি সেনা শাসন মুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে জড়িত থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির এ সকল কর্মকাণ্ডের সাথে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন দলের নেতা ও সভাপতি কমরেড মণি সিংহ।

পাকিস্তান সৃষ্টি পর্যন্ত মণি সিংহ কৃষক আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৫০ সালে আত্মগোপনে থেকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে পরিচালনা করেছেন। ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের সাথে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের অন্যতম এক রূপকার ছিলেন তিনি। ১৯৬৭ সালে হঠাৎ করে গ্রেপ্তার হন মণি সিংহ। পরবর্তীতে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের সাথে তাকে মুক্তি দেয়া হলেও ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসে মহান এই নেতার নেতৃত্বে কয়েদিরা রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে ফেলে। জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর তিনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতে অবস্থানকালে মণি সিংহ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের

---

৭. ড. মর্তুজা খালেদ, *বাংলাদেশের বাম রাজনীতি: রাজশাহী জেলা ভিত্তিক একটি সমীক্ষা* ১৯২০-২০০০, (অপ্রকাশিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ, অক্টোবর, ২০০৫), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত গবেষণা প্রকল্প রিপোর্ট, পৃ.৬৮।

উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে সেনা শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ করে রাখে। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি আবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হন। দীর্ঘ জীবনের অধিকারী মণি সিংহ ১৯৮৪ সালের পর থেকে বার্ধ্যকজনিত কারণে অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও দলের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে তাকে অবহিত করে ও তার মতামতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। ১৯৯০ সালের ৩১ ডিসেম্বর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অবসান ঘটে এই দীপ্ত কমিউনিস্ট রাজনৈতিক জীবনের।

গ্রন্থটিতে উপমহাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সাথে একজন নেতা, একজন সংগঠক ও একজন কমিউনিস্ট হিসেবে মণি সিংহের দর্শন এবং তিনি যে সকল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন তারও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এটি মণি সিংহ সংক্রান্ত প্রশস্তিমূলক কোন রচনা নয়। যে সকল ক্ষেত্র মণি সিংহের সমালোচনা করার দাবি রাখে সেখানে তার যথাযথ সমালোচনাও করা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভ-এ রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ, কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত মূল দলিল, কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার, সমসাময়ীককালে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে রক্ষিত দলিলপত্র ও বইসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে ভারতে যথেষ্ট গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তার নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে গবেষণামূলক রচনা নাই বললেই চলে। এই গ্রন্থটি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মণি সিংহ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক নতুন দিক উন্মোচন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রথম অধ্যায়

অগ্নিগর্ভা এই বাংলার মাটিতে যুগে যুগে কত বীর সন্তানের জন্ম হয়েছে তার হিসাব মেলানো প্রায় অসম্ভব। যদি আমরা কেবলমাত্র বিগত শতকের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসের উপর চোখ রাখি তবে চোখের সামনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একগুচ্ছ সংগ্রামী নায়কের নাম ভেসে ওঠে। আর এই সংগ্রামী নায়কদের মধ্যে কমরেড মণি সিংহ ছিলেন অন্যতম। তিনি সমগ্র বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। মূলত তার হাত ধরে বাংলা ও বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। গত শতাব্দীর অধিকাংশ সময় (দীর্ঘ ৭ দশক) তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের শোষিত-নিপীড়িত মেহনতি মানুষের চূড়ান্ত মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

মণি সিংহের কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রবেশ ও রাজনীতিতে হাতে খড়ি ঘটে ১৯২৬ সালে গঠিত ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির মাধ্যমে। ১৯২০-এর দশকে সমগ্র বাংলায় যে উত্তাল আন্দোলন শুরু হয় তার সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন কলকাতায় অধ্যয়নে আসা এই তরুণ। দেশমুক্তির জন্য তিনি প্রথমে যোগ দিয়েছিলেন সন্ত্রাসমূলক সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশমুক্ত করার নীতিতে বিশ্বাসী অনুশীলন দলে। কিন্তু অনুশীলন দলের সন্ত্রাসী তৎপরতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন তিনি। এসময় তার মার্কসবাদী দর্শন অধ্যয়ন ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২০-এর দশকে অবিভক্ত বাংলায় সরকারের নির্যাতনের মুখে রাজনীতি পরিচালনার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি গঠন করেন। পরবর্তীতে এই পার্টির মাধ্যমে কলকাতার শিল্পাঞ্চলে বেশ কিছু শ্রমিক ধর্মঘট গড়ে তোলেন। ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির সদস্য হিসেবে মণি সিংহ কলকাতার এই শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং মাটিয়াবুরুজের শ্রমিক আন্দোলনসহ বেশ কয়েকটি আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন।

মণি সিংহের শৈশব ও কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ

১৯০১ সালের ২৮ জুলাই কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে মণি সিংহ জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতা ও মাতার নাম ছিল যথাক্রমে কালীকুমার সিংহ ও সরলাদেবী।[২] মাত্র আড়াই বছর বয়সে ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মণি সিংহের পিতা মৃত্যুবরণ করেন। ফলে পরিবারটি অনেকটাই অভিভাবক ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এমতবস্থায় মাতা সরলাদেবী শিশু মণি সিংহকে নিয়ে ঢাকায় তাঁর ছোটভাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেণ সিংহের বাসায় বসবাস শুরু করেন। মণি সিংহের পিতৃকূল আর্থিক দিক দিয়ে বিত্তশালী না হলেও মাতৃকূল ছিল সম্পদশালী। মণি সিংহের মাতামহী ছিলেন নেত্রকোণা জেলার সুসং-দুর্গাপুরের জমিদার বংশের মেয়ে। পৈতৃকসূত্রে সরলাদেবী যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন।[৩] এরই প্রেক্ষিতে ১৯০৮ সালে মণি সিংহের সাত বছর বয়সে তার মা সন্তানসহ সুসং-দুর্গাপুরে বসবাস শুরু করেন। ঢাকাতে অবস্থানকালে বালক মণি সিংহ তার মা ও মামার কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শুরু করলেও স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা জীবন শুরু করেন ১৯০৯ সালের প্রথম দিকে সুসং-দুর্গাপুরের একটি বিদ্যালয়ে। সেখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষার পর্ব শেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কলকাতায় যান।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মণি সিংহের যোগদান

বাংলার ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অভ্যুদয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভ্যুদয় ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে তা তীব্র আকার ধারণ করে। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন ও এই দলের অনুনয় বিনয়ের নীতিতে হতাশ হয়ে পড়ে ভারতীয় জনগণের একটি বড় অংশ। বাংলায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতির প্রতি হতাশ তরুণগণ সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পথ বেছে নেয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের এই অংশকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে।[৪]

---

১. মণি সিংহের পুত্র ডা. *দিবালোক সিংহের* সাক্ষাৎকার, ১০ অক্টোবর, ২০০১।

২. *ঐ*।

৩. *দৈনিক সংবাদ*, ২৮ জুলাই, ২০০০।

৪. মুজফফর আহমেদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি*, প্রথম খণ্ড, ১৯২০-১৯২৯, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৮), পৃ, ২৮।

বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল একটি গোপন আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই এই দলটি গড়ে উঠলেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাদের বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং দেখা যায় যে, বাংলাদেশ থেকেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দানা বেঁধে উঠেছিল। বাংলার শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল তার উর্বর ক্ষেত্র। বাংলার বাইরেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা চলছে, কিন্তু বাংলার মত কোথাও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ হতে বিপ্লবীরা বিশেষ প্রেরণা লাভ করতেন। এর মূলমন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গান।

বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন, এ কথা যেমন সত্য সেইসাথে এ আন্দোলন ছিল হিন্দুত্ববাদ উত্থানেরও একটি আন্দোলন। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।[৫] জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীগণ ধর্ম থেকে ধর্মীয় আবরণে এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আন্দোলনকারীদের প্রার্থনা সঙ্গীত ছিল নিম্নরূপ :

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে
ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী।"[৬]

১৯১০-এর দশকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ঢাকা, সোনারগাঁ, বিক্রমপুর, নরসিংদী, খুলনা, যশোহর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার যুবক এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। এই বিপ্লবী আন্দোলন বিভিন্ন দল ও গ্রুপে বিভক্ত ছিল এবং এই দলগুলো কখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সংগঠনে আবদ্ধ হতে পারেনি। সকল দলেরই উদ্দেশ্যে ছিল ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করা, কিন্তু জনসাধারণের বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। তাঁরা ব্রিটিশ বিতাড়িত করার জন্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। বিপ্লবীরা আশা করতেন, জনসাধারণ তাদের কার্যকলাপ অন্ধভাবে সমর্থন করবে এবং তাদের কাজের জন্য জনসমর্থনের প্রয়োজন আছে বলে তারা

৫. মুজফফর আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৩০।
৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *আনন্দমঠ*, (প্রকাশক কিংবা প্রকাশনীর নাম উল্লেখ নেই, প্রকাশকাল, ১৮৬৫), পৃ, ৮৫।

মনে করতেন না।[৭] হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে, বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে তাঁদের কাজ প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ, অত্যাচারী সরকারি কর্মচারীদের হত্যা, সংগঠন গড়ে তোলা এবং ডাকাতির মাধ্যমে অস্ত্রের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা প্রভৃতি কার্যকলাপের মধ্যে তাঁদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। জনসাধারণের সাথে কোন সম্পর্ক না থাকায় তাঁদের সংগঠন গড়ার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত গোপন ও ষড়যন্ত্রমূলক। সাহস, ত্যাগ এবং সাংগঠনিক দক্ষতার কোন অভাব তাঁদের ছিল না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের এভাবে ব্রিটিশ বিতাড়নের চেষ্টা সাফল্যের দিকে বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ফলে কর্মীদের একটি অংশের মধ্যে বিপ্লবের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে।[৮]

১৯২০-এর দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে ধারণার পরিবর্তন শুরু হয়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা জার্মানির পক্ষাবলম্বন করে এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতবর্ষে একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কাছে এ খবর পৌঁছে যাওয়ায় তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই আন্দোলনের মূলে ছিল দুটি সংগঠন যথা যুগান্তর ও অনুশীলন।[৯]

সন্ত্রাসবাদীরা এই আন্দোলন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে চালিত করে বেশ সফলতা লাভ করে। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করার পরও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম বন্ধ করেনি। কারণ, তাদের এই সংগ্রাম ছিল মূলত ব্রিটিশ বিরোধী ও স্বাধীনতা অর্জনের এক সংগ্রাম।[১০]

সুসং-দুর্গাপুরে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শেষ করে ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে মণি সিংহ মাধ্যমিক শিক্ষার আশায় কলকাতা গমন করে। এ সময় কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল বেশ উত্তপ্ত। একদিকে বঙ্গভঙ্গ রদ, জাতীয়তাবাদী

---

৭. রণেন সেন, *বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮)*, (কলকাতা : বিংশ শতাব্দী, ১৯৮১), পৃ, ১১৬।
৮. অমিতাভ চন্দ্র, *অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন (সূচনা পর্ব)*, (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯২), পৃ, ১৫।
৯. *লাঙ্গল*, ২৮ জানুয়ারি, ১৯২৬।
১০. মুজফ্ফর আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৭-৩৮।

আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর উত্থান, মুসলিম লীগের ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রচেষ্টা প্রভৃতি যখন সমগ্র পরিস্থিতিকে ক্রমেই উত্তপ্ত করে চলছিল তখন অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার চরম দমননীতি ও নির্যাতনের মাধ্যমে এই আন্দোলনগুলোকে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা চালায়। কলকাতার এই রাজনৈতিক অবস্থা মণি সিংহের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং ক্রমেই তার মনে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা তীব্র হতে থাকে। ১৯১৪ সালের শেষ দিকে মণি সিংহ মাত্র তের বছর বয়সে তৎকালীন বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল অনুশীলনে যোগদান করেন এবং ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে শুরু করেন।[১১] এভাবে রাজনীতিতে হাতে খড়ি ঘটে মণি সিংহের।

১৯২১ সালে সমগ্র ভারতব্যাপী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন ভারতব্যাপী এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি করে। যুবক মণি সিংহ ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী মনোভাব থেকে ওই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন, কিন্তু অনুশীলন দলের পক্ষ থেকে বলা হয় "সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া অহিংস উপায়ে ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করা যাবে না। অহিংসা প্রচার করে বিপ্লবের চেতনাকে খর্ব করা হচ্ছে কাজেই এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া যথার্থ নয়।"[১২] অনুশীলন দলের পক্ষ থেকে *হককথা* নামে এক ইশতেহার ছাপিয়ে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু আন্দোলনের জনপ্রিয়তা মণি সিংহের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিনি এ সময় স্বাধীনতার জন্য অনুশীলন দলের অনুসৃত নীতি নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন। শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকারের কিছু কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে হত্যা করে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয় বলে তাঁর মনে হতে থাকে।[১৩]

খেলাফত আন্দোলনে অনুশীলন দলের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে মণি সিংহ ভীষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন এবং সরাসরি জনগণের মধ্যে কাজ করার মনস্থির করেন। বিষয়টি নিয়ে অনুশীলন দলের সদস্য উপেন সান্যালের সাথে আলোচনা করেন এবং তাকে সাথে নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার আদিবাসী হাজং সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন কল্যাণকর কাজ শুরু করেন। হাজং সম্প্রদায়ের

---

১১. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম (প্রথম খণ্ড)*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ, ২৭।
১২. কমরেড নিবেদিতা নাগের সাক্ষাৎকার, জুলাই ৩০, ২০০১।
১৩. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৭।

শিশুদের শিক্ষার জন্য ময়মনসিং জেলা অনুশীলন সমিতির সহায়তায় হাজং এলাকায় কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তাদের পূজা-অর্চনা করার জন্য পুরোহিত সংগ্রহ করে দেন। এ সকল জনকল্যাণকর কাজ করার সময় ১৯২৫ সালে মণি সিংহের সাথে পরিচয় ঘটে সুসং-দুর্গাপুরের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন পোস্ট মাস্টার সুরেশ চন্দ্র দে-র সাথে। তিনি মণি সিংহকে গোপেন চক্রবর্তী নামের মস্কো ফেরৎ এক কমিউনিস্ট কর্মীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। গোপেন চক্রবর্তীর সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর মণি সিংহ ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হন।[১৪]

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ও প্রসার

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং এর ফলে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার এই বিপ্লবের প্রকৃত খবর যেন ভারতবর্ষে আসতে না পারে সে জন্য ব্রিটিশ সরকার কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, সেই সঙ্গে লেনিন ও সোভিয়েত নেতাদের বিরুদ্ধে নানান ধরনের কুৎসা ও অপপ্রচার চালানো শুরু হয়। বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলোও এই বিপ্লবের প্রতি তেমন একটা সদয় ছিল না। তারপরও সংবাদপত্রের নানা বিরুদ্ধ খবরের মধ্য থেকে কিছু ভালো খবর বেরিয়ে আসতে শুরু করে। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যা কিছু মন্দ বলে প্রচারিত হত দেশের সাধারণ মানুষ ধরে নিতেন যে তার ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ভালো আছে।[১৫] এ সময় পরাধীন ভারতবর্ষ ও বাংলার জনগণের কাছে রুশ বিপ্লবের শ্রেণি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার বাণীর চাইতে সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী জনগণ যে বল প্রয়োগ করে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাতে পেরেছে– এই বোধই বেশি আন্দোলিত করেছিল।[১৬] রুশ বিপ্লব শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত তরুণদের কাছে মার্কসবাদ সম্পর্কে ভাসা ভাসা কিছু ধারণার সৃষ্টি করে। তখন বাংলার তরুণদের কাছে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের অবসানের ধারণাই ছিল বেশি জনপ্রিয়।

---

১৪. *দৈনিক সংবাদ*, ২৮ জুলাই, ২০০০।

১৫. মুজাফফর আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৩২।

১৬. মর্তুজা খালেদ," উন্মেষপর্বে বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রকৃতি : একটি সমীক্ষা," *ইতিহাস: সমকালীন ঐতিহাসিকদের কলমে*, (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ২০০৪), পৃ, ২৫।

১৯২০ সালের ৬ নভেম্বর সরকার ইংল্যান্ডে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে শুল্ক অফিসগুলোতে নির্দেশ জারি করে। ১৯২২ সালের ২২ এপ্রিল অপর এক নির্দেশে পৃথিবীর যে কোন দেশে প্রকাশিত সাম্যবাদী পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থের ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।[১৭] এছাড়া কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত রয়েছে– এরূপ সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকার তাদের অনুগত সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে ব্যাপক মিথ্যা অপপ্রচার চালানোর নীতি গ্রহণ করে। বলশেভিকদের দানব রূপে চিহ্নিত করার মানসিকতা ব্রিটিশ অনুগত সংবাদমাধ্যমগুলোতে ফুটে ওঠে। তবে সরকারের এই প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের জনগণকে বলশেভিক বিপ্লবের স্বচ্ছ ধারণা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। অচিরেই বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে প্রকাশিত হয়,

> বলশেভিক বিপ্লবে আতঙ্কগ্রস্ত ইংল্যান্ড মিথ্যা প্রচারে নেমেছে, ভারতে বলশেভিকদের চিত্রিত করেছে নর-দানবরূপে; কিন্তু রাশিয়া সমন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই মনে প্রাণে খুশি যে এতদিনে স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান হলো।[১৮]

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলাকে দমন করার প্রয়াসে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবারও অনেক আগে পুলিশ বিভাগে Special Branch এবং Intelligence Branch নামে দু'টি বিভাগ খুলেছিল। বিভাগ দু'টির প্রধান কাজ ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং আন্দোলনকে দমন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ভাবে ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলার জনগণ ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সম্পন্ন হবার পরও এই বিপ্লব ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হবার সুযোগ পায়নি। উল্টো বলশেভিজম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করে জনগণের মাঝে তাদের সম্পর্কে ভীতিকর ধারণা সৃষ্টি করা হয়। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেনি। ভারত তথা বাংলার প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠে প্রবাসী বাঙালিদের দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নে।

---

১৭. অবিনাশ দাশগুপ্ত, *লেনিন, রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ-সাহিত্য*, (কলকাতা: কলকাতা বুক হাউস, ১৯৭০), পৃ.২।

১৮. *হিতবাদী*, জুন ২, ১৯২২, উদ্ধৃত হয়েছে অবিনাশ দাশগুপ্ত পূর্বোক্ত।

প্রবাসে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও ভারতে তার কার্যক্রম

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের নীতিতে বিশ্বাসী এম এন রায় অস্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রথমে জাভা এবং পরে জাপান হয়ে ১৯১৭ সালে মেক্সিকো পৌঁছান। ১৯১৯ সালে মেক্সিকোতে তিনি বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন এবং মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ১৯১৯ সালের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য মেক্সিকোয় নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মিখাইল বরোদিন কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে এম এন রায় তার মেক্সিকান স্ত্রীসহ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে মস্কো যান এবং একজন কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক হিসেবে এম এন রায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি লেনিনের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই সম্মেলনে এম এন রায় লেনিনের পাশাপাশি আধা-সামন্তবাদী, ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা কি হতে পারে সে বিষয়ে একটি থিসিস উপস্থাপন করেন।[১৯]

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই সম্মেলনে কমিন্টার্নের একটি এশিয়া ব্যুরো গঠন করে তার দায়িত্ব সকোলনিকভ, সাফারভ ও এম এন রায়ের উপর অর্পণ করা হয় এবং এর সদর দপ্তর তাসখন্দে স্থাপন করা হয়।[২০] এ সময় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক খেলাফত বিলুপ্ত করায় কিছু মুসলমান বিদ্রোহ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারত থেকে তুরস্ক গমন করতে উদ্যোগী হয়। এদের একটি অংশ তুরস্ক যাবার পথে তাসখন্দে অবস্থানকালে সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এম এন রায় এই মুজাহিদদের মার্কসবাদে দীক্ষিত করে তাদের সমন্বয়ে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন।[২১]

---

১৯. এম এন রায়ের খসড়া থিসিসের জন্য দেখুন, G. Adhikari (ed.), *Documents of the History of the Communist Party of India*, Vol. I. (New Delhi, People Publishing house, India ,1974), pp. 173-188.

২০. Roy, M.N., *Memoirs*, (Bombay, Prometheus Books, 1964), p. 391.

২১. মুজফফর আহমদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রবাসী কমিটি গঠন করা হয়। যা ছিল নিম্নরূপঃ

১. এম এন রায়
২. এভেলিনা টেন্ট রায়
৩. অবনী মুখার্জী
৪. রোজী ফিটিংগোফ
৫. মুহাম্মদ আলী (আহমদ হাসান)
৬. মুহাম্মদ শফীক সিদ্দিকী
৭. এম প্রতিবাদী রায়কর আচার্য[২২]

এম এন রায় নিজে সভ্য হন এবং মুহাম্মদ শফিককে সেক্রেটারি করেন। বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় এম এন রায় কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিলেও এর পশ্চাতে কমিন্টার্নের মধ্যে তিনি নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানো এবং ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সোল এজেন্সি নেয়ার হাতিয়ার হিসেবে এটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এভেলিন টেন্ট ছিলেন একজন আমেরিকান এবং এম এন রায়ের প্রথম স্ত্রী।[২৩] অনুরূপভাবে রোজী ফিটিংগোফ ছিলেন একজন রাশিয়ান এবং অবনী মুখার্জীর স্ত্রী। ১৯২১ সালে এই কমিটি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের স্বীকৃতি লাভ করে।[২৪] মূলত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নীতির উপর ভিত্তি করে এই কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা কমিন্টার্নের তুর্কিস্থান ব্যুরোর রাজনীতিক নীতিতে পরিচালিত হত।

পরবর্তীতে এম এন রায় তাসখন্দ থেকে মস্কো ফিরে আসেন এবং সেখানে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কমিন্টার্নের পক্ষ থেকে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।[২৫] বিষয়টিকে তিনি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে মস্কো থেকে বার্লিনে গিয়ে সেখান থেকে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তিনি দুই ধরনের কাজ করেন। প্রথমত, বিভিন্ন

২২. Gangadhar Adhikari (ed.). *op.cit*, p-84.
২৩. মুজফফর আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৬৮।
২৪. David, Patric, *Communism in India 1924-27* (Calcutta: Ghatak, 1972), p-128.
২৫. Haithcox, J.P., *Communism and Nationalism in India*, (New York: AMS Press, 1971), p-23.

পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেন, যেখানে ভারতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আশু কর্তব্যের নিদের্শনা প্রদান করে বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়ত, কমিন্টার্নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দূত ভারতে প্রেরণ করেন যারা এ দেশে এসে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছিলেন। জাহাজে করে মূলত নাবিকের ছদ্মবেশে এ সকল কমিউনিস্ট দূত উপমহাদেশে প্রবেশ করেন। এম এন রায় এ সময় নিজে *The Vanguard of Indian Independence* নামে পত্রিকা প্রকাশ করে তা ভারতে প্রেরণ করেন। এ ছাড়া তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পত্রিকা *International Press Correspondence (Inprecor)* ও তিনি ভারতে পাঠাতে শুরু করেন যাতে মার্কসবাদের বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয় ও পশ্চাৎপদ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার নির্দেশনা থাকতো।

বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান মুজফ্ফর আহ্মদ। মুজফ্ফর আহ্মেদের জন্ম ১৮৮৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপে। লেখাপড়া করেন সন্দ্বীপ স্কুল, নোয়াখালী স্কুল ও হুগলী কলেজে। অসাম্প্রদায়িক এ যুবক ১৯১৯ সাল থেকে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের। তিনি ও কাজী নজরুল ইসলাম মিলে ১৯২০ সালে *নবযুগ* নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশ করেন। *নবযুগ* ছিল একটি ভিন্নধর্মী পত্রিকা, এ পত্রিকার বিষয় বস্তুতে কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্যাগুলো প্রাধান্য দেয়া হত।[২৬] পত্রিকায় শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মুজফ্ফর আহ্মদের কমিউনিজম সম্পর্কে আগ্রহ জাগে এবং তিনি মার্কসবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন করে এই মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এমতাবস্থায় ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে তার সাথে পরিচয় ঘটে এম এন রায় কর্তৃক প্রেরিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি নলিনী গুপ্তের। তার সংস্পর্শে এসে মুজফ্ফর আহ্মদ তৃতীয় আন্তর্জাতিক, কমিউনিস্ট পার্টি ও এম এন রায় সম্পর্কে জানতে পারেন। নলিনী গুপ্তের মাধ্যমে মুজফ্ফর আহ্মদের সাথে এম এন রায়ের যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বাংলায় সম্প্রসারণে উদ্যোগী হন। ১৯২২ থেকে ১৯২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত কমিউনিস্ট হিসেবে মুজফ্ফর আহ্মদের কার্যক্রম ছিল প্রচারণামূলক। এ সময় তিনি মূলত এম এন রায় কর্তৃক প্রেরিত পত্রিকাগুলো পড়া ও সমমনা বন্ধুদের তা পড়ানো এবং বিষয়গুলো নিয়ে তাদের

২৬. মুজফ্ফর অহ্মদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮২।

সাথে আলোচনা করা, এম এন রায়ের সাথে পত্রযোগাযোগ রক্ষা ও তাকে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা প্রভৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

১৯২২ সালের অসহযোগ ও খেলাফাত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর কংগ্রেসের একটি অংশ মার্কসবাদী আর্দশের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কলকাতা ছাড়াও বোম্বে, মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবে কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্য পুলিশের ইন্টেলিজেন্সি ব্রাঞ্চ লন্ডনের হোম সেক্রেটারির অনুমতি সাপেক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দায়ের করে কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলার আসামিরা হচ্ছেন, ১. মানবেন্দ্র নাথ রায়, ২. মুজফ্ফর আহমদ, ৩. শওকত উসমানী, ৪.গোলাম হোসাইন, ৫. শ্রীপাত অমৃত ডাঙ্গে, ৬. মায়লাপুরম সিঙ্গার ভেলু চেট্টিয়া, ৭. রামচরণ লাল শর্মা, এবং ৮. নলিনী গুপ্ত।[২৭] মামলার প্রধান বাদী ছিলেন ভারতের ইন্টেলিজেন্সি ব্রাঞ্চ প্রধান সিসিল কে। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ কানপুর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা শুরু হয়।[২৮] মামলার অনেক আসামিই ছিলেন দেশের বাইরে বা পলাতক এবং তাদের অবর্তমানেই বিচার সম্পন্ন হয়। এ মামলার রায় হয় ১৯২৪ সালের ১০ নভেম্বর। মুজফফর আহমদসহ অন্য তিন আসামির চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপিল করেও একই রায় বহাল থাকে। মামলা চলাকালে মুজফফর আহমদ যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন। তার অবস্থার অবনতি ঘটায় জেল কর্তৃপক্ষ মুজফফর আহমদকে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়। মুজফফর আহমদ জেল থেকে মুক্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে নতুন উদ্যোমে কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির নামে প্রকাশ্যে কাজ করা কঠিন বলে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির ব্যানারে কমিউনিস্টগণ কাজ শুরু করেন। এ পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীগণ মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে বাংলায় এক শক্তিশালী বাম আন্দোলন গড়ে তোলেন।

27. G. Adhikari (ed.), *Documents of the History of the Communist Party of India,* Vo. II. (New Delhi, People Publishing house, India, 1982), p-280.
28. Govt of India, Home /Pol. File No. 261/1924, p, 66-67

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বাম রাজনীতিতে যোগদান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে গ্রেফতারকৃত প্রায় সকল বন্দিই ১৯২১ সালের মধ্যে মুক্তি পায় এবং তাদের বিরুদ্ধে জারিকৃত সকল গ্রেফতারি পরওয়ানা ছিল তাও তুলে নেওয়া হয়। সরকারি অত্যাচারও কিছুটা শিথিল হয়।[২৯] এ সময় রুশ বিপ্লব, সোশ্যালিজম, এনার্কিজম ও কমিউনিজম সম্পর্কিত কিছু বই ঢাকায় আসে এবং তা যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যে বইগুলো এসেছিল তার মধ্যে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, বুখারিনের *এবিসি অফ কমিউনিজম*, পোস্টগেট'র *রুশ বিপ্লবের ইতিহাস*, এমা গোল্ডম্যান'র 'এনার্কিজম অ্যান্ড আদার ওয়েজ', ম্যাক্সিম গোর্কী'র *মা*, বার্ট্রান্ড রাসেল'র '*রোড টু ফ্রিডম*' প্রভৃতির নাম উলেখযোগ্য।[৩০] অধ্যাপক বিনয় সরকার ও অন্যা পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় এ সময় উল্লিখিত বইগুলোর মধ্য থেকে কিছু কিছু বই বাংলায় অনুবাদ করা হয়, যা এ দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে তরুণদের মনে উপলব্ধি হয় যে, দেশকে মুক্ত করার জন্য এতদিনের অনুসৃত সন্ত্রাসবাদের পদ্ধতিই যথেষ্ট নয়। এ সময়ের তরুণগণ শুধু রুশ বিপ্লবের রোমাঞ্চকর দিক নয় এর মূল তত্ত্ব, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে গভীর পড়াশুনা শুরু করে।[৩১]

১৯২০-এর দশকে কমিউনিস্ট মতবাদ তথা মার্কসবাদের প্রভাবে বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত বড় একটি অংশ বাম রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। এদের মধ্যে ছিলেন যুগান্তর ও অনুশীলন গ্রুপের শীর্ষ স্থানীয় নেতাগণ। এ সকল নেতার মধ্যে ধরণী গোস্বামী, গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, মণি সিংহ, নলীন্দ্রমোহন সেন, নীরদ চক্রবর্তী, পিয়ারীমোহন দাস, আশু রায় প্রমুখ তরুণ বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন এবং বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করে কমিউনিজমকে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন।[৩২] কমিউনিজম মতবাদে বিশ্বাসী এ সকল তরুণ বিপ্লবী অনুশীলন

---

২৯. আবু জাফর মোস্তফা সাদেক, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন*, (ঢাকা : চলন্তিকা বই ঘর, ১৯৮৭), পৃ, ৭৯।

৩০. জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৬৮), পৃ, ১০।

৩১. ঐ, পৃ: ৯-১৪।

৩২. অমিতাভ চন্দ্র, *অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন, (সূচনা পর্ব)*, (কলকাতা : পুস্তক বিপনী, ১৯৯২), পৃ, ৭৪-৭৯।

দল ছেড়ে পৃথক একটি কমিউনিস্ট দল গঠনের কোন প্রচেষ্টা চালান নি, বরং রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে কমিউনিস্ট হওয়ার পর এই তরুণ বিপ্লবীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল সমগ্র অনুশীলন সমিতিকেই মার্কসবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী করে তোলা। কিন্তু অনুশীলন নেতারা তখনই বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী পথ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ এবং অনুশীলন দলকে একটি মার্কসবাদী দলে পরিণত করে গণবিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন না।[৩৩] ফলে অনুশীলন দলের নেতৃত্বের সঙ্গে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণকারী তরুণ বিপ্লবীদের সংঘাত দেখা দেয়। এ সকল বিপ্লবীর সাথে অনুশীলন দলের নেতৃত্বের আলোচনা কোন ফল ছাড়াই শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। এ পরিস্থিতিতে ১৯২৬ সালে ধরণী গোস্বামী, গোপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, মণি সিংহ, নলীন্দ্র মোহন সেন, নীরোদ চক্রবর্তী, পিয়ারী মোহন দাস, আশু রায় প্রমুখের নেতৃত্বাধীন অনুশীলন গ্রুপটি অনুশীলন সমিতি ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করেন।[৩৪] এই গ্রুপটি বিভিন্ন জেলার অনুশীলন সমিতির মাঝের সারি ও নিচের সারির কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং এই গ্রুপের প্রভাবে সংযোগ রক্ষাকারী অনুশীলন কর্মীরা নিজেদের শাখায় তরুণদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করতেন। এভাবে এই কমিউনিস্ট গ্রুপের প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং অনুশীলন দলের বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রমশ কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসার ঘটে।[৩৫]

১৯২৬ সালের শেষ দিকে মানবেন্দ্র রায়ের প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী অনুশীলন দলের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা নিজেদের পৃথক কমিউনিস্ট গ্রুপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করার লক্ষ্যে বাংলার মুজাফ্ফর আহমেদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ঐ বছরেই ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এই পার্টির সভ্য হিসেবে এসকল তরুণ কমিউনিস্টরা কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৩৬]

---

৩৩. Adhikari, Gangadhar (ed.) *Documents of the History of the Communist Party of India, Vol. iii-c (1928)*, (New Delhi: Peoples Publishing House, 1982), Introduction, p-84.

৩৪. Singha, Moni, *Life is a Struggle*, (New Delhi: People Publishing house, India, 1988), p-14.

৩৫. অমিতাভ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৭৪।

৩৬. মুজফফর আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৩৯২।

১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির কয়েকজন তরুণ সদস্যের প্রচেষ্টায় কলকাতায় ইয়ং কমরেডস্ লীগ নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে শ্রমিক পরিবারের যুবক ও তরুণ শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার ও প্রসার। এ সময় অপর বিপ্লবী দল যুগান্তরেও ভাঙ্গন ধরে। যুগান্তর দলেরও একটি বড় বিপ্লবী অংশ কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করে যুগান্তর দল থেকে বেরিয়ে আসেন। এই দলত্যাগী যুগান্তর ও অনুশীলন বিপ্লবীদের অনেকেই সদ্য গঠিত ইয়ং কমরেডস লীগে যোগদান করেন। ইয়ং কমরেডস্ লীগই ছিল বাংলার প্রথম সেতুসদৃশ কমিউনিস্ট সংগঠন, যার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রধান অংশটি বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ করে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং গণবিপ্লবের পথ অবলম্বন করেন।[৩৭]

ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি গঠন

১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর কলকাতায় ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি গঠিত হয়। সে সময় দলের নামকরণ করা হয় 'লেবার স্বরাজ পার্টি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।' এ দল গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল কুতুবউদ্দীন আহমেদ, হেমন্ত কুমার সরকার, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শামছুদ্দীন হুসাইন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[৩৮] দলের আদর্শ ও লক্ষ্য বর্ণিত হয় দলের গঠনতন্ত্রে যা দলের মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা পত্রিকা লাঙ্গলে প্রকাশিত হয়।[৩৯] দলের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষিত হয় ভারতের জন্য স্বরাজ এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক মুক্তি। প্রাথমিক অবস্থায় এ দলের যে দাবিগুলো ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি; ৮ ঘণ্টা কর্মসময় ও সপ্তাহে একদিন পূর্ণ ও একদিন অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা; শ্রমিকদের নিশ্চিত বাসস্থান ও চিকিৎসা; কর্মচ্যুতির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিঃপূরণ ও বার্ধক্য ভাতা প্রদান; অবৈতনিক শিক্ষা; শিল্প প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন; শ্রমিক সংগঠনগুলোকে বৈধতা ও ধর্মঘটের অধিকার প্রদান; কৃষি ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ প্রদান; সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি উপকরণ প্রদান প্রভৃতি।

১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর দলটি যে নামে (দি লেবার-স্বরাজ পার্টি অব দি ইন্ডিয়ান

---

৩৭. অমিতাভ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭।
৩৮. David, Patric, *op.cit*, p-128.
৩৯. *লাঙ্গল*, ২৮ জানুয়ারি, ১৯২৬।

ন্যাশনাল কংগ্রেস) আত্মপ্রকাশ করেছিল তাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এটি ছিল ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের একটি অঙ্গ সংগঠন। বাস্তবেও তাই ছিল। পার্টির প্রথম প্রতিষ্ঠাতারা দলটিকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কৃষক-শ্রমিক ফ্রন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২৬ সালে মুজফফর আহমদসহ কমিউনিস্ট পার্টির একটি বড় অংশের নেতৃবৃন্দ এ দলে যোগদান করে দলের কাঠামো পরিবর্তন করেন।[৪০]

১৯২৬ সালের ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি বিশিষ্ট বাম ও কৃষকনেতা হেমন্ত সরকারের আহ্বানে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে লেবার-স্বরাজ দলের সব বিশিষ্ট নেতা ও কৃষক সম্মেলনের সব প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল, কংগ্রেসের ছায়া থেকে বের হয়ে এসে কৃষক-শ্রমিকদের জন্য আলাদা একটি দল গঠন। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নতুন কোন দল গঠন না করে ইতোপূর্বে গঠিত লেবার-স্বরাজ পার্টি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করে নামকরণ করা হয় 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি।[৪১] ১৯২৬ সালের এই সম্মেলনের পর থেকে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি একটি স্বাধীন দল হিসেবে তার কার্যাবলী পরিচালনা শুরু করে। যদিও এই দলের সদস্যদের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধা ছিল না। দলের একজন সদস্য একই সাথে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যও থাকতে পারতেন। শুরু থেকে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি গণসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে সক্রিয় ছিল। দলের মুখপত্র হিসেবে প্রথমে *লাঙ্গল* ও পরে *গণবাণী* নামে পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এসব পত্রিকায় সামাজিক বৈষম্য, শ্রমিক-কৃষকদের দুর্দশা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়।[৪২] এছাড়া পার্টি ইংরেজি ও উর্দুতে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচারপত্র ছেপে তা দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ এলাকায় বিলি করার ব্যবস্থা করেছিল। ক্রমান্বয়ে এ দল ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে।

---

৪০. মর্তুজা খালেদ, "ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি ও বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন, (১৯২৬-১৯২৮), *গবেষণা পত্রিকা*, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৬-৯৭, পৃ, ৯৭।

৪১. মর্তুজা খালেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৯৮।

৪২. মুজাফ্ফর আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৩৯৪।

১৯২৭ সালের ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিশেষ অতিথি হিসেবে আসেন ভারতীয় বংশদ্ভূত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির এম.পি সাপুরজী সাকলাতভালা। সাকলাতভালা ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের কৃষক-শ্রমিকের সমন্বয়ে জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলা এবং কংগ্রেসের ভিতর থেকে কাজ করে এ দলকে প্রগতিশীল একটি সংগঠনে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান।[৪৩] এভাবে দেখা যায় যে, ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি বাংলাতে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির ব্যানারে কমিউনিস্টগণ এক তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়।

১৯২৮ সালের ৩১ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল চব্বিশ পরগনা জেলার ভাটা পাড়ায় ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির তৃতীয় বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা, ময়মনসিং, বগুড়া, নদীয়া, যশোর প্রভৃতি জেলা থেকে প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।[৪৪] সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ৫টি প্রবন্ধ উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। সম্মেলনে শ্রমিক আন্দোলন অধিকতর গুরুত্ব সহকারে সংগঠিত করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মার্কসীয় তত্ত্বে কৃষকদের চাইতে শ্রমিকদের অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তাই আগত প্রতিনিধিরা দলের নাম পিজেন্ট এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টির পরিবর্তে 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি' করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪৫] দলের সভায় বেকার ভাতা প্রদান, বেকারদের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সংবাদপত্রের উপর থেকে যাবতীয় কালাকানুন প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। জমিদারদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন, জমিদারদের বাধ্যতামূলক শ্রম প্রদান প্রথার বিলোপ, সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ প্রদান ব্যবস্থার প্রবর্তন, করের পরিমাণ হ্রাস এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়।[৪৬] সম্মেলন শেষ হয় দলের

৪৩. Adhikari, G. (ed.). *op.cit,* p-78.
৪৪. মর্তুজা খালেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৯৯।
৪৫. Adhikari (ed.). *op.cit,* p-79.
৪৬. অমিতাভ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৯০ এবং ৯২।

নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও নরেশ চন্দ্র সেন যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মুজাফ্ফর আহমেদ নির্বাচিত হন সেক্রেটারি। এছাড়া একটি নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করা হয়। নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ হলেন ধরণীকান্ত গোস্বামী, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ, আব্দুর রাজ্জাক খান, কালিদাস ভট্টাচার্য, আবতাব আলী প্রমুখ। সম্মেলনে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির একটি যুব শাখা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৪৭]

ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির সাফল্য ও জনপ্রিয়তায় সমগ্র ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ উৎসাহিত হন এবং এই দলের অনুকরণে সর্বভারতীয় ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ১৯২৮ সালের ২১, ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর কলকাতার আলবার্ট হলে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলা ছাড়াও বোম্বে, পাঞ্জাব, ইউ.পি প্রভৃতি স্থানের বাম নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল। সম্মেলনে ঐ পার্টিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে 'অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি' গঠন করা হয়। ঘোষণা করা হয়, ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টিই একমাত্র সংগঠন যার পন্থা সঠিক এবং কেবলমাত্র এই সংগঠন জনগণকে সংগঠিত করে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করে থাকে। এভাবে দেখা যায় ১৯২৬ সালে কংগ্রেসের অঙ্গসংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বাংলার একটি আঞ্চলিক দল লেবার-স্বরাজ পার্টি ১৯২৮ সালে অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি নামে শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

১৯২৮ সালের ১৭ জুলাই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ৬ষ্ঠ কংগ্রেস শুরু হয় এবং ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার অধিবেশন চলে। এই কংগ্রেসে তৃতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে 'ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা প্রগতিশীল এবং কমিউনিস্টদের তাঁদের সাথে কাজ করা উচিত, বলে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তার আমূল পরিবর্তন করা হয়।[৪৮] মস্কোতে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে একটি

৪৭. মুজাফ্ফর আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৩৯৪।

৪৮. Kumar, Tarun, & Debesh Roy Chowdhury, *Colonial India: Ideas and Movement*, (Calcutta : Progressive Publishers, 2001), p-155.

পেটি-বুর্জোয়া গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে তার সাথে কোন সম্পর্ক না রাখার পরামর্শ দেয়া হয়। কংগ্রেসে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির সমালোচনা করে মন্তব্য করা হয়,

> The Worker's and Peasant's Parties, whatever revolutionary character they may possess, can too easily at particular periods be converted into petty-bourgeois parties, and accordingly, the Communists are not recommended to organize such parties. The Communist Party can never build its organization on the basis of a fusion of two classes and in the same way also it can't make it a task to organize other parties on the basis, which is characteristic of petty-bourgeois groups.[৪৯]

১৯২৮ সালে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্টস পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন শেষ হবার পর কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের এই নির্দেশ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট পৌঁছে, ফলে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ভারতীয় কমিউনিস্টদের একাংশ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের এই সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। এ অবস্থায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নেতৃবৃন্দ ক্রমাগতভাবে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপর চাপ প্রয়োগ করে। ফলে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি ত্যাগ করে নতুন করে কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনর্গঠন ও কমিউনিস্ট পার্টির ব্যানারে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনায় উদ্যোগী হন। অন্যদিকে ১৯২৮ সালে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্টস পার্টির সাফল্যে বিমূঢ় ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্টদের দমনে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা। এ মামলায় গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল ভারতীয় দণ্ড বিধির ১২১/এ ধারা বলে মিরাটে মামলা রুজু করে। ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ বাংলা, ইউ.পি, পাঞ্জাব ও বোম্বে থেকে মোট ৩১ জন ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্টস পার্টির নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। বাংলা থেকে মুজাফ্‌ফর আহমেদকে প্রধান আসামি করা হয়। এসকল নেতার গ্রেফতারের ফলে পার্টি একরকম নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়ে এবং দলের কাজ প্রায় থেমে যায়। গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন পরিচালনা করাই এ সময় দলের

---

৪৯. মুজাফ্ফর আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৯৮।

প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে ১৯২৯ সাল থেকে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির কার্যক্রম একরকম বন্ধ হয়ে যায় এবং এই দল প্রায় কেবলমাত্র একটি নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অবশেষে ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ব্রিটিশ সরকার ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টিসহ ১৩টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে এই দলের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটে।[৫০] এভাবে দেখা যায় যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নীতির পরিবর্তনের কারণে ক্রমাগত চাপ এবং ব্রিটিশ সরকারের দমন নিপীড়নের ফলে ১৯৩৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির এক গৌরবজনক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইয়ং কমরেডস লীগ ও মণি সিংহ

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে গোপেন চক্রবর্তীর সাথে মতবাদ সংক্রান্ত এক বাকযুদ্ধের পর মণি সিংহ কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। আলোচনাকারী গোপেন চক্রবর্তী ১৯২৫ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সবেমাত্র দেশে ফিরেছিলেন। ফলে মণি সিংহ তার কাছ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে অনেক কাহিনী শুনে তার মনেও বিপ্লবী চিন্তা-ভাবনার সূত্রপাত ঘটে। অন্যদিকে এ সময় বিপ্লবের তথ্যসমৃদ্ধ *ভ্যানগার্ড* পত্রিকা বাংলায় পাওয়া যেত। মণি সিংহ এ সকল পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন, যা তার চিন্তা-ভাবনাকে আরো বিকশিত করে।[৫১] অতঃপর তিনি কলকাতায় গিয়ে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কলকাতায় আসার পর কমিউনিস্ট নেতা মুজাফফর আহমেদের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির অলিখিত অফিস হিসেবে পরিচিত ৩৭, হ্যারিসন রোডের দোতালায় সাক্ষাৎ করেন। এই ঠিকানা থেকে ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির মুখপত্র *গণবাণী*' প্রকাশিত হতো। কলকাতায় আসার পর মণি সিংহ ক্লাইভ স্টিটের গুপ্ত ম্যানসনে একটি ঘর ভাড়া করে ওরিয়েন্টাল ট্রেডিং নাম দিয়ে একটি অফিস খুলেন।[৫২] এখানে কিছু টেকনিক্যাল কাজও হতো তবে মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার শ্রমিকদের সংগঠিত করা। শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মণি সিংহ কলকাতায় গেলেও প্রথমদিকে সে সুযোগ তিনি পাননি ।

১৯২৮ সালের ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল চব্বিশ পরগনা জেলার ভাটাপাড়ায় ওয়ার্কার্স

৫০. মর্তুজা খালেদ, *ওয়ার্কার্স এন্ড পিজেন্টস পার্টি*, পূর্বোক্ত, পৃ, ১১২।
৫১. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম (১ম খন্ড)*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ. ২৯-৩০।
৫২. *দৈনিক সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২।

অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির তৃতীয় বাৎসরিক সম্মেলনে দলের যুব শাখা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯২৭ সাল থেকেই বাংলায় 'All Bengal Youth Association' নামে একটি যুব সংগঠন ছিল। বিশের দশকের শুরুতে রুশ বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী তরুণদের এক অংশ এ পথ পরিত্যাগ করে কমিউনিজমকে তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মার্কসবাদ ও সাম্যবাদী আদর্শ প্রচার এবং কৃষক-শ্রমিক ও যুবকদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠে All Bengal Youth Association. এই দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মণি সিংহ, ধরণী গোস্বামী, গোপেন্দ্রনাথ, গোপাল চক্রবর্তী, নলীন্দ্র মোহন সেন, নীরোদ চক্রবর্তী, পিয়ারীমোহন দাস, আশু রায় প্রমুখ তরুণ নেতৃবৃন্দ।[৫৩] এই গ্রুপ *Vanguard, Inprecore, Masses of India* প্রভৃতি পত্রিকা যা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ও এম এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত হত তা সংগ্রহ করে অনুশীলন শুরু করেন। তারা এম এন রায়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন এবং পরবর্তীতে তারই নির্দেশে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টিতে যোগদানকারী এই সমস্ত তরুণের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় দলের যুব শাখা। এই শাখার নাম রাখা হয় 'ইয়ং কমরেডস লীগ'। নামকরণ করেন ফিলিপ স্প্রাট। তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ নাগরিক ও ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। কমিউনিস্ট মতবাদ প্রসারের জন্য তাঁকে ভারতে প্রেরণ করা হয়। বাংলায় আসার পর এখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন।

ইয়ং কমরেডস লীগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল যুব সম্প্রদায়, বিশেষ করে শ্রমিক পরিবারের যুবক ও তরুণদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রচার ও প্রসার করা।[৫৪] ইয়ং কমরেডস লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফিলিপ স্প্রাটকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন ধরণী গোস্বামী, নগেন সরকার, সুধাংশুকুমার অধিকারী, সতেন্দ্র নারায়ণ প্রভৃতি তরুণ নেতৃবৃন্দ যারা মূলত একসময় সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন এবং যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন।

১৯২৮ সালের ১১ আগস্ট ইয়ং কমরেডস লীগের নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করা হয়।

---

৫৩. মুজাফফর আহমেদ, *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৭৫), পৃ, ১৫৯।

৫৪. অমিতাভ চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ, ৯০ এবং ৯২।

কমিটির সভাপতি হন ফিলিপ স্প্রাট এবং ধরণী গোস্বামী হন সাধারণ সম্পাদক। তাছাড়া নগেন সরকার সুধাংশুকুমার অধিকারী, সতেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, পি.মুখার্জি, এন ভট্টাচার্য, ও আব্দুল হালিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হন।[৫৫] এ সময় ইয়ং কমরেডস লীগের সংবিধান তৈরি, আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য একটি সাব কমিটিও গঠন করা হয়। আগস্ট মাসের মধ্যেই কমিটি যথাযথভাবে এ বিষয়ে কাজ শেষ করে। নির্দিষ্ট করা হয় পার্টির রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মপন্থা।[৫৬] ইয়ং কমরেডস লীগের সংবিধান, আইন-কানুন, নিয়মনীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং উপ-কমিটি সংগঠনের জন্য অতি দ্রুত সংবিধান প্রণয়ন করেছিল। এতে ইয়ং কমরেডস লীগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়,

> The object of the League is to organise a radical and militant movement of the exploited and oppressed young men and women for (a) the redress of their immediate grievances, and (b) the establishment of the independent republic of India on the basis of the social and economic emancipation of the masses.[৫৭]

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ইয়ং কমরেডস লীগের কর্মসূচি ও কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করার পরপরই নির্বাহী কমিটি 'Statement of Program and Policy of Young Comrades League'-শিরোনামে তা ঘোষণা করে। কর্মসূচি ও কর্মপন্থায় যুবসমাজকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার লক্ষ্যে অতীত আশ্রয়ী চিন্তা-ভাবনা পরিহার করার আহ্বান জানানো হয়। এতে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য অবশ্যই আন্তর্জাতিক বলে ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচিতে যুবকদের উদ্দেশ্যে তাদের উপলব্ধির জন্য বলা হয় "Class-struggle as the mainspring of historical development and the rise and organisation of the masses as the key to our problems". অসময়োপযোগী পুরাতন ধ্যান-ধারণাকে বর্জন করার আহ্বান জানিয়ে এতে আরো বলা হয়,

---

৫৫. মুজাফফর আহমেদ, *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯,১৮৪।
৫৬. সরোজ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, মুখবন্ধ ও পৃ, ৮ এবং ৯।
৫৭. Ahmed, Muzzaffar, *Communist Party of India: Years of Foundation 1921-1933*, (Calcutta: National, Book Agency, 1959), p-112.

> The Young Comrades League has been established to carry on the propaganda of these ideas and to form and lead a real movement of the exploited youth for the solution of its grievancec and for the attainment of independence and freedom.[৫৮]

এই বক্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ঠতই বুঝা যায় যে, ইয়ং কমরেডস লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিজম তত্ত্বকে ঘিরে।[৫৯] ইয়ং কমরেডস লীগের লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে একদিকে এর নেতাকর্মী ও সংগঠকগণ তৎপর ছিলেন। অন্যদিকে এ সময় অন্য আরেকটি বিপ্লবী দল যুগান্তরে ভাঙ্গন তৈরি হয়। এ পর্যায়ে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করে বেশ কিছু বিপ্লবী যুগান্তর দল ত্যাগ করে ইয়ং কমরেড লীগে যোগদান করে। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইয়ং কমরেডস লীগ একটি সংগঠিত ও শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। এর মূল কেন্দ্র স্থাপিত হয় কলকাতায় এবং এই কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন ধরণী গোস্বামী। তাঁর সঙ্গে মণি সিংহ, নীরোদ চক্রবর্তী, নলীন্দ্রমোহন সেন, জামালুদ্দীন বুখারী প্রমুখ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় ধরণী গোস্বামী গ্রেফতার হলে নলীন্দ্রমোহন সেন তার স্থলাভিষিক্ত হন।

বহু শ্রমিক এলাকায় এ সময় ইয়ং কমরেডস লীগের কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এ সংগঠনের সদস্যগণ চটকল শ্রমিকদের মধ্যেও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করেন। এসময় চব্বিশ পরগনা, হাওড়াসহ বিভিন্ন এলাকার শ্রমিক অঞ্চলগুলোতে ইয়ং কমরেডস লীগের শাখা স্থাপিত হয় এবং কাজকর্ম চলতে থাকে। মূল কেন্দ্রের বাইরে অবিভক্ত বাংলার পাঁচটি জেলা তথা ময়মনসিংহের এ , মালদহ, খুলনা, রাজশাহী ও ঢাকাতে সংগঠনের শক্তিশালী আঞ্চলিক কেন্দ্র গড়ে উঠে। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে। নগেন সরকার কিশোরগঞ্জ শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। শাখা কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে ওয়ালী নওয়াজ, গিরীন্দ্র চন্দ্র, নবীবক্স, ক্ষীরোদ রায়, রুস্তম আলী, মণীন্দ্র চক্রবর্তী,

---

৫৮. *ঐ*।

৫৯. মুজাফ্ফর আহমেদ, *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা,পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৫৯ ও ১৮৪।

আব্দুল জলিল, হাতেম আলী খান প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জ ছাড়া অন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতেও ইয়ং কমরেডস লীগের সাংগঠনিক প্রয়াসের ঘাটতি ছিল না।[৬০] মালদহে জ্যোতির্ময় শর্মা, রামরাঘব লাহিড়ী প্রমুখ ইয়ং কমরেডস লীগ সংগঠিত করেন।[৬১] রামরাঘব লাহিড়ী রাজশাহীতে শাখা সংগঠন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও পালন করেন। খুলনার দায়িত্বে ছিলেন প্রমথ ভৌমিক, বিভূতি ঘোষ, বিষ্ণু চ্যাটার্জি প্রমুখ নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবীগণ। প্রাক্তণ অনুশীলন বিপ্লবী গোপাল বসাক ছিলেন ঢাকার দায়িত্বে। তাছাড়া কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে ঢাকায় সংগঠনের কাজ তদারক করতেন নলীন্দ্র মোহন সেন।[৬২]

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাজশাহী শহরে ইয়ং কমরেডস লীগের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৬৩] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন উপলক্ষে নির্মিত প্যান্ডেলে এ সম্মেলন হয়। ১৫ এপ্রিল কংগ্রেসের মূল অধিবেশনের তারিখ নির্ধারিত ছিল। এ তারিখে কংগ্রেসের মূল অধিবেশন শেষ হওয়ার পর ১৬ এপ্রিল হয় যুব সম্মেলন। ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন এবং ১৮ তারিখে ইয়ং কমরেডস লীগের সম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা বঙ্কিম মুখার্জি।[৬৪] ১৮ ও ১৯ এপ্রিল এই দু'দিন সম্মেলনে জন্য নির্ধারিত থাকলেও ১৯ তারিখে অধিবেশন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। ১৮ এপ্রিল বিপ্লবী সূর্যসেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে চট্টগ্রামকে স্বাধীন ঘোষণা করায় সমগ্র বাংলায় নির্বিচারে রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার শুরু হয়েছিল। এজন্য সে রাতেই ইয়ং কমরেডস লীগের নেতা-কর্মীরা আত্মগোপন করায় ১৯ এপ্রিলের অধিবেশন পরিত্যক্ত হয়।[৬৫] অর্ধ-সমাপ্ত এ সম্মেলনে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইয়ং কমরেডস লীগের প্রায় ২০০ জন কর্মী যোগ

৬০. Ahmed, Muzzaffar, *op.cit*, p-113.

৬১. ধরণী গোস্বামী, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৩২।

৬২. সরোজ মুখোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৭।

৬৩. এ.টি.এম আতিকুর রহমান, '*বাংলায় কমিউনিজমের উন্মেষ পর্ব ও ইয়ং কমরেডস্ লীগ: একটি পর্যালোচনা*', *The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol –X*, 1998-99), p-41.

৬৪. মুজাফ্ফর আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৩৯৯।

৬৫. Ahmed, Muzzaffar, *op.cit*, p-112.

দিয়েছিলেন। সম্মেলনস্থলে ছিলেন প্রায় পাঁচ হাজার দর্শক ও শ্রোতা। অর্ধ-সমাপ্ত এই সম্মেলন ছিল ইয়ং কমরেডস লীগের প্রথম ও শেষ সম্মেলন।[৬৬]

মণি সিংহের শ্রমিক রাজনীতি ১৯২৮-১৯৩০

১৯২৮ সালের পূর্ব থেকেই বাংলায় একের পর এক শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটতে থাকে। প্রথম দিকে এসবের নেতৃত্ব দিতেন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও কিছু সংগঠন। যেমন ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রিজেন্ট পার্টি, ইয়ং কমরেডস লীগসহ অন্যান্য সংগঠন। অন্যদিকে যেসব ব্যক্তিবর্গ এসব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মুজাফফর আহমেদ, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, কালী সেন ও মণি সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। এসকল ব্যক্তিবর্গ নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল লিলুয়া, হাওড়া, মাটিয়াবরুজসহ বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক, মেথর, ঝাড়ুদারসহ বিভিন্ন আন্দোলন। এসকল আন্দোলনের অধিকাংশই তেমন কোন ফল বয়ে আনতে পারেনি। কেবলমাত্র মণি সিংহের নেতৃত্বে সংঘটিত মাটিয়াবুরুজের কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিক আন্দোলনটি একটি যথার্থ ফলাফল বের করে আনতে পেরেছিল।[৬৭] ফলে শ্রমিকসহ সকল শ্রেণির পেশাজীবীদের মধ্যে মণি সিংহের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে সংঘটিত অধিকাংশ আন্দোলনগুলোতে মণি সিংহ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন।

মণি সিংহ ও মাটিয়াবুরুজ শ্রমিক আন্দোলন : ১৯২৮ সালের প্রথমদিকে লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে ধর্মঘট শুরু হয়, এই ধর্মঘট পরিচালনা ও ছড়িয়ে দেয়ার জন্য লোকের প্রয়োজন ছিল। এই সুযোগে ধরণী গোস্বামী ও গোপেন চক্রবর্তী লিলুয়াতে আসেন। একদিন সন্ধ্যায় মণি সিংহ বাসায় উপস্থিত থাকা অবস্থায় গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামী তার বাসায় এসে আলাপের এক পর্যায়ে পরেরদিন তাকে আন্দোলনের জন্য লিলুয়াতে যেতে বলেন। মণি সিংহ প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় চাইলেও তারা এতে আন্দোলনের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হতে পারে বলে পরের দিনই যাওয়ার কথা বলেন। অবশেষে মণি সিংহ রাজি হন এবং লিলুয়াতে যান।[৬৮] লিলুয়া ওয়ার্কশপের নেতা ছিলেন জটাধারী বাবা ওরফে কে.সি

৬৬. মুজাফ্ফর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৯৮।
৬৭. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৭।
৬৮. দৈনিক সংবাদ, ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭২।

মিত্র (কিরণ চন্দ্র মিত্র)। যতদুর জানা যায় তিনি ছিলেন রেলওয়ের একজন কর্মচারী, পরে সাধু ব্রত গ্রহণ করেন এবং চুলে জটা বেঁধে যায়। সেই থেকেই তিনি জটাধারী বাবা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। লিলুয়া যাওয়ার পর মণি সিংহসহ সকলেই লিলুয়া রেলওয়ে ইউনিয়ন অফিসে ওঠেন। লিলুয়ার শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে অবস্থানকালে মাটিয়াবুরুজ থেকে রহমান নামক একজন শ্রমিক এসে উপস্থিত হন। অবাঙালি এই শ্রমিক এসে বলেন,"হামলোগ মাটিয়াবুরুজ কটন মিলমে হরতাল করদি, হাম জটাধারী বাবাকো লেনে আয়া।" গোপেন চক্রবর্তী বলেন, "কেয়া হুয়া?" উত্তরে রহমান বলেন,"হামলোগ কেশোরাম কটন মিলমে হরতাল করদিয়া, কেউকি হামলোগকে পাউন্ডকা হিসাবসে মজদুরি মিলতা থা, লেকিন আভি নয়া কানুন ইয়াডসে মজদুরি মিলেগা, ইস্‌সে করিব ১০/১২ রুপায়া মাহিনা ঘাটতি হোগা।"[৬৯] এসময় জটাধারী বাবা অফিসে উপস্থিত ছিলেন না, তাই সুযোগ বুঝে গোপেন চক্রবর্তী ঐ শ্রমিককে বলেন,"জটাধারী বাবা অফিসে উপস্থিত নেই, আমরা তার লোক, চলুন মাটিয়াবুরুজে যাই।"[৭০] গোপেন চক্রবর্তীর এই কথায় মণি সিংহ এক রকম অবাক হয়ে যান। বিষয়টি বুঝতে পেরে গোপেন চক্রবর্তী মণি সিংহকে নিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে বলেন, "জটাধারী সংস্কারবাদী ও সুবিধাবাদী লোক, তার উপর কেশোরাম মিল হচ্ছে বিড়লার। সুবিধা পেলে জটাধারী বাবা কি করবে না করবে বলা যায় না, তাই উদ্যোগ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে পরিচিত হওয়া দরকার।"

মাটিয়াবুরুজের দুরত্ব ছিল কলকাতা থেকে আট মাইল এবং এটি ছিল একটি শ্রমিক প্রধান এলাকা, কাপড়ের কল, চটকল, জাহাজ মেরামতের কারখানা, ম্যাচ ফ্যাক্টরিসহ ছোট-বড় অনেকগুলো কারখানা ছিল। পাশাপাশি বেশ কিছু রেডিমেড জামা তৈরির কারখানাও ছিল। স্থানীয় লোকদের বেশিরভাগই ছিল মুসলমান শ্রমিক, হস্ত শিল্পে কর্মরত দর্জিদের সকলেই ছিল বাঙালি, কিন্তু কল-কারখানার শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল অবাঙালি, বিহার ও ইউ.পি'র বাসিন্দা। মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ হাজার, যার মধ্যে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার শ্রমিকও ছিল।[৭১] মাটিয়াবুরুজের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এটা ছিল চোরাকারবারীদের ভূস্বর্গ। কোকেন থেকে

---

৬৯. মুজাফ্ফর আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৪৭।
৭০. দৈনিক সংবাদ, পূর্বোক্ত।
৭১. ঐ।

আরম্ভ করে দেশী-বিদেশী এমন কোন পণ্য ছিল না, যা সেখানকার চোরাবাজারে পাওয়া যেত না। পুলিশের সহযোগিতায় চোরাকারবারীরা এখানে ছিল জমজমাট। বহুলোক চোরাকারবারেও নিযুক্ত ছিল।[৭২]

মাটিয়াবুরুজে পৌছার পর মণি সিংহ ও গোপেন চক্রবর্তী শ্রমিক বস্তিতে উপস্থিত হলে শ্রমিকরা তাদেরকে দেখে চরম উৎসাহিত হয় এবং তাদের চারিদিকে ঘিরে ধরে উর্দুতে হরতালের কারণ ব্যাখ্যা করতে থাকে। কিন্তু ভাষা ও বস্ত্রকল সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় তারা শ্রমিকদের কথার কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তাদের তাকিয়ে থাকা দেখে শ্রমিকরা বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং তারা তাদেরকে মিলের সেক্রেটারির নিকট নিয়ে যান।[৭৩] সেক্রেটারির নিকট যাওয়ার পর মণি সিংহ ও গোপেন চক্রবর্তী তাদের পরিচয় দিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন সম্পর্কে জানতে চাইলে সেক্রেটারি বলেন, “এই মিলের তাঁতীদের আগে পাউন্ড হিসাবে (ওজনে) মজুরি দেয়া হত, কিন্তু এখন ইয়ার্ড বা গজ হিসাবে মজুরি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই পদ্ধতি এখন পৃথিবীর সর্বত্র চালু রয়েছে। বিড়লারা মহানুভব ব্যক্তি, তারা শ্রমিকদের কোন ক্ষতি করতে পারেন না, শ্রমিকরাই মূর্খ, না বুঝেই তারা হরতাল করছে।”[৭৪] মণি সিংহ শ্রমিকদের মজুরি কমার বিষয়টি জানতে চাইলে সেক্রেটারি পরিষ্কার কোন উত্তর দিতে না পেরে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন এবং বলেন সব ঠিক হয়ে যাবে বাবু। এ বিষয়ে বিশদ কোন জ্ঞান না থাকায় মণি সিংহ তার নীতিগত ধারণা হতে বুঝে নিয়েছিলেন যে, বুর্জোয়ারা কখনও শ্রমিকদের ভালো করতে পারে না।

আন্দোলনের পূর্বে সুতাকল, পাটকলের মালিকরা একশত টাকায় একশত টাকা বা একশত টাকায় দেড়শত টাকা মুনাফা করতেন। শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা ছিল খুবই জঘণ্য। অধিকাংশ শ্রমিক বস্তিতে বাস করতেন। জুলুম-ছাঁটাই চলত অনবরত, আর মজুরি ছিল খুবই কম। এসময় গোপেন চক্রবর্তী আন্দোলনের কারণে লিলুয়াতে ফিরে গেলে মণি সিংহ একা হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষী

৭২. অমিতাভ চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ, ৯৩।
৭৩. *দৈনিক সংবাদ*, পূর্বোক্ত।
৭৪. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৭।

বস্ত্রমিলে গিয়ে উইভিং মাস্টারের মাধ্যমে পাউন্ড ও ইয়ার্ডের মাধ্যমে মজুরি প্রদানের বিষয় প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। মূলত পাউন্ডের মাধ্যমে মজুরি প্রদান ছিল উৎপাদিত পণ্যকে পাউন্ডে পরিমাপ করে মজুরি প্রদান করা, আর অন্যদিকে ইয়ার্ড ছিল উৎপাদিত পণ্যকে ইয়ার্ডের (গজের) মাধ্যমে পরিমাপ করে মজুরি প্রদানের পদ্ধতি। প্রথমে কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিকদেরকে পাউন্ডের মাধ্যমে মজুরি দেয়া হত, কিন্তু পরে তা ইয়ার্ডের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হলে দেখা যায় যে, একেকজন শ্রমিক পূর্বের তুলনায় মাসে ১০/১২ টাকা মজুরি কম পাচ্ছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মাটিয়াবুরুজের শ্রমিকরা আন্দোলন।

মাটিয়াবুরুজের বড় রাস্তার ধার ঘেঁষেই প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা নদী, এই গঙ্গা নদীর পাড়েই কারখানাগুলো অবস্থিত, যেসবে ধর্মঘট চলছিল। কারখানাগুলোর এই ধর্মঘট সম্পর্কে খিদিরপুর থানার ওসি রহমান এবং রবিনসন নামক একজন সার্জেন্ট মণি সিংহের সাথে দেখা করে ধর্মঘট সম্পর্কে বলেন, "আপনারা শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করতে পারবেন কিন্তু বিশৃঙ্খলা যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।"[৭৫] ধর্মঘট চলাবস্থায় একদিন ভোরের দিকে গেটে পিকেটিংরত অবস্থায় লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারের একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সার্জেন্টের সাথে মণি সিংহের বাদানুবাদ শুরু হয়। বাদানুবাদের একপর্যায়ে সার্জেন্ট মণি সিংহকে গ্রেফতার করে মাটিয়াবুরুজ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। ফলে রাজনৈতিক জীবনে প্রথমবারের মত পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন।[৭৬] মণি সিংহ গ্রেফতার হবার পর পরই হাজার হাজার শ্রমিক থানার সামনে এসে জড়ো হয়ে মণি সিংহের মুক্তি দাবি করে। শ্রমিকরা মণি সিংহের মুক্তি দাবি করে স্লোগান দেয় "আঞ্জুমান বাবুকো (ইউনিয়নের নেতাকে) ছোড় দো।" তাদের এই জঙ্গি মূর্তি দেখে ফাঁড়ির লোকজন ভয় পেয়ে যায় এবং থানার ওসি মণি সিংহকে বলেন, "তুমি গ্রেফতার হওনি, তুমি মুক্ত, নচেৎ এরা হয়ত ফাঁড়ি আক্রমণ করে বসবে।"[৭৭] প্রকৃতপক্ষে মণি সিংহ তখন রাজনৈতিকভাবে অতটা পক্ক ছিলেন না, ফলে তিনি তাদের শিখিয়ে দেওয়া বুলি "আমি গ্রেফতার হইনি" শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করেন। এতে

---

৭৫. মুজাফ্ফর আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৬৯।
৭৬. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৭।
৭৭. ১৯২৮ সালের পুলিশ রিপোর্ট, কলকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি ও আর্কাইভস।

শ্রমিকরা শান্ত হয় এবং মণি সিংহকে তারা একরকম কোলে করে ফাঁড়ি থেকে নিয়ে যায়।[৭৮] এই ঘটনার পরও মিলে শ্রমিক ধর্মঘট পূর্বের মতই চলতে থাকে এবং তার নের্তৃত্বে ছিলেন মণি সিংহ। ধর্মঘটের কাজটা বেশি শক্তিশালী হত সকালের দিকে, এসময় মণি সিংহ মিল গেটে উপস্থিত থেকে পিকেটিংয়ে নেতৃত্ব দিতেন। দিনের অন্যান্য সময় আর তেমন একটা পিকেটিং করতে হত না, এমনিতেই ধর্মঘট পালিত হত। মালিক পক্ষ এই আন্দোলনকে স্থিমিত করার জন্য কারবালা ময়দানে (কারবালা একটি মাঠের নাম) একটি জনসভার আয়োজন করে এবং তাতে সুভাষ বসুর মাধ্যমে হরতাল প্রত্যাহার করার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।[৭৯] যাইহোক সুভাষ বসু মালিকদের পক্ষে বক্তব্য দিবে এতে শ্রমিক আন্দোলন ভেঙ্গে যেতে পারে এই আশঙ্কায় মণি সিংহ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন, কিন্তু শ্রমিকরা মণি সিংহকে অভয় দিয়ে বলেন, "সুভাষবাবু বিড়লাজির পক্ষে বক্তব্য দিলেও কিছুই হবে না, সব শ্রমিক এক আছে, তাদের বক্তব্যের পর আপনাকেও বক্তব্য দিতে হবে।" মণি সিংহ শ্রমিকদের বলেন, "আমি কি বক্তব্য দিব? আমি জীবনে কখনো বক্তব্য দেই নাই।" উত্তরে শ্রমিকরা বলেন, "ফিকির মাত কিজিয়ে স্রেফ বলিয়েগা হামলোগ পাউন্ত মাংতা, ইয়ার্ড নেহি মাংতা, যো থুক ফেকা হ্যায় উর থুক আওর নেহি চাটেগা, ব্যাস আওর কুচ নেহি।"[৮০] এসময় মণি সিংহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যায় পড়েন। একদিকে পুলিশ ও মালিকের পোষ্য বাহিনীর আক্রমণের ভয় অন্যদিকে মিল মালিকের পক্ষ নিয়ে সুভাষ বসুর আগমন। সব মিলিয়ে বিষয়টি বেশ জটিল হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রমিকদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মণি সিংহ আন্দোলনরত শ্রমিকদের নিয়ে সভার দিন কারাবালা মাঠে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখেন কারাবালা মাঠে প্রায় হাজার তিনেক শ্রমিক উপস্থিত হয়েছে, সামনে বানানো স্টেজে মিলের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত থাকলেও সুভাষ বসু তখনো উপস্থিত হননি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সুভাষবাবু এসে উপস্থিত হন এবং মিটিং শুরু হয়ে যায়। কর্মচারীরা সকলেই একে একে বক্তব্য

৭৮. মণি সিংহ, পুর্বোক্ত, পৃ, ৩৬, ৩৭।
৭৯. দৈনিক সংবাদ, পুর্বোক্ত।
৮০. মণি সিংহ, পুর্বোক্ত, পৃ, ৩৬।

দিলেন যে বিড়লারা অতি মহৎ লোক, তারা শ্রমিকদের বাবা-মা, ইয়ার্ড খুব ভালো ব্যবস্থা, তোমরা সবাই কাজে যোগ দাও। নেতাজী তার বক্তব্যে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু না বলে বলেন, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর এবং সম্ভব হলে হরতাল তুলে নাও। শ্রমিকরা এসব বক্তব্য নিস্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন, কেউ কোন টু শব্দ পর্যন্ত করছিলেন না। শ্রমিকরা এ সময় পার্শ্বের এক চায়ের দোকান থেকে একটি টেবিল আনলে মণি সিংহ তার উপর উঠে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "পেয়ারে ভাইও হামলোক পাউন্ড মাংগতা, ইয়ার্ড নেহি মাংগতা, যো থুক ফেকা হায় ও থুক ফের নেহি চাটেগা, আপলোক রায় দিজিয়ে।" এই বক্তব্য দেওয়ার পরপরই শ্রমিকদের নীরবতা ভেঙ্গে যায় এবং তারা চিৎকার করে বলতে থাকেন পাউন্ড মাংগতা, ইয়ার্ড নেহি মাংগতা, হরতাল চালু রাহেগা। শ্রমিকদের চিৎকারে চারিদিকে হট্টগোল শুরু হয়ে যায় এবং যে যার মত সরে পড়তে শুরু করে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই সভা ভেঙ্গে যায়।[৮১]

এই ঘটনার কিছুদিন পর চব্বিশ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেট দত্ত সাহেব মাটিয়াবুরুজে এসে মণি সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তার (মণি সিংহের) মামা সুরেশ সিংহের পরিচয় দিয়ে বলেন, "আমি তোমার মামার বন্ধু লোক, আমি তোমাকে জানি। আমি যে কারণে এসেছি তা হলো, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা সমঝোতা করতে প্রস্তুত আছে, তুমি তার অফিসে গিয়ে দেখা কর।" প্রত্যুত্তরে মণি সিংহ বলেন, "আমি একা যেতে পারি না, আট/দশজন শ্রমিক সাথে নিয়ে যেতে হবে।" তিনি বলেন, "তাই যাও, দেখ কোন অশান্তি বা গোলযোগ না হয়।" শেষ পর্যন্ত মিল মালিকপক্ষ ওই ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমেই কথাবার্তা চালান এবং মণি সিংহও শ্রমিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে দশজন শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে ঘনশ্যাম দাস বিড়লার অফিসে যান এবং কয়েকটি দাবি পেশ করেন। দাবিগুলো হচ্ছে: (১) পাউন্ডে মজুরি পুনঃপ্রবর্তন; (২) কাউকে চাকরি থেকে ছাঁটাই না করা; (৩) ধর্মঘটের সময়ের মজুরি প্রদান করা প্রভৃতি। মালিকপক্ষ প্রথমে ধর্মঘটের সময়ের মজুরি প্রদান করতে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত তা মেনে নেয়, কিন্তু পরববর্তীতে শ্রমিকদের সেই মজুরি আর প্রদান করা হয়নি। অন্য দাবিগুলো কোন আপত্তি ছাড়াই মেনে নেন।[৮২] ফলে মাটিয়াবুরুজের শ্রমিক আন্দোলনের এক সফল সমাপ্তি ঘটে।

---

৮১. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৬,৩৭।
৮২. *দৈনিক সংবাদ*, পূর্বোক্ত।

এই ধর্মঘট সফল হওয়ার ফলে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শ্রমিক তাদের একদিনের মজুরি দিয়ে ইউনিয়নের সভ্য হন এবং মণি সিংহসহ শ্রমিক তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীদের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শ্রমিক শ্রেণি উৎসাহিত হয়ে ওঠে, যার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য কল-কারখানায় ইউনিয়ন ও সংগ্রামের বীজ রোপিত হয়। উল্লেখ্য, মাটিয়াবুরুজের এই ধর্মঘটের সময় কলকাতা থেকে কালী সেন, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, আব্দুর রেজ্জাক খান প্রমুখ নেতৃবর্গ এসে মণি সিংহকে সাহায্য করেছিলেন।

ক্লাইভ জুট মিল

মাটিয়াবুরুজের কেশোরাম কটনমিলের শ্রমিক ধর্মঘটের পরপরই মাটিয়াবুরুজের অপর একটি জুট মিলে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। জুট মিলটির নাম ছিল ক্লাইভ জুট মিল। মূলত একজন শ্রমিককে কোন কারণ ছাড়াই ছাঁটাই করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। ১৯২৮ সালের প্রথমার্ধেই এই ধর্মঘট শুরু হয়ে কোন বিরতি ছাড়াই তা ১০ দিন চলে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ধর্মঘটের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন মণি সিংহ।[৮৩] প্রত্যহ ভোরে মণি সিংহ পিকেটিং করার জন্য মিল গেটে যেতেন এবং ধর্মঘটের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। শ্রমিক ধর্মঘট চলাকালে মিলের ১৬ জন দারোয়ান শ্রমিকদের তল্লাশি করত, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মঘটের শেষের দিকে শ্রমিকদের সাথে দারোয়ানদের সংঘর্ষ দেখা দেয়। মূলত ধর্মঘটকে বানচাল করার জন্য এটি ছিল মালিকপক্ষের একটি ষড়যন্ত্র। শ্রমিকরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয় এবং পুলিশ পাঁচজন শ্রমিককে গ্রেফতার করে।[৮৪] পুলিশি হয়রানিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে তেমন কোন ফলাফল ছাড়াই আন্দোলনটি স্তিমিত হয়ে পড়ে।

কলকাতার মেথর ও ঝাঁড়ুদার আন্দোলন

১৯২৮ সালে কলকাতায় মেথর ও ঝাঁড়ুদারদের একটি আন্দোলন সংঘটিত হয়। মেথর-ঝাঁড়ুদারদের এই আন্দোলনেও মণি সিংহ বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মেথর ও ঝাঁড়ুদারদের নিয়ে ১৯২৭ সালে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্টস পার্টি প্রথম আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের সংগঠিত করা শুরু করে। এ উদ্দেশ্যে 'The Scavengers Union of Bengal' নাম দিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করা

৮৩. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

৮৪. David, Patric, *Op cit* ,p-101.

হয়। মেথর ও ঝাঁড়ুদারদের আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালের শেষের দিকে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ড. প্রভাবতী দাস গুপ্তা, মুজাফ্ফর আহমেদ, ধরণী গোস্বামী এবং মণি সিংহ সদস্য মনোনীত হন।[৮৫] কমিটির সদস্যরা মেথরদের বস্তিতে গিয়ে তাদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করে তাদেরকে সংগঠিত এবং তাদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া নিয়ে ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে একটি জনসভা আহ্বান করেন।

১৯২৮ সালের ৪ মার্চ তারিখে মেথর ও ঝাঁড়ুদাররা নিজ উদ্যোগ থেকেই ধর্মঘট শুরু করে এবং অফিসে এসে কমিটির লোকজনকে খবর দেয়। কোন প্রস্তুতি ছাড়াই ধর্মঘট শুরু হওয়ায় কমিটির সদস্যরা একরকম হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং তারা যেসব স্থানগুলোতে ধর্মঘট শুরু হয়নি সেসব স্থানে ধর্মঘটের কাজ শুরু করেন। কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৬ দিন পূর্ণ দিবস ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় কলকাতা নগরী এক দুর্গন্ধ ও ময়লা-আর্বজনার নগরীতে রূপান্তরিত হয়। অবশেষে ৯ মার্চ কলকাতার মেয়র জে এম সেন গুপ্তের সাথে এক বৈঠকে সমঝোতা হওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।[৮৬] বৈঠকে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

(ক) কলকাতা কর্পোরেশনের মেথর ও ঝাঁড়ুদারদের বেতন দুই টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে।
(খ) ধর্মঘট করার অপরাধে কারো চাকরি যাবে না।
(গ) ধর্মঘটকালের বেতনও প্রদান করা হবে।[৮৭]

এই শর্তগুলো একটি কাগজে লিখে কর্পোরেশনের পক্ষে কর্পোরেশনের মেয়র এবং আন্দোলনকারীদের পক্ষে ড. প্রভাবতী দাস গুপ্তা, ধরণী গোস্বামী, মুজাফ্ফর আহমেদ ও মণি সিংহ স্বাক্ষর করেন। কিন্তু পরবর্তীতে কাউন্সিলরদের সভায় মেয়র এই সিদ্ধান্তগুলো পাস করাতে ব্যর্থ হয়। কাউন্সিলররা ধর্মঘটের সময়ের বেতন কর্তন কিংবা চাকরি হতে অব্যাহতি না দিলেও ২ টাকা বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটি প্রত্যাখ্যান করে, ফলে আন্দোলনকারীদের আংশিক সাফল্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।[৮৮]

---

৮৫. মুজাফফর আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৪৬৩-৪৯২।
৮৬. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৭।
৮৭. অমিতাভ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৪৪।
৮৮. মুজফফর আহমেদ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ*, (ঢাকা, ১৯৮৯), পৃ, ১২৭।

১৯২৮ সালের ১৩ এপ্রিল মজুররা তাদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত একটি নোটিস কর্পোরেশনে পাঠিয়ে দেয়, যাতে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে দাবিসমূহ মেনে না নিলে পুনরায় ধর্মঘট শুরু করার বিষয়টি উল্লেখ ছিল। কর্পোরেশন এই নোটিসের কোন মূল্য দেয়নি, এমনকি তারা নোটিসের প্রাপ্তি পর্যন্ত অস্বীকার করে। ফলে মজুররা ১৯২৮ সালের ২৪ জুন থেকে পুনরায় ধর্মঘট শুরু করে। প্রথমবারের মত কর্তৃপক্ষ এবার নিশ্চুপ থাকেনি। তারা আন্দোলনকারীদের ধর-পাকড় শুরু করে। ২৫ জুন হাজরা পার্কের মিটিং শেষে বাসায় ফেরার পথে মুজাফ্ফর আহমেদ এবং ড. প্রভাবতী দাস গুপ্তা গ্রেফতার হন।[৮৯] ২৬ জুন সকাল থেকে আন্দোলনকারীদের গণহারে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়, এমনকি আন্দোলন করার অপরাধে পুলিশ মেথর ও ঝাঁড়ুদারদের রাস্তার পার্শ্বের কল থেকে পানি সংগ্রহ ও পাবলিক টয়লেট ব্যবহারেও বাধা দিতে শুরু করে। ইতোমধ্যে মুজাফ্ফর আহমেদ ও প্রভাবতীদাস গুপ্তা জামিনে বেরিয়ে আসে।

ধর্মঘটের কারণে কলকাতা শহরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। রাস্তার দুই পাশে ময়লার স্তূপ জমে যায়, খোলা নর্দমাগুলো হতে অসহনীয় দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে আর যেসব এলাকায় খাটা পায়খানা ব্যবহৃত হত সেসবের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। অবশেষে কর্পোরেশনের মেয়র বিজয়কুমার বসু ও চিফ একজিকিউটিভ অফিসার জে সি মুখার্জি মণি সিংহ, মুজাফ্ফর আহমেদ, প্রভাবতীদাস গুপ্তা ও ধরণী গোস্বামীর সাথে মেয়র অফিসে আলোচনায় বসেন। পরবর্তীতে স্কাভেন্জার্স কনফারেন্সের মাধ্যমে আন্দোলন সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

১. মাসিক এক টাকা হিসেবে মজুরদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে;
২. গাওখানার লোকেরা যারা মাসে ১৮ টাকার বেশি রোজগার করতে পারে না তারাও মাসে এক টাকা বেশি পাবে;
৩. খোদ ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ব্যতীত কেউ মজুরদের বরখাস্ত করতে পারবে না। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক বরখাস্ত হওয়ার পরও মজুররা চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের নিকট আপিল করতে পারবে;
৪. ধর্মঘট করার অপরাধে কোন মজুরকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা যাবে না;

৮৯. মুজফফর আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৭১।

৫. ধর্মঘটের সময়ের পূর্ণ বেতন প্রদান করা হবে;

৬. ধর্মঘটের অপরাধে যে সকল মামলা দায়ের করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে;[৯০]

৬ জুলাই ১২ দিনব্যাপী এই ধর্মঘটের অবসান ঘটে।[৯১] ধর্মঘটের ফলে কলকাতা শহরকে মূলত ময়লা ও আবর্জনার শহরে পরিণত হয়েছিল। ধর্মঘট শেষ হওয়ার পর মজুররা দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে শহরকে নোংরামুক্ত করার কাজ শুরু করে এবং ৮ জুলাই নাগাদ শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

চটকল আন্দোলন

১৯২৯ সালের মাঝামাঝি চটকল মালিক সংস্থা চটকল শ্রমিকদের মহার্ঘ্যভাতা কাটার প্রস্তাব করে। চটকল মালিকদের বেশিরভাগই ছিল ব্রিটিশ এবং তাদের সংস্থাও ছিল শক্তিশালী। তারা শ্রমিকদের হরতালের কাছে সহজে নতি স্বীকার করত না। মহার্ঘ্যভাতা কাটার প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

শ্রমিকদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে শ্রমিকনেতা বঙ্কিম মুখার্জি, আব্দুর রেজ্জাক, কালী সেন, আব্দুল মোমিন, আব্দুল হালিম ও মণি সিংহ প্রমুখ মিলে মালিকদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়। ধর্মঘটের কারণ ও উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য এক লাখ লিফলেট ছাপানো হয়। যোগাযোগের জন্য মণি সিংহের বাসস্থানে টেলিফোন সংযোগ নেওয়া হয় এবং দৈনিক ভিত্তিতে একটি প্রাইভেট গাড়িও ভাড়া করা হয়। অধিকাংশ টাকার যোগান দেয় আন্দোলনের নেত্রী ড. প্রভাবতীদাস গুপ্তা, আর বাকি যৎসামান্য টাকা সংগৃহীত হয় চাঁদার মাধ্যমে।

প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মণি সিংহ এবং ইউনিয়নের অন্য নেতারা বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায় গিয়ে শ্রমিকদের সাথে একাধিক সভা করেন। মহার্ঘ্যভাতা কাটার কারণে শ্রমিকরা ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিল, ইউনিয়নের নেতাদের আহ্বানে তারা একের পর এক চটকলগুলোতে ধর্মঘট শুরু করে। বিভিন্ন মিলের প্রায় সোয়া লক্ষ

৯০. মুজফ্ফর আহমেদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৭২।

৯১ সরোজ মুখোপাধ্যায়, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৫), পৃ, ৭২।

লোক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। ধর্মঘটের প্রবলতায় মালিকপক্ষ ভয় পেয়ে যায় এবং তারা ড. প্রভাবতী দাসগুপ্তার সাথে আলোচনায় বসেন এবং আলোচনার মাধ্যমে ড. প্রভাবতী দাসগুপ্তা ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে রাজি হন।

ড. প্রভাবতী দাসগুপ্তার সিদ্ধান্তে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয় এবং কার্যকরী সভার অনুমতি না নিয়ে এককভাবে হরতাল প্রত্যাহার করায় ইউনিয়ন তাকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। ড. প্রভাবতী দাসগুপ্তাও বিভিন্নস্থানে সভা করে শ্রমিকদেরকে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং আলাদা জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন করেন। প্রভাবতীদাস গুপ্তা বের হয়ে যাওয়ার পর ইউনিয়ন আর্থিক সঙ্কটে পড়ে এবং তারাও শেষ পর্যন্ত হরতাল প্রত্যাহারের জন্য শ্রমিকদের প্রতি অনুরোধ জানায়। এভাবে এই চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমাপ্তি ঘটে।[৯২]

রিচ ওয়ার্কসপ হরতাল

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার গণহারে প্রগতিশীলদের গ্রেপ্তার শুরু করে। ফলে অনেক প্রগতিশীল নেতা-কর্মী কারারুদ্ধ হয়। গ্রেফতার এড়াতে মণি সিংহসহ অধিকাংশ কমিউনিস্ট নেতা আত্মগোপন করেন। আত্মগোপনরত অবস্থাতে তাঁরা গোপনে কার্যকরী কমিটির সভা করে মালিক পক্ষের শোষণের প্রতিবাদে ১ মে কেবলমাত্র একদিনের জন্য রিচ ওয়ার্কসপে হরতালের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে হরতালের কারণে যদি কেউ গ্রেফতার হয় কিংবা এই অপরাধে কারো চাকরি যায় তবে পরদিনও হরতাল হবে– এই মর্মে আরো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৯৩] মিলের শ্রমিক নেতারা মণি সিংহকে হরতালে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ জানালেও গ্রেফতার এড়াতে এবং ভবিষ্যতে আন্দোলনের ক্ষেত্র ঠিক রাখার লক্ষ্যে তিনি প্রকাশ্যে আসেননি। আত্মগোপনে থেকেই মণি সিংহ ঐ হরতালের সকল দিকনির্দেশনা দেয় এবং শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতালের কারণে কাউকে চাকরি হারাতে কিংবা গ্রেফতার হতে হয়নি। এভাবে মণি সিংহ আত্মগোপনে থেকে একটি সফল হরতালের দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

৯২. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৩৮-৪০।
৯৩. মুজফফর আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৪৮৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশক বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রসারের যুগ। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি শহরকেন্দ্রিক সীমা অতিক্রম করে বাংলার প্রতিটি জেলায় সম্প্রসারিত হয়, আকর্ষণ করে বিশাল জনগোষ্ঠীকে। ১৯২০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টি শহরের শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের সংগঠিত করা ও শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকে কর্মী সংগ্রহের লক্ষ্যে কাজ করেছিল। ১৯৩০-এর দশকে বাংলার প্রতিটি জেলা শহরে কমিউনিস্ট পার্টির শাখা অফিস খোলা হয় এবং এসব এলাকায় দলের ভিত্তি দৃঢ় করে তোলে পার্টিতে যোগদান করা নতুন তরুণগণ।

১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী প্রায় সকল বিপ্লবীকে মুক্তি দেয়। মুক্তি পাওয়া অধিকাংশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। দলের নির্দেশানুসারে মণি সিংহসহ অধিকাংশ কমিউনিস্ট নেতা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করে। ফলে কৃষি প্রধান এই দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা

১৯২০-এর দশকের শেষ পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্টদের দমনের লক্ষ্যে দায়ের করে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা। তারা চেয়েছিল এ মামলার মাধ্যমে বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তিকে ধ্বংস করতে। কিন্তু তা হিতে বিপরীত হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টি একে ব্যবহার করেছিল তাদের মতবাদ প্রচারের সুযোগ হিসেবে।

১৯২৯ সালের ২০ মার্চ ব্রিটিশ সরকার ভারতের কলকাতা, বোম্বে, এলাহাবাদ, দিল্লি, লাহোর ও মিরাটের ৩১ জন কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করে। যাদের গ্রেফতার করা হয় তারা হলেন মুজফফর আহমেদ, এস ভি ঘাটে, কে এন

জোগলেকার, ভি আর ঠেংরি, এস এ ডাঙ্গে, কিশোরীলাল ঘোষ, এস এইচ ঝারওয়ালা, শওকত ওসমানী, এস এস মিরাজকর, পি সি যোশী, গোপাল বসাক, এম এ মজিদ, আর এস নিম্বরকর, ডা. বিশ্বনাথ মুখার্জী, রাধারমণ মিত্র, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, শামছুল হুদা, মোহন সিং যোশী, গৌরিশঙ্কর, ড. গঙ্গাধর অধিকারী, শিবনাথ ব্যানার্জী, অযোধ্যা প্রসাদ, কেদারনাথ সেহগাল, অর্জুন আত্মারাম আলভে, গোবিন্দ, রামচন্দ্র ক্যাসলে, এম জি দেশাই, লক্ষণ রাও কদম, বি এফ ব্রাডলি, ফিলিপ স্প্রাট ও হিউলেস্টার হ্যাচিনসন প্রমুখ। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে ১২১-এ ধারায় মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়।[১] ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেক্টরের অধীন কর্মরত অফিসার মি. আর এ হরটন গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার আর্জিতে বলেন,

> রাশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নামে একটি সংগঠন আছে। সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে সারা বিশ্বে বর্তমান ধরনের সরকারগুলোর উচ্ছেদ সাধন এবং তাদের স্থলে মস্কোয় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সোভিয়েত প্রশাসনের প্রতি অনুগত এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এই সংগঠনের লক্ষ্য। উক্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কমিটি, শাখা এবং সংগঠনের মাধ্যমে তার কাজ এবং প্রচার পরিচালনা করে থাকে যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ১৯২১ সালে উক্ত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনটি ব্রিটিশ-ভারতে একটি শাখা সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, শওকত উসমানী, মুজাফ্ফর আহমেদসহ আরো কয়েকজনের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এইরূপ একটি শাখা গঠন করেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ-ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা হতে রাজা-সম্রাটকে বঞ্চিত করা। অতঃপর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক তার উদ্দেশ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিলিপ স্প্রাট এবং বেনজামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলিসহ নানা ব্যক্তিকে ভারতে পাঠিয়েছিল যাঁরা এখনও ব্রিটিশ-

১. Ahmed, Muzaffar (ed.), *Communist Challenge Imperialism From the Dock,* (Calcutta: Progressive Publisher, 1987), p. VIII.

> ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে বাস করে ব্রিটিশ-ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে রাজা-সম্রাটকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে একে অপরের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ-ভারতের ভিতর ও বাইরের বহু পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ব্রিটিশ-ভারতের ভিতর ও বাইরের ন্যায় মিরাটে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। উক্ত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মিরাটে ওয়ার্কার্স এ্যন্ড পিজেন্ট পার্টি গঠন করেন এবং তার একটি সম্মেলনও করেন। সুতরাং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এই আদালতের বিচারাধীনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা মতে অপরাধ করেছে। তাই আদালতের নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, আদালত উপরোক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন।[২]

অভিযুক্তরা তাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার না করে বরং আদালতে মার্কসবাদ ও তার তাত্ত্বিক দিক নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করা শুরু করে। আদালতের কার্যক্রমের বিবরণ বিভিন্ন সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হত, তাই কমিউনিস্টরা এটিকে পার্টির তত্ত্ব প্রচারের একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের চাইতে পার্টির বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিকগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন।[৩] এই মামলা ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের ১৬ জুলাই পর্যন্ত চলে। মামলার রায়ে প্রধান আসামি মুজফ্ফর আহমদের যাবৎজীবন কারাদণ্ড ও অন্য আসামিদের তিন থেকে বারো বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই মামলার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা কিছুটা সফল হলেও প্রকৃত অর্থে এই মামলার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে কমিউনিজমের তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং এর প্রতি জনসমর্থন বাড়তে শুরু করে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

---

২. মুজাফ্ফর আহমেদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২০-১৯২৯)*, (কলিকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি,১৯৬৯), পৃ,৬৯।

৩. Khaled, Mortuza, "*Muzaffar Ahmad and the Meerut Conspiracy Case (1929-1933)*" in *Arts Faculty Research Journal*, University of Rajshahi, 1997-98, p.346.

বাংলায় নতুন মাত্রার কমিউনিস্ট আন্দোলন

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার প্রেক্ষিতে বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে নতুন নেতৃত্ব। মূলত দুইদিক থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। একপক্ষ ছিল ইয়ং কমরেডস লীগ গ্রুপের সুধাংশুকুমার অধিকারী। ইয়ং কমরেডস লীগের নেতাদের প্রচেষ্টায় ১৯৩০ সালেই কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি অস্থায়ী কমিটি বা নিউক্লিয়াস সংগঠিত করা হয়। এই কমিটির নামকরণ করা হয় "অস্থায়ী কলকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ।" এই অস্থায়ী কলকাতা কমিটির প্রাথমিক সদস্য ছিল পাঁচজন। এঁরা হলেন (১) সুধাংশুকুমার অধিকারী; (২) অবনী চৌধুরী; (৩) এ এম এ জামান; (৪) জগজ্জিত সরকার; এবং (৫) নদীয়া জেলার একজন কৃষক (নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি)। কিন্তু সুধাংশুকুমারের গ্রেপ্তার ও কমিটির অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে এই কমিটির সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

অপরদিকে ১৯৩০ সালে রণেন সেন, অবনী চৌধুরী (তিনি সুধাংশুকুমার অধিকারী কর্তৃক গঠিত অপর গ্রুপটিরও সদস্য ছিলেন), রমেন বসু ও অনিল ব্যানার্জী– এই চার জন তরুণ নতুন করে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৪] ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা আব্দুল হালিম জেল থেকে ছাড়া পেলে পার্টি গঠনের প্রচেষ্টা আরো জোরদার হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে আব্দুল হালিমকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় "কলকাতা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অংশ"। এই কমিটির সদস্য ছিল পাঁচজন; (১) আব্দুল হালিম-সাধারণ সম্পাদক; (২) রণেন সেন; (৩) অবনী চৌধুরী; (৪) রমেণ বসু এবং (৫) অনিল ব্যানার্জী।[৫] পরবর্তীতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা কমিটিকেই কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিতে রূপান্তরিত করা হয়। অর্থাৎ

---

৪. ধরণী গোস্বামী, "*ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়*," পরিচয়, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ২-৩, ১৯৭৩, পৃ, ১১৩।

৫. রণেন সেন, বাঙলায় *কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮)*, (কলকাতা : বিংশ শতাব্দী, ১৯৮১), পৃ, ১২৭।

"কলকাতা কমিটি" নামের পরিবর্তে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি নামকরণ করা হয়, পরবর্তীতে এই কমিটির তত্ত্বাবধানে কলকাতা হাওড়াসহ বিভিন্ন জেলা কমিটি গঠিত হয়।[৬]

বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই যুগে (১৯২৮-৩৫) "কলকাতা কমিটি" ছাড়াও আরো কিছু বামপন্থী দল বা গোষ্ঠী গড়ে উঠে। এদের কর্মক্ষেত্র ছিল মূলত কলকাতা এবং এর পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে (১) নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের বেঙ্গল লেবার পার্টি; (২) ইন্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভিলিউশনারি পার্টি (আইপিআরপি) বা গণনায়ক পার্টি; (৩) সাম্যরাজ পার্টি; (৪) বেঙ্গল কীর্তি-কিষাণ পার্টি; (৫) কারখানা গ্রুপ; (৬) লাল নিশান গ্রুপ; (৭) সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কমিউনিস্ট লীগ অব ইন্ডিয়া; (৮) মানবেন্দ্র নাথ রায়ের দি রেভলিউশনারি পার্টি অব দি ইন্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাসেস (আরপিআইডবিউসি); (৯) যশোর খুলনা যুব সংঘ; (১০) অভয় আশ্রয় গ্রুপ বা বেঙ্গল লেবার অ্যাসোসিয়েশন-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত বামপন্থী গ্রুপগুলো ছাড়া এ সময় বাংলায় আরো দু-একটি ছোট ছোট বামপন্থী দল ছিল, তবে এদের অধিকাংশই ১৯৩৫ সালের মধ্যে নিজেদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মূল অংশে যোগ দেয়।

বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম, ১৯৩০-১৯৩৫

'কলকাতা কমিটি' গঠনের পর থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ও সভ্য সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। এসময় জাতীয় কংগ্রেসের আপসকামী রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দেশের শিক্ষিত জনগণের বড় একটি অংশ কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এছাড়া কংগ্রেস আন্দোলন, জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি সংগঠনের বহু পরীক্ষিত সৈনিকরাও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়া অব্যাহত রাখে। ১৯৩১ সালের আগস্ট মাসে সোমনাথ লাহিড়ী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন, ১৯৩১-৩২ সালের মধ্যে মন্মথ চ্যাটার্জী, সত্য ঘোষ, সরোজ মুখোপাধ্যায়, মুহাম্মদ ইসমাইল, আব্দুল মোমিন, গেন্দা সিং প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।[৭]

৬. অমিতাভ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১২।
৭. মুজাফ্‌ফর আহমেদ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ*, (ঢাকা, ১৯৮৯) পৃ, ৭৮।

এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি মূলত শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে কাজ করত। কৃষকদের মধ্যে কাজ তখনও সেভাবে শুরু হয়নি, যদিও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলছিল। ঢাকা চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলেও মূল কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ প্রধানত কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলার শিল্পাঞ্চলে সীমিত ছিল। হুগলী ও বর্ধমানেও এসময় আইপিআরপি'র সহযোগিতায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছিল।

১৯৩২ সালের শেষদিকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলাসহ অন্যান্য জেলার শিল্পাঞ্চলের চটকলগুলোর প্রায় চার লক্ষ শ্রমিক এক ধর্মঘটে শামিল হন। ড. ভুপেন্দ্র নাথ, বঙ্কিম মুখার্জী, আব্দুল মোমিন ও কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য নেতারা এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন। এসময় ব্রিটিশ সরকারের দমন ও পীড়নমূলক নীতির কারণে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নামে কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।[৮]

সরকারি নির্যাতন থেকে নিজেদের রক্ষা করা এবং নতুন নামে প্রকাশ্যে কাজ করার উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আব্দুল হালিম এবং কলকাতা কমিটির অন্য সদস্যদের প্রচেষ্টায় 'ওয়ার্কার্স পার্টি অব ইন্ডিয়া' নামে একটি প্রকাশ্য দল গঠন করা হয়।[৯] কমিউনিস্ট পার্টির ছাড়াও প্রগতিশীল অন্যান্য দল ও গোষ্ঠীর বেশ কিছু সদস্য নব গঠিত এই দলে যোগ দেন। কিন্তু তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নিদের্শনার কারণে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওয়ার্কার্স পার্টি অব ইন্ডিয়া নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নিদের্শনা অনুসারে কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত করা ও কমিউনিস্ট পার্টির নামে কার্যক্রম পরিচালনা করতে শুরু করে।[১০] ফলে তরুণ কর্মীদের এ উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

১৯৩৩ সালে 'কলকাতা কমিটির' উদ্যোগে ভারতবর্ষের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অনুগামী বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোর অংশগ্রহণে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির

---

৮. Ahmed, Muzzaffar, *op.cit*, p-176.

৯. জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৬৮), পৃ, ১৭।

১০. Khaled, Morutza, *A Study in Leadership: Muzaffar Ahmad and the Communist Movement in Bengal.* (Calcutta: Progressive Publishers, 2001), pp. 60-61.

সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে 'কলকাতা কমিটির' তরফ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন আব্দুল হালিম, সোমনাথ লাহিড়ী ও রণেন সেন। এছাড়াও ঐ সর্বভারতীয় সম্মেলনে ড. গঙ্গাধর অধিকারী, পূরণচাঁদ যোশী, এস জি পাটকর, এম এল জয়মন্ত, গুরুদিৎ সিংসহ শীর্ষ স্থানীয় সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ড. গঙ্গাধর অধিকারীর লেখা খসড়া রাজনৈতিক থিসিসটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় এবং যোগদানকারী সকলকে নিয়ে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিও গঠিত হয়।[১১] ড. গঙ্গাধর অধিকারী পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং তাঁর থিসিসটি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নিকট পাঠানো হয়। ১৯৩৪ সালের ২০ জুলাই থিসিসটি *INPRECOR* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং থিসিসের বক্তব্য গ্রহণ করেছে।[১২] উল্লিখিত ঘটনাগুলো ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ব্রিটিশ সরকার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি সংগঠন বলে ঘোষণা করে।[১৩]

ব্রিটিশ সরকার শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি সংগঠন ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, ১৯৩৫ সালের ৭ মার্চ গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলার আরো ১৩টি রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনকে বে-আইনি ঘোষণা করে। নিষিদ্ধ সংগঠনগুলোর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটি ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নও ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই গোপন কার্যক্রমের ধারায় অভ্যস্ত ছিল, তাই নিষিদ্ধ হওয়ায় তা দলের উপর খুব বেশি বৈরী প্রভাব ফেলতে পারেনি। গোপন অবস্থাতেও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯৩৫ সালের মে মাসে কেশোরাম কটনমিলে ৫,০০০ শ্রমিকের এক ধর্মঘট সংঘটিত হয়।[১৪]

১৯৩০ দশকের মধ্যভাগে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার অধিকাংশ আসামি মুক্তি পায়। সরকারও কমিউনিস্টদের প্রতি অপেক্ষাকৃত নমনীয় আচরণ শুরু করে। এ

---

১১. Adhikari, Gangadhar, *op.cit*, p-155.
১২. অমিতাভ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৫।
১৩. অমিতাভ চন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৫।
১৪. জ্ঞান চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২১।

নমনীয়তার কারণ ছিল মূলত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। এসময় ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা শুরু হয়। এ অবস্থায় ১৯৩৫ সালে মস্কোতে কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে গ্রহণ করা হয় জর্জ দিমিত্রভের যুক্তফ্রন্ট নীতি।

ইউনাইটেড ফ্রন্ট নীতি

১৯৩৫ সালের ২৫ জুলাই থেকে ২১ অগাস্ট মস্কোতে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন, যাদের মধ্যে জার্মানির বেলা কুন ও অটো কুশিনিন, চীনের ওয়াং মিং, সোভিয়েত ইউনিয়নের টগলিয়াত্রি, বুলগেরিয়ার মেনিউস্কি এবং জর্জ দিমিত্রভ প্রমুখের নাম অন্যতম। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের উত্থান এবং তাদের কমিউনিস্ট বিরোধী অবস্থান, পরাধীন ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও কমিউনিস্টবিরোধী নীতি এবং ষষ্ঠ কংগ্রেসের অতিবাম নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হবে কিনা– এই বিষয়গুলো ছিল কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সম্মেলনে বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট জর্জ দিমিত্রভ কর্তৃক উত্থাপিত 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট নীতি' গুরুত্ব লাভ করে। এই নীতির মূল বক্তব্য ছিল, বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ হলো কমিউনিজমের প্রধান শত্রু। এ অবস্থা মোকাবিলার জন্য কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে সহযোগিতা করে রাজনীতি করা উচিত। ভারত প্রসঙ্গে জর্জ দিমিত্রভ প্রস্তাব করেন,

> In India, the Communists have to support, and participate in anti-imperialist mass activities, not excluding those, which are under national reformist leadership. While maintaining their political and organizational independence, they must carry on active work inside the organizations, which take part in the Indian National Congress, facilitating the process of crystallization of National revolutionary wing among them, for the purpose of further developing the national liberation movement of the Indian people against British Imperialism.[১৫]

১৫. Georgi Dimitrov, *Selected Speeches and Articles*, (New Delhi: The People's Publishing House, 1971), p-3.

ইউনাইটেড ফ্রন্ট নীতি-তে ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ কমিউনিস্ট এর তীব্র বিরোধিতা করে এবং তারা কংগ্রেসের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে অস্বীকার করে। ১৯৩৬ সালে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃক গৃহীত নতুন নীতি সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির দু'জন নেতৃস্থানীয় সদস্য রজনী পাম দত্ত ও ব্রেন ব্রাডলে ভারতীয় কমিউনিস্টদের জন্য "The Anti-Imperialist People's Front" নামে একটি দলিল প্রস্তুত করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র *Inprecor*-এ প্রকাশ করে। এই দলিলটি ইতিহাসে 'দত্ত-ব্রাডলে থিসিস' নামে পরিচিত। থিসিসে ভারতীয় কমিউনিস্টদের ইউনাইটেড ফ্রন্ট লাইন কার্যকর করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হয়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে "For the United National Front" নামে একটি দলিল দলীয় মুখপত্র *কমিউনিস্ট*- এ প্রকাশ করে ইউনাইটেড ফ্রন্ট লাইন অনুসরণের ঘোষণা দেয়।[১৬] এভাবে আন্তর্জাতিক চাপে বাংলার কমিউনিস্টগণ যুক্তফ্রন্ট নীতি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ময়মনসিংহের কৃষক আন্দোলন

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ১৯৩০ সালের মে মাসে গ্রেফতার হন এবং বিভিন্ন জেল ঘুরে ১৯৩৫ সালে শেষের দিকে তাঁকে সুসং-দুর্গাপুরে নিজ বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখা হয়।[১৭] শর্ত ছিল তাঁকে প্রতিদিন একবার করে থানায় হাজিরা দিতে হবে এবং নিজ গ্রাম ও গ্রাম সংলগ্ন এলাকার বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না।

গ্রামে বাস করার সময় স্থানীয় এক জমিদার কর্তৃক জনৈক রাজমিস্ত্রিকে ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করাকে কেন্দ্র করে মণি সিংহের সাথে জমিদারের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

---

১৬. *The Communist*, Vol. I. March 15, 1937, p, 1-6.
১৭. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,১৯৯১), পৃ,৪৫।

এই দ্বন্দ্বের কারণে জমিদার তাঁর নামে আই.বি-তে একটি অভিযোগ দাখিল করে যাতে 'মণি সিংহ নজরবন্দি থাকা অবস্থায় সরকারি রীতি লঙ্ঘন করে সুসংয়ে রাজনীতি করছেন'– মর্মে অভিযোগ করা হয়। আই.বি এর পক্ষ থেকে ঘটনা তদন্ত করা হয়। তদন্ত চলাকালে নেত্রকোনার এস.ডি.ও পাট উৎপাদন কম করার জন্য একটি জনসভার আয়োজন করলে মণি সিংহ উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি স্থায়ীয় কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা, জমিদার কর্তৃক নির্যাতন, প্রশাসন কর্তৃক অত্যাচারিতদের সাহায্য না করে জমিদারদের সাহায্য করা, কৃষকদের দুর্দশা, সরকার কর্তৃক পাটের নিম্নমূল্য স্থির প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন যা স্থানীয় জমিদার ও প্রশাসন উভয়ের গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং মামলার রায়ে তিন বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অবশ্য পরবর্তীতে আপিলের মাধ্যমে সাজার মেয়াদ হ্রাস করে দেড় বছর করা হয়। ঢাকা জেলে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁকে আইন বহির্ভূতভাবে নদীয়া জেলার করিমপুর থানার এক গণ্ডগ্রামে অন্তরীণ করে রাখা হয়।[১৮]

১৯৩৭ সালে সমগ্র বাংলায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভা গঠনের পর সরকার বিনা বিচারে আটক বন্দিদের মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বিনা বিচারে আটক এগারশ বন্দির একটি তালিকা করে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়। মণি সিংহ এই এগারশ জনের তালিকায় ছিলেন এবং ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি তিনি নদীয়া জেলার করিমপুর থানা থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর মণি সিংহ প্রথমে কলকাতায় যান কিন্তু সেখানে বন্ধু কমিউনিস্টদের কারো সন্ধান না পাওয়ায় এবং বাসায় অসুস্থ মা থাকায় তাঁকে দেখার জন্য সুসং-দুর্গাপুরে আসেন এবং পরবর্তীতে টঙ্ক আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন।

টঙ্ক আন্দোলন

ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাংশ ঘেঁষে গাড়ো পাহাড়ের অবস্থান। দীর্ঘদিন ধরে এই পাহাড়িয়া অঞ্চল ছিল সুসং-দুর্গাপুর জমিদারির অন্তর্গত। তেমন কোন চাষাবাদ না হলেও এখানকার জমিদাররা ছিল বিপুল অরণ্য সম্পদের মালিক। এছাড়া হাতির

১৮. ঐ।

ব্যবসা করেও তারা প্রভূত ধন-সম্পদ উপার্জন করত। এখানকার আদিবাসী হাজং প্রজারা প্রতি বছর একই জমি চাষ না করে 'ঝুম' প্রথায় চাষাবাদ করত। জমিদারকে তারা নির্দিষ্ট হারে কোন খাজনা দিতো না, তবে এর পরিবর্তে হাতি খেদার সময় তাদের বিনা পারিশ্রমিকে কায়িক শ্রম প্রদান করতে হত। এই হাতি খেদাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। হাতি বিক্রয় করে জমিদাররা প্রভূত ধন-সম্পদ উপার্জন করলেও কৃষকদের কোন পারিশ্রমিক তারা দিত না। যে সকল প্রজা একাজে অবাধ্য হত তাদের উপর নেমে আসত অমানুষিক নির্যাতন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই অঞ্চলের প্রতি ব্রিটিশ বণিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তারা এলাকাটিকে জমিদারদের হাত থেকে নিজেদের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে। মোঘল আমলের কাগজপত্র নিয়ে জমিদাররা প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত মামলা চালায় এবং তাদের পক্ষেই রায় হয়। কিন্তু পরে ১৮৬৯ সালে 'গাড়ো পাহাড় অ্যাক্ট' প্রণয়ন করে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার সমস্ত পাহাড় অঞ্চলকে ব্রিটিশ সরকারের অধিকারভুক্ত করে। ফলে জমিদাররা আয়ের অন্য কোন পথ না থাকায় আদিবাসী গাড়ো, হাজং প্রভৃতি প্রজাদের থেকে খাজনা আদায়ের সিদ্ধান্ত নেয়। স্থির হয় প্রত্যেক পরিবার থেকে পৃথকভাবে খাজনা আদায় না করে গ্রাম ভিত্তিতে খাজনা আদায় করা হবে। গ্রামের মোড়লরা কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করে জমিদারের পাওনা মিটিয়ে দিবে। এই আকস্মিক খাজনা ধার্যের বিরুদ্ধে প্রজারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহ করে। ১৮৯০ সালে সংঘটিত এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে জমিদাররা হাজংয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত হাজংরা জমিদারদের খাজনার দাবিকে বাধ্য হয়েই স্বীকার করে নেয়।[১৯] জমিদারের খাজনার দাবি স্বীকৃত হওয়ার পর পতিত জমিতে তারা নতুন নতুন পত্তন করতে থাকে। এসব জমির খাজনা অল্প হলেও জমি নেওয়ার সময় প্রজাদের মোটা সালামি দিতে হত।[২০] অধিকাংশ কৃষক এই সালামি দিতে অপারগ হওয়ায় কৃষকদের সাথে জমিদারদের বন্দোবস্ত হয় যে, জমির জন্য কৃষককে টাকায়

---

১৯. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৬), পৃ, ১৮৯।

২০. সুসং-দুর্গাপুরের বিশিষ্ট কৃষকনেতা *দুর্গা প্রসাদ তেওয়ারীর সাক্ষাৎকার*, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০০৩, স্থানঃ তার নিজস্ব বাসভবন।

খাজনা দিতে হবে না, তারা কেবলমাত্র ফসলে খাজনা দিবে, কিন্তু এই খাজনা টাকায় প্রদেয় খাজনার মত নির্দিষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ ফসলের উৎপাদনের উপর তা নির্ভরশীল না থেকে জমি বিলির সময়ই নির্দিষ্ট হারে ধার্য হবে। অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদির জন্য ফসল না হলেও কৃষকদের নির্দিষ্ট হারে ফসল খাজনা হিসেবে দিতে হবে। নির্দিষ্ট হারে ফসলে প্রদেয় এই খাজনা প্রথাকেই বলা হয় টঙ্ক প্রথা।[২১]

জমিতে টঙ্ক খাজনা প্রদানকারী কৃষকের কোন জোতস্বত্ব ছিল না। ফলে জমিদার প্রতি বছরই নতুন নতুন কৃষককে ইচ্ছামত হারে খাজনা নির্দিষ্ট করে জমি বিলি করত। কিন্তু টঙ্ক ধানের ঋণের বোঝা মৃত কৃষকদের সন্তানদেরও বইতে হত। কৃষকদের জমির কোন জোতস্বত্ব না থাকলেও তাদের ঋণের দায়িত্ব ছিল পুরুষানুক্রমিক।[২২] এ প্রথা ব্যবহার করে স্থানীয় জমিদারগণ কৃষকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। পক্ষান্তরে কৃষকগণও এগিয়ে যায় তা প্রতিরোধে। শুরু হয় টঙ্ক আন্দোলন।

অসুস্থ মাকে দেখার জন্য মণি সিংহ সুসং দুর্গাপুরে আসার কয়েকদিন পর স্থানীয় কৃষকরা তাঁর সাথে দেখা করে টঙ্ক প্রথার অত্যাচার ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়। প্রথমে এই কৃষক আন্দোলন শুরুর বিষয়ে মণি সিংহ দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ কলকাতায় একাধিক সফল শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তার ছিল না। তাছাড়া যাদের বিরুদ্ধে টঙ্ক আন্দোলন করতে হবে তারা সবাই ছিল মণি সিংহের আত্মীয়, এমনকি তাঁর নিজ পরিবারের কিছু জমিও টঙ্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত মণি সিংহের কাছে জীবনাদর্শ ও কর্তব্যবোধই বড় হয়ে ওঠে এবং তিনি টঙ্ক আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেন।

ময়মনসিংহ জেলার কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী ও শ্রীবর্দী এই পাঁচটি থানা সুসং জমিদারির অন্তর্গত ছিল এবং এখানে যে টঙ্ক প্রথা প্রচলিত ছিল

---

২১. প্রমথ গুপ্ত, *যে সংগ্রামের শেষ নেই*, (কলিকাতা : কালান্তর প্রকাশনী), পৃ, ৫৬-৫৭।
২২. বদরউদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৯০।

তা খুবই কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে সাত থেকে পনেরো মণ ধান দিতে হত। অথচ সে সময় জোত জমির খাজনা ছিল সোয়া এক একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ধানের বাজার দর ছিল প্রতি মণ সোয়া দুই টাকা। ফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হত এগার থেকে প্রায় সতেরো টাকা।[২৩]

১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে আমন ধানের মৌসুমে মণি সিংহ টঙ্ক আন্দোলন শুরু করেন। কৃষক নেতাদের সহযোগিতায় টঙ্ক অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে একের পর এক সভার মাধ্যমে তিনি কৃষকদের সংগঠিত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই আন্দোলন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমেই তা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিকাশ লাভ করে। কৃষকরা টঙ্ক ধান দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে ১৯৩৯ সালের টঙ্ক মৌসুমে (মাঘ মাসকে/জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি টঙ্ক ধান আদায়ের ভরা মৌসুম বলা হয়) জমিদাররা এক-চতুর্থাংশের বেশি ধান আদায় করতে ব্যর্থ হয়।[২৪] মণি সিংহেরও নিজস্ব টঙ্ক জমি ছিল, তিনি তার আদায়যোগ্য টঙ্ক কৃষকদের মওকুফ করে দেন।

টঙ্ক আন্দোলনে কৃষকদের মূল দাবি ছিল টঙ্ক প্রথার উচ্ছেদ করে তদস্থলে জোতস্বত্বের হিসাব অনুযায়ী খাজনা ধার্য করা এবং সেই নিরিখে টাকায় অথবা ধানের মাধ্যমে খাজনা প্রদান। কৃষকরা অহিংস ও আইনসঙ্গত আন্দোলনের পক্ষে ছিল। তারা টঙ্ক ধান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু তারা সবসময় জোতস্বত্বের হিসাব অনুযায়ী খাজনা প্রদান করতে রাজি ছিল।[২৫] আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য স্লোগানসমূহ ছিল (১) টঙ্ক প্রথার উচ্ছেদ চাই (২) টঙ্ক জমির স্বত্ব চাই (৩) জোতস্বত্ব নিরিখ মত টঙ্ক জমির খাজনা ধার্য করতে হবে (৪) বকেয়া টঙ্ক মওকুফ করতে হবে (৫) জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ চাই (৬) সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক (৭) ধানী খাজনা দিব না, চলতি হারে টাকায় খাজনা দিব (৮) জমি হতে উচ্ছেদ করা চলবে না (৯) সেলামি আদায় চলবে না ইত্যাদি।[২৬]

---

২৩. দৈনিক মাতৃভূমি, ২৮ জুলাই, ২০০১ (মণি সিংহের জন্মশতবার্ষিকীর বিশেষ ক্রোড়পত্র)।
২৪. দৈনিক মাতৃভূমি, জুলাই ২৮, ২০০১ (মণি সিংহের জন্ম শতবার্ষিকীর বিশেষ ক্রোড়পত্র)।
২৫. ঐ, পৃ, ৪৯।
২৬. শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ # XXXi/১৫২-১৫৩# এস.সেপ. ২০০১,পৃ ১০৬।

ব্রিটিশ সরকার গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে যে পূর্বে যেসব এলাকায় কোন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হয়নি এবং তাদের প্রতি অনুগত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে কমিউনিস্টরা প্রভাব বিস্তার করছে। তাই তারা উক্ত এলাকাগুলোকে পুনরায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং টঙ্ক প্রথার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার লক্ষ্যে গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচটি থানা যথা, কলমাকান্দা, সুসং-দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী ও শ্রীবর্দীতে জরিপের উদ্যোগ নেয়।

জরিপ শেষে ব্রিটিশ সরকার একর প্রতি উৎপাদনের সাথে সমন্বয় রেখে নতুন করে টঙ্ক হার নির্ধারণ করে দেয়। নতুন নিয়মানুযায়ী টঙ্ক ধানের হার বেশিরভাগ জায়গায় অর্ধেক হয়ে যায় এবং কোন কোন স্থানে তা অর্ধেকেরও নিচে নেমে আসে। তাছাড়া যার বছরে যে টঙ্ক খাজনা আছে--তার সমপরিমাণ--বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আট কিস্তিতে পরিশোধ করে দিলে জমির স্বত্ব কৃষকের হয়ে যাবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২৭] এভাবে ১৯৪০ সালের দিকে টঙ্ক প্রথার কিছুটা সংশোধন করা হয়। সরকার কর্তৃক টঙ্ক প্রথার এই সংশোধনের পর কৃষকরা কিছুটা পরিত্রাণ পায়। অন্যদিকে আন্দোলনের নেতারা কৃষকদের কথা বিবেচনা করে এবং এরপরেও আন্দোলন চালিয়ে গেলে সরকারের চরম দমন-নিপীড়ন শুরু করবে–এই ভেবে তারাও সাময়িকভাবে এটা মেনে নেয়।

মূলত এসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু এবং ব্রিটিশ সরকারের তাতে যোগদানের কারণে তারা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিল। তারা অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করতে চায়নি। তাই জরিপ করে তারা এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যার মাধ্যমে জমিদার ও কৃষক উভয়কে খুশি রাখা যায়। আর এভাবে আংশিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে টঙ্ক আন্দোলনের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

বাংলায় যখন পুরোমাত্রার টঙ্ক আন্দোলন চলছিল ঠিক সেই সময় অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ভারতের ভাইসরয়

২৭. ঐ, পৃ, ৫৩।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এক ঘোষণার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়। মূলত ভারতবর্ষের জনগণ ছিল এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী। তাই শহরাঞ্চলের শ্রমিক ও সাধারণ জনতা এবং গ্রামের কৃষকরাও এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সুসং-দুর্গাপুর, নালিতাবাড়ী, করিমগঞ্জ, বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ, প্রভৃতি স্থানের কৃষকরা প্রকাশ্য সভা, শোভাযাত্রা, প্রভৃতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ঠিক রাখার জন্য 'ভারত রক্ষা আইন'র মাধ্যমে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার ও অন্তরীণ করতে শুরু করে। এ সময় 'ভারত রক্ষা আইন'র অধীনে বাংলার বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার ও স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়।[২৮] ফলে ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে মণি সিংহসহ বাংলা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার নেতৃস্থানীয় প্রায় সকল কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তারের ভয়ে আত্মগোপন করে। কিন্তু এরপরও মণি সিংহসহ বাংলার অধিকাংশ কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করে।

১৯৪১ সালের ২২ জুন নাৎসি জার্মানি বিপুল সৈন্য নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর হামলা চালায় এবং প্রাথমিকভাবে সাফল্যও পায়। ২৫ জুন স্ট্যালিন ঘোষণা করেন, "হিটলার বাহিনীর প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও সোভিয়েত জনগণের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং হিটলারের পরাজয় অনিবার্য। কারণ সোভিয়েত জনগণ দেশপ্রেমিক ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদী, বিশ্বের প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাকামী জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে আছে।"[২৯] হিটলারের এই সাফল্যে ভারতবর্ষের অনেকেই উল্লসিত হয়, কারণ হিটলার ভারতবর্ষের শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল।[৩০]

সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা, ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে জার্মান-বিরোধী ঐক্য গড়ে ওঠে ১৯৪১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' (People's War) বলে ঘোষণা

২৮. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী), পৃ, ৫৮-৬২।
২৯. অনিল বিশ্বাস (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৯৫।
৩০. সরল চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৩), পৃ, ৩৬৯।

করে যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করার কথা বলা হয়।[৩১] বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়, পর্যায়ক্রমে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ পায়।

১৯৪২ সালের মে মাসে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই মণি সিংহ নেত্রকোনা শহরে জেলার চতুর্থ কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন। ত্রিপুরার বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ইয়াকুব মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের কলকাতা থেকে বঙ্কিম মুখার্জী, ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতিবসু ও মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। সম্মেলনে বক্তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।[৩২]

কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলন শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি এ আন্দোলনকে সমর্থন করেনি।[৩৩] কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে, এই মুহূর্তে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাই সবার প্রাথমিক ও জরুরি কর্তব্য। কারণ, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর প্রধান শত্রু।[৩৪] ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত সমাজ কমিউনিস্টদের এই জনযুদ্ধের নীতির তাৎপর্য ও যুক্তি গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ, তারা ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ফলে ব্রিটিশদের প্রতি এতটাই বীতশ্রদ্ধ ছিল যে, সমগ্র বিশ্বের সার্বিক প্রেক্ষাপট তাদের কাছে বিবেচ্য ছিল না। অন্যদিকে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' আন্দোলনসহ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একের পর এক কর্মসূচি দিতে শুরু করে।

জনযুদ্ধকালে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ পায় এবং এ সুযোগের সদ্ব্যবহারের চেষ্টাও তারা করে। এক্ষেত্রে মণি সিংহ ছিল

---

৩১. Bhattacharyya, *Buddhadeva* (ed.). *Colonial India: Ideas and Movements,* (Calcutta: Progressive Publishers), p. 261.

৩২. প্রমথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৭৪-৭৫।

৩৩. Colonial India: Ideas and Movements, *op.cit*, p- 263.

৩৪. রণেন সেন, *বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮)*, (কলকাতা : বিংশ শতাব্দী, ১৯৮১), পৃ, ১৯৫।

অগ্রগামী, তিনি কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ময়মনসিং জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। মূলত পাহাড় অঞ্চলে পার্টির একটি শক্তিশালী ইউনিট গড়ে তোলাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তাঁর উদ্যোগে পাহাড়ি হাজংদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার লক্ষ্যে হাজংদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্লাস নেওয়া শুরু হয়। রাজনৈতিক ক্লাস নেওয়ার ফলে হাজংদের মধ্যে দক্ষ নেতা-কর্মী ও ভলান্টিয়ার তৈরি হয়, যারা পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৩ সালে কিছুটা আধা-গোপন ও আধা-প্রকাশ্য অবস্থায় ময়মনসিং জেলা কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গঠনের সময় কমিউনিস্ট নেতা মুজাফফর আহমদ ও ধরণী গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। জেলা কমিটিতে তখন সভ্য ছিলেন খোকা রায়, পুলিন বক্সী, মণি সিংহ, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী, রবি নিয়োগী, পবিত্র শঙ্কর, প্রমথ গুপ্ত ও আলতাব আলী।[৩৫] এই কয়েকজনকে নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা কমিটি গঠিত হয় এবং খোকা রায়কে সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন, নালিতাবাড়ী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৩৯ সালে কিশোরগঞ্জ জেলা কৃষক সম্মেলনের পর আর কোন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪৩ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়িতে পঞ্চম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন রংপুরের বিশিষ্ট কৃষকনেতা মণিকৃষ্ণ সেন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ভবানী সেন। সম্মেলনে প্রায় সাত হাজার লোক সমবেত হয় এবং তারা টঙ্ক প্রথার সংস্কারের পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদের দাবি জানায়।[৩৬]

সম্মেলনের 'খাদ্য সমস্যা ও সংগঠন' ক্ষেত মজুরদের ন্যায্য মজুরি, পাট চাষ ও পাটের দর, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তেভাগা সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।[৩৭] তাছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ ব্যবস্থা, জল নিষ্কাশন, খাল

---

৩৫ অনিল বিশ্বাস (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১২৯।
৩৬ প্রমথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৭৬।
৩৭ ঐ, পৃ, ৭৮।

কাটা, বাঁধ নির্মাণ, বীজ ধান সংগ্রহ করা, পতিত জমি আবাদ করা, জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করা, মামলা-মোকদ্দমা নিস্পত্তির জন্য সালিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৩৮] নালিতাবাড়ীর এই সফল সম্মেলন মণি সিংহসহ কমিউনিস্টদের ভবিষ্যৎ আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহিত করে। ফলে পরবর্তীতে তারা অগ্রসর হয় আরও বড় সম্মেলন করতে, যার প্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনায় আয়োজন করা হয় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন।

নেত্রকোনার সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কমিউনিস্ট পার্টি সরকারি নির্যাতনের ফলে অধিকাংশ সময় প্রকাশ্যে রাজনীতি করার তেমন একটা সুযোগ পায়নি বললেই চলে। এই দলের কর্মকাণ্ড দমনে সরকার সদা খড়্গহস্ত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রেক্ষাপট অনেকটাই পরিবর্তিত হয়, এসময় কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতায় কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পায়। কমিউনিস্ট পার্টি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দলের নতুন নতুন শাখা গঠন, সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটিগুলো পুনর্গঠন এবং কৃষকের মাঝে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করে।

রাজনৈতিক এই ডামাডোলে নালিতাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে নেত্রকোনায় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্মেলনের স্থান হিসেবে নেত্রকোনা শহরে নদীর পাড়ে প্রায় একশ একরের একটি মাঠ নির্বাচন করা হয়। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইঞ্জিনিয়ার অজিত বসুর নকশা অনুযায়ী ভলান্টিয়ারার প্রায় তিনমাস পরিশ্রম করে প্রকাশ্য সম্মেলনের জন্য চারিদিকে ধারার বেড়ায় পরিবেষ্টিত একটি বিরাট প্যান্ডেল নির্মাণ করে। যার মধ্যে ১২টি তোরণ, বিভিন্ন বিভাগের জন্য অফিস, বৃহৎ রন্ধনশালা, খাদ্য গ্রহণ ও পরিবেশনের জন্য ২০টি চালা ঘর, টিনের মজবুত বৃহৎ রসদাগার, সংক্রামক রোগীর জন্য পৃথক আবাসন ব্যবস্থা, প্রশস্ত হাসপাতাল, দশ হাজার লোকের ব্যবহারোপযোগী শৌচাগার ইত্যাদি। প্রধান তোরণে প্রদর্শনীর মধ্যস্থলে ছিল আট ফুট লম্বা সংগ্রামী হাজং কৃষক হৃদয় সরকারের

---

৩৮ মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮৩।

অবয়বে এক মৃন্ময় মূর্তি। নেত্রকোনা মিউনিসিপ্যাল শহর ও সম্মেলন স্থলের যোগাযোগ রক্ষার জন্য মগড়া নদীর উপর দুটি বাঁশের সেতু নির্মাণ করা হয়। মেডিকেল স্কোয়াড, পানীয় সরবরাহকারী দল, স্যানেটারি বিভাগ, ফায়ার ব্রিগেড, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক দল ও অফিস ঘর ছিল। এছাড়া মহিলা প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল অবস্থিত একটি সুরক্ষিত স্কুলগৃহে।[৩৯]

সম্মেলনের জন্য এই অস্থায়ী নগর প্রস্তুত করতে পঞ্চাশ হাজার বাঁশ, চল্লিশ হাজার চাটাই, বেড়ার জন্য এক লক্ষ তারাই বাঁশ, কয়েক মণ রশি ও লোহালক্কর ছিল প্রধান উপকরণ। আদিবাসী কৃষকরা নিজ নিজ দা, কুড়াল, কোদাল, শাবল প্রভৃতি নিয়ে রুটিন মত ২০/২৫ জনের একটি করে দল পাহাড় সীমান্ত হতে দশদিনের জন্য আসত।[৪০] হাজার হাজার কৃষক মহা আনন্দে স্বেচ্ছায় শ্রমদানের মাধ্যমে এই কাজগুলো সম্পন্ন করে। পুরুষদের পাশাপাশি যুইফুল রায়ের নেতৃত্বে একদল মহিলাও গ্রামে গ্রামে মহিলাদের মধ্যে সম্মেলনের খবর পৌছে দেয়।[৪১] মোট কথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করার যে সুযোগ পায় তাকে কাজে লাগিয়ে আয়োজিত এই কৃষক সম্মেলন সমগ্র ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

২ মে থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আমন্ত্রিত অতিথিরা নেত্রকোনায় আসতে শুরু করে। যাতায়াত ব্যবস্থা তেমন একটা ভাল না থাকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষক নেতারা প্রথমে ময়মনসিং শহরে এসে জড়ো হত তারপর তাঁদের রিজার্ভ বাসে নেত্রকোনা শহরে নিয়ে আসা হত। এছাড়া ট্রেনের মাধ্যমেও অনেকে সম্মেলনে যোগ দেয়। পাহাড়ি অঞ্চলের লোকেরা বিশেষ করে মহিলারা পিঠে সন্তানকে বেঁধে নিয়ে প্রায় ৭০/৮০ মাইল পথ হেঁটে এসে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল।

৫ মে, সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে প্রায় ৮০ হাজার নেতা-কর্মী উপস্থিত হয় এবং মূল সম্মেলনের দিন অর্থাৎ ৭ ও ৮ মে এই সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।[৪২]

---

৩৯ প্রমথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮৭।
৪০ কমরেড *নিবেদিতা নাগের* সাক্ষাৎকার, জুলাই ৩০, ২০০১।
৪১ কমরেড *হেনা দাসের* সাক্ষাৎকার, অক্টোবর ১৯, ২০০১।
৪২ আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, পড়ুয়া, ২০০৩, পৃ, ৯৪।

ভারতবর্ষের আসাম সীমান্তের মণিপুর, কোহিমা হতে শুরু করে সিন্ধু, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর ভারত, দুই বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের প্রতিনিধিদের সমাবেশ ঘটে এই সম্মেলনে। যোগদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে পি সি যোশী, বাবা গুরুমুখ সিং, হরকিষণ সিং সুরজিৎ, ভাগ সিং, ঠাকুর চন্দ্র সিং গাড়োয়াল, শ্যামরাও গোদাবরী পারুলেকার, ভবানী সেন, বঙ্কিম মুখার্জি, কৃষ্ণবিনোদ রায়, সোমনাথ লাহিড়ী, পি সুন্দরামাইয়া, এ আহমেদ, যদুনন্দন শর্মা, নীলমণি, ইরাবৎ সিং, বিষ্ণুরাতা, কল্পনা যোশী, ই এম এস নাম নাম্পুদিপাদ, কার্যানন্দ শর্মা প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।[৪৩]

সম্মেলনের স্থায়িত্ব ৫ থেকে ১০ মে হলেও প্রকাশ্য অধিবেশন হয় শেষের দুই দিন বিকেল ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। ৫ মে সকাল ৮ টায় কৃষকসভার পতাকা উত্তোলন করেন পাঞ্জাবের নেতা বাবা কেশর সিং। এরপর মঞ্চ হতে সভাপতি ও প্রতিনিধিবর্গ সংগঠিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও সামরিক অভিবাদন গ্রহণ এবং এরপর শুরু হয় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা শেষে বিকেল তিনটায় শুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি আর মণি সিংহ ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি। সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠায়।[৪৪] সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়:

১. কিষাণ সভা কর্মীদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব;
২. সোভিয়েত জনগণ ও মার্শাল স্ট্যালিনকে অভিনন্দন সম্পর্কিত প্রস্তাব;
৩. রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রস্তাব;
৪. টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কিত প্রস্তাব;
৫. তে-ভাগা আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাব;
৬. অধিক ফসল উৎপাদন সম্পর্কিত প্রস্তাব;

৪৩ মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৫।
৪৪. ঐ, পৃ, ৮৪।

৭. আসামের জমি বিলির সমস্যা সম্পর্কিত প্রস্তাব;
৮. খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রস্তাব;
৯. কৃষি আয়কর সম্পর্কিত প্রস্তাব;
১০. কৃষাণসভা ও স্বামী সহজানন্দ সম্পর্কিত প্রস্তাব;
১১. নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সম্পর্কিত প্রস্তাব;
১৩. অস্তি ও চিমুব বন্দিদের প্রাণদণ্ডাদেশ সম্পর্কিত প্রস্তাব; এবং
১২. বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত প্রস্তাব।[৪৫]

১০ মে সম্মেলনের সফল সমাপ্তি ঘটে। সম্মেলনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ও পরিচিতি এবং পার্টির শক্তি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। যার প্রমাণ মেলে পরবর্তীতে টঙ্ক, তে-ভাগাসহ বিভিন্ন আন্দোলনগুলোতে। সর্বোপরি এই সম্মেলন ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মণি সিংহের পরিচিতি ও অবস্থান শক্তিশালী করে তোলে এবং কৃষক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

তে-ভাগা আন্দোলন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তে-ভাগা আন্দোলনের ডাক দেয়। এই সংগঠন গঠিত হবার পর থেকে কৃষকদের বিক্ষোভ আন্দোলনগুলো স্বতঃস্ফূর্ত, সচেতন ও সাংগঠনিক রূপ নেয় এবং ক্রমে সারা দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে।[৪৬] আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে দিনাজপুর জেলার আটোয়ারী থানার রামপুর গ্রামে। এ গ্রামে কৃষক সভার কর্মী সুশীল সেন কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেন। সংঘবদ্ধ কৃষকেরা ফুলঝরি নামে এক বর্গাদারের জমিতে ধান কাটতে যায়, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলে পুলিশের সাথে গ্রামবাসীদের সংঘর্ষ বাধে এবং পুলিশ একপর্যায়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পক্ষকালের মধ্যে সমগ্র দিনাজপুর জেলায় এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এ আন্দোলন সমগ্র বাংলায় বিস্তার লাভ করে।[৪৭] তৎকালীন বাংলার ১৯টি

---

৪৫. প্রমথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৯১।
৪৬. *তেভাগা সংগ্রাম ৪০তম বর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ, ১২।
৪৭. কুনাল চট্টোপাধ্যায়, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, (কলিকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৭), পৃ. ৯৩।

জেলায় এই আন্দোলন সংঘটিত হয়। জেলাগুলো হ'ল দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাবনা, বগুড়া, ফরিদপুর, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি।[৪৮] মোট ষাট লক্ষ বর্গা বা ভাগচাষী হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী নারী ও পুরুষ তাদের জীবনকে তুচ্ছ করে তে-ভাগার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

তে-ভাগা আন্দোলন ছিল মূলত আধি বা বর্গা প্রথার বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ আন্দোলন। তে-ভাগা অনুযায়ী জমি চাষ করে ফসল ফলানোর পর কৃষক তার পরিশ্রম ও ফসল উৎপাদন খরচের বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পেত, আর অন্যদিকে কোন পরিশ্রম বা মূলধন না খাটিয়েই অবশিষ্ট অর্ধেক পেত জমির মালিক। কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুই ভাগ দাবি করে এবং বাকি একভাগ জমির মালিককে দেওয়ার প্রস্তাব করে।[৪৯] জমির মালিকরা এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ১৯৪৬-৪৭ সময়ে বাংলায় তে-ভাগা আন্দোলন নামে সংঘটিত হয়।[৫০] এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল বাংলার প্রাদেশিক কৃষাণসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে।[৫১]

আন্দোলন চলাকালে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর নামক স্থানে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায়, এবং শিবরাম সাঁওতাল, সমিরউদ্দীনসহ বেশ কয়েকজন কৃষক নিহত হয়।[৫২] সমসাময়িক কালে সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে দিনাজপুর জেলার পতিরাম থানার খাঁ-পুরে (বর্তমানে ভারতের অংশ) কৃষকনেতা চিয়ার সাঁইমেতসহ আরো ছাব্বিশজন কৃষক এবং ময়মনসিং জেলার নালিতাবাড়ীতে জমিদারদের সহযোগিতায় সর্বেশ্বর ডালু নিহত হয়। পুলিশ ও জমিদারের ভাড়াটিয়া বাহিনী বর্গা চাষীদের ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে ফেলে এবং তাদের মেয়েদের ধর্ষণের মাধ্যমে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

---

৪৮. *শারদ নক্ষত্র* ১৪০৮ # XXXi/১৫২-১৫৩# এস.সেপ. ২০০১, পৃষ্ঠা, ৭৭।

৪৯. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ৫৮-৫৯।

৫০. M. Ashok, *Peasant Protest in India Polities,* (New Delhi, 1993), p-130.

৫১. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, (ঢাকা : পড়ুয়া, ২০০৩), পৃ, ১৪৯।

৫২. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৮২।

জমিদার বাহিনী ও পুলিশের হাতে ৭০ জন কৃষক প্রাণ হারায়। সংগঠকদের দাবি অনুযায়ী কেবলমাত্র দিনাজপুর জেলাতেই ৪০ জন কৃষক নিহত, ১২০০ জন গ্রেফতার এবং প্রায় ১০ হাজার আহত হয়েছিল।[৫৩] বিভিন্ন নথিপত্রে দেখা যায়, সরকারের নির্দেশে পুলিশ ২২টি স্থানে গুলিবর্ষণ করে এবং চব্বিশ পরগনা, রংপুর, দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার একাধিক স্থানে নারী ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে।[৫৪] এছাড়া প্রায় চার হাজার কৃষককে গ্রেফতার করা হয়, যাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আদালতে মামলা চলেছিল।

এত কিছুর পরও তে-ভাগা আন্দোলন সফল হতে পারে নি। পুলিশ ও জমিদারদের পাশাপাশি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসও এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। উভয় দলের ভূস্বামীরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তে-ভাগা যাতে সফল হতে না পারে তার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। এমনকি তাদের বিরোধিতার মুখে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন সোহরাওয়ার্দী 'বেঙ্গল বর্গাদার বিল' নামক যে বিল আইন পরিষদে উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন সেটিও তিনি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। এভাবে একদিকে জমিদার ও পুলিশ এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধীতা ও দমন নীতির কারণে তে-ভাগা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকসভার পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়ে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।[৫৫]

টঙ্ক আন্দোলন (দ্বিতীয় পর্ব)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ পেয়ে ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার কৃষক সংগঠনগুলো পুনর্গঠিত হয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করে। এসময় সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ দিলেও তারা যাতে

---

৫৩. মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সমকালীন রাজনীতি ও ইলা মিত্র*, (ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ.১১২।

৫৪. Majumder, Ashok, *op.cit*, p-133.

৫৫. সুস্নাত দাশ, *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম : তেভাগা আন্দোলনে আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত -পর্যালোচনা-পুনর্বিচার*, (কলিকাতা: নক্ষত্র প্রকাশন,২০০২), পৃ, ২৪০।

ভবিষ্যতে হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে না পারে সে বিষয়ে সদা সতর্ক ছিল। মূলত একারণে ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে ব্যাস্টিনকে ময়মনসিংহের 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট' করে পাঠানো হয়।[৫৬] নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও জামালপুর মহকুমার কৃষক সংগঠনগুলোর অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার লক্ষ্যে ব্যাস্টিন সামরিক ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে এবং স্থানীয় ক্যাথলিক মিশনগুলোর সহায়তায় কৃষকদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমিদারদের টঙ্ক ধান, মহাজনের ঋণ, ইউনিয়ন ট্যাক্স প্রভৃতি পরিশোধের জন্য নির্দেশনা জারি করে।[৫৭] মণি সিংহসহ অসংখ্য কৃষকনেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি একটি গোপন বৈঠকের মাধ্যমে মণি সিংহসহ অধিকাংশ কৃষক ও কমিউনিস্ট নেতার আত্মগোপনে যাওয়া এবং সরকার ও জমিদারের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য পুনরায় টঙ্ক আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়।[৫৮]

সুসং-দুর্গাপুর হাই স্কুল মাঠের এক জনসভার মাধ্যমে টঙ্ক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। কৃষকরা টঙ্ক প্রথার মাধ্যমে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ১৯৪৬ সালের টঙ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর মাসে) তেমন কোন টঙ্ক ধান আদায় না হওয়ায় জমিদার ও ব্যাস্টিন বাহিনী দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হয় এবং তারা বলপ্রয়োগ ও নির্যাতনের মাধ্যমে টঙ্ক ধান আদায় ও কৃষকদের প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[৫৯] ১৯৪৭ সালের ৭ জানুয়ারি ব্যাস্টিন বাহিনী একসাথে জিগাতলা, লেঙ্গুরা, চৈতন্যনগর এবং ভরতপুরসহ মোট ১২টি গ্রাম আক্রমণ করে টঙ্ক চাষীদের ধানের গোলা লুট করে।[৬০] লেঙ্গুরা ও কুমারগাতির কৃষক সমিতির অফিস ভেঙ্গে ফেলা হয়। ৭ থেকে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে পুলিশ ও জমিদার বাহিনী বীভৎস দমননীতি চালিয়ে বাওইপাড়া, সানখোলা, বগাঝড়া, ভেদিকুড়া হতে নিতাই নদীর তীরে বাগপাড়া, কালিকাবাড়ী পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রামের টঙ্ক চাষীদের ব্যাপক মারপিট, নির্যাতন এবং মহিলাদের ধর্ষণসহ টঙ্ক চাষীদের কাছ থেকে

৫৬. আমজাদ হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮২।

৫৭. বদরউদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৬), পৃ, ১৯২।

৫৮. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৭৫।

৫৯. *দুর্গা প্রসাদ তেওয়ারীর সাক্ষাৎকার*।

৬০. প্রমথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৯৮।

বলপূর্বক টঙ্ক ধান আদায় করে।[৬১] কৃষকরাও মরিয়া হয়ে ওঠে এবং এসকল নির্যাতন আন্দোলকে তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। মণি সিংহ, ললিত সরকারসহ কৃষক নেতারা আত্মগোপনে থেকে আন্দোলনের দিক নির্দেশনা দিতে থাকেন।

৩১ জানুয়ারি 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্'-এর একদল সৈন্য সোমেশ্বরী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী বাহেরাতলী গ্রামে প্রবেশ করে গ্রামবাসীর উপর ব্যাপক নির্যাতন চালায়। তারা বিভিন্ন ঘর-বাড়িতে আগুন দেয়, দু'জন হাজং মহিলাকে ধর্ষণ করে এবং কুমোদিনী হাজং নামের ২০/২১ বছরের একটি মেয়েকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাহেরাতলী গ্রামের পার্শ্বেই ছনগড়া গ্রাম, আন্দোলনকারীরা তখন ঐ গ্রামে দুপুরের খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু দুপুরের খাবার শুরু করার পূর্বেই এই খবর পাওয়ামাত্র রাশিমণির নেতৃত্বে একদল মহিলা কুমোদিনী হাজংকে রক্ষার জন্য বাহেরাতলীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। তারা চারিদিক থেকে পুলিশকে ঘিরে ফেলে এবং প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে রাশিমণি, সুরেন্দ্রসহ মোট তিনজন আন্দোলনকারী ও দুজন পুলিশ নিহত হয়। তবে পুলিশ শেষ পর্যন্ত কুমোদিনী হাজংকে ছেড়ে দিয়ে তাদের দু'জন সহকর্মীর লাশ নিয়ে ফেরৎ যায়।

বাহেরাতলী সংঘর্ষের পর পুলিশি নির্যাতন কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ১ ফেব্রুয়ারি কৃষক নেতা ললিত সরকারসহ লেঙ্গুরা বাজারের ১২ জন কৃষকের বাড়ি ভেঙ্গে ফেলে এবং সমস্ত ধান লুট করে। ললিত সরকারের স্ত্রী ও পুত্রদের অকথ্যভাবে দৈহিক নির্যাতন করে। নিহত সুরেন্দ্রের গ্রাম আক্রমণ করে গ্রামের সমস্ত বাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেয় এবং গ্রামবাসীকে গাছের সাথে বেঁধে ব্যাপক মারধর করে। ৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ সুসং-দুর্গাপুরে মণি সিংহ ও ফণী গোস্বামীর বাড়ি আক্রমণ করে সবকিছু তছনছ করে। এমনকি মণি সিংহের বিধবা ভ্রাতৃবধূ এবং গোস্বামীর বৃদ্ধা মাকে এক বস্ত্রে ঘড় হতে বের করে দেয়। ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি নয়নাকান্দী, সানখোলা, কমলপুর, মুন্সীপাড়া, নলগড়া এবং পাঁচগাও ইউনিয়ন কৃষক সমিতির অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ৯ ফেব্রুয়ারিতে ব্যাস্টিনের অত্যাচার

৬১. ঐ, পৃ, ৯৯।

বিরোধী ইশতেহার ছাপানোর সন্দেহে ময়মনসিংহ শহরের ১৬/১৭টি প্রেস তছনছ করা হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি বগাঝড়া গ্রাম আক্রমণ করে পুলিশ ব্রজমণিসহ বহু কৃষক মেয়েকে ধর্ষণ ও দৈহিক অত্যাচার করে। ঐ দিনই কুড়িখাই বাজারে কৃষক সমিতির অফিসেও আগুন দেওয়া হয়।

পুরো ফেব্রুয়ারি মাস কৃষকদের উপর ব্যাস্টিন বাহিনীর এই বীভৎস অত্যাচার চলতে থাকে। ব্যাস্টিনের এসব অত্যাচারের খবর কলকাতায় পৌঁছলে কলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা হতে একটি অনুসন্ধান কমিটি পাঠানো হয়। ঐ অনুসন্ধান কমিটিতে ছিলেন জ্যোতিবসু, ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য ও সাংবাদিক প্রভাতদাস গুপ্ত। কিন্তু ব্যাস্টিন এই কমিটিকে বাহেরাতলী গ্রামে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।

বাহেরাতলী গ্রামের এই সংঘর্ষের জন্য কোর্টে একটি মামলা হয়। পাশাপাশি ব্যাস্টিন বাহিনীর এরূপ অত্যাচারে কৃষকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মণি সিংহসহ কমিউনিস্ট নেতাদের অধিকাংশই আত্মগোপনে চলে যায়। ফলে টঙ্ক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এটিকে তেমন আর অগ্রসর করা সম্ভব হয়নি। প্রথম পর্যায়ে যতটুকু সংস্কার করা হয়েছিল তাই রয়ে যায়।

১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৫ সালের নির্বাচন পদ্ধতি মোটেও সার্বজনীন ছিল না। ভোট হতো সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে অর্থাৎ হিন্দুরা হিন্দু প্রার্থীকে এবং মুসলমানরা মুসলমান প্রার্থীকে ভোট দিবে। এছাড়া শিক্ষাগত ও কর প্রদানের যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার নির্ধারিত হত। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশের জনসংখ্যার মাত্র সাড়ে তেরো ভাগ লোক ভোটাধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়।[৬২] ফলে কৃষক ও শ্রমিক জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ এই পদ্ধতির কারণে ভোটার হতে ব্যর্থ হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং দুই বাংলা মিলে তেরোজন প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করে। এর মধ্যে ছয়জন ছিল

---

৬২. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৬৭।

পূর্ববঙ্গের এবং অবশিষ্ট সাতজন ছিল পশ্চিম বঙ্গের।[৬৩] ১৯৪৬ সালের এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থীরা হলেন:

১. ব্রজেন দাস (ঢাকা)
২. কল্পনা যোশী (চট্টগ্রাম)
৩. মণি সিংহ (ময়মনসিংহ)
৪. রূপনারায়ণ রায় (দিনাজপুর, তপশিলী আসন)
৫. ওয়ালী নেওয়াজ (কিশোরগঞ্জ, মুসলিম আসন)
৬. কৃষ্ণবিনোদ রায় (যশোহর)

উল্লিখিত ছয়জন পূর্ববঙ্গের প্রার্থী এবং নিম্নের সাতজন ছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থী।[৬৪]

১. সোমনাথ লাহিড়ী
২. বঙ্কিম মুখার্জি
৩. ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত
৪. মোহাম্মদ ইসমাইল
৫. চতুর আলী
৬. জ্যোতি বসু
৭. রতনলাল ব্রাহ্মণ।
৮.

নির্বাচন উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে '*স্বাধীনতা*' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। পত্রিকায় পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার, কর্মপন্থা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোকপাত করা হত।

মণি সিংহের নির্বাচনী এলাকা ছিল নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ সদরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এলাকা এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী।

---

৬৩. Islam, Sirajul (ed), *History of Bangladesh 1704-1991, Vol-1* (Political), (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1997), p-302.
৬৪. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৮।

নির্বাচন উপলক্ষে মণি সিংহ কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় অনেকগুলো সভা-সমাবেশ করেন। সভাগুলোতে বিপুল জনতার সমাবেশ ঘটে। মণি সিংহের নিজ গ্রাম সুসং-দুর্গাপুরে মণি সিংহের পক্ষে এক বিরাট নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় মণি সিংহকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ভারতবর্ষ কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সেক্রেটারি পূরণচাঁদ যোশী।[৬৫] নির্বাচন উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক *'স্বাধীনতা'* পত্রিকায় মণি সিংহের নির্বাচন সংক্রান্ত খবর প্রতিদিন প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়াও হাজার হাজার পুস্তিকা, নির্বাচনী ইশতেহার ও পোস্টার প্রভৃতির মাধ্যমেও পার্টির কর্মপন্থা ও নীতি প্রচার এবং মণি সিংহকে ভোটদানের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বলা হয় কমিউনিস্টরা ধর্মবিরোধী, ইসলাম বিরোধী, সুতরাং তাদেরকে ভোট দিলে পাপ হবে। অন্যদিকে কংগ্রেস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধের' নীতির কথা তুলে ধরে "কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদের দালাল, তাদের ভোট দিলে ভারতবর্ষ কোনদিনও মুক্ত হবে না" বলে অপপ্রচার চালায়।[৬৬]

নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্বে মণি সিংহের নির্বাচনী এলাকা ময়মনসিংহের কলমাকান্দায় একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং সংঘর্ষে মহেন্দ্র নামে এক কংগ্রেস কর্মী নিহত হয়।[৬৭] বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টির দু'জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কংগ্রেস মৃতদেহের বিকৃত ছবিসহ কমিউনিস্টরা খুনি, বর্বর প্রভৃতি বিশেষণ দিয়ে হাজার হাজার পোস্টার ও লিফলেট ছাপিয়ে তা বাংলা ও বাংলার বাইরে বিলি করে।[৬৮] কলমাকান্দার এই সংঘর্ষ জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং মণি সিংহের নির্বাচনেও এর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়, যদিও পরবর্তীতে মামলার রায়ে

---

৬৫. প্রমথ গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ, ৯৩।
৬৬. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৬৭।
৬৭. প্রমথ গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ, ৯৩।
৬৮. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৭০।

কমিউনিস্ট পার্টি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিল এবং গ্রেফতারকৃত কমিউনিস্ট সদস্যরাও বেকসুর খালাস পেয়েছিল।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ১৫৮৫টি প্রাদেশিক সভার আসনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি মাত্র ১০৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হয়। যে সকল আসনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রার্থী প্রদান করতে পারেনি সেক্ষেত্রে হিন্দু আসনে কংগ্রেস এবং মুসলিম আসনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর প্রতি সমর্থন দেয়। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় কমিউনিস্ট পার্টি মাত্র ৮টি আসনে জয়লাভ করেছে। এছাড়া কংগ্রেস ৯৩০ এবং মুসলিম লীগ ৪৯৭টি আসন পায়।[৬৯]

মূলত ভোটাধিকার ব্যবস্থার ত্রুটির কারণেই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপক ভরাডুবি ঘটে। সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠিতে ভোটাধিকার নির্ধারিত হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ নেতা-কর্মী ভোটাধিকার লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের অধিকাংশই ছিল শ্রমিক ও প্রান্তিক কৃষক যারা এই নির্বাচনে ভোট প্রদানের সুযোগ পায়নি। এছাড়া সাম্প্রদায়িক ইস্যু ছিল অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। লাহোর প্রস্তাব ও ভারত ছাড় ঘোষণার পর থেকেই উপমহাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল তথা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে চরমভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পেতে শুরু করে। ফলে নির্বাচনেও মুসলিম ভোটাররা মুসলিম লীগকে এবং হিন্দু ভোটাররা কংগ্রেসকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে ভাবতে শুরু করে। তারপরও কমিউনিস্ট পার্টি এই নির্বাচনের মাধ্যমে উপমহাদেশে তৃতীয় বৃহত্তর রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়।

---

৬৯. Mitra, N., (ed.), *The Indian AnnualQuartely Register Register,* Vol. I. (Calcutta: Annual Register Office, 1946), pp. 229-232.

তৃতীয় অধ্যায়

উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। একই সাথে ব্রিটিশ চক্রান্ত এবং বাংলার তৎকালীন নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা আর স্বার্থ সংঘাতের কারণে বাংলারও বিভক্তি ঘটে। বাংলা মায়ের বুক চিড়ে খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ নবগঠিত ভারত আর পূর্ববঙ্গ যুক্ত হয় পাকিস্তানের সাথে। এমনকি পূর্ববঙ্গ তার ঐতিহ্যবাহী নামটি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে এবং দাপ্তরিকভাবে এর নতুন এক উপনিবেশিক নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।

পাকিস্তান শাসনাধীনে পূর্ব বাংলার ইতিহাস মূলত এক উপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি ধ্বংস করে এ দেশকে তথাকথিত মুসলিম সংস্কৃতি সম্পন্ন এক প্রদেশে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করে।

'ধর্মীয় বিশ্বাসে সৃষ্ট পাকিস্তান একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র'– শুরু থেকে কমিউনিস্ট পার্টি এ কথা বিশ্বাস করলেও ষাটের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তারা এ দেশের সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে বাঙালিসহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী ও জাতির স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের মাধ্যমে পাকিস্তানকে সত্যিকার অর্থে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির উপর নেমে আসে সরকারি নির্যাতন। প্রায় পুরো পাকিস্তান আমল কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। রাজনৈতিক এই বৈরী পরিবেশে মণি সিংহ দলের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। পার্টির ন্যায় পাকিস্তান শাসনামলের প্রায় পুরো সময় তাকেও আত্মগোপনরত অবস্থায় এবং গ্রেফতার হওয়ার পর জেলে থাকতে হয়েছে। আর এ অবস্থায় থেকেও তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস

ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে ভারত ও পাকিস্তানের ৯১৯ জন ডেলিগেটের মধ্যে ৬৩২ জন অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তান থেকে অংশগ্রহণকারী ডেলিগেটের সংখ্যা ছিল ১৩০ জন যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ১২৫ জন এবং অবশিষ্ট ৫ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের।[১] কংগ্রেসে অস্ট্রেলিয়া, বার্মা, সিংহল ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধিরা যোগদান করেন এবং অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, কানাডা, ক্যারাকাস, ডেনমার্ক, সাইপ্রাস, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, হল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর আয়ারল্যান্ড, প্যালেস্টাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, পোলান্ড, মালয়, লেবানন, ইতালি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সিরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি বাণী প্রেরণ করে।[২]

কংগ্রেসে মূল রাজনৈতিক দলিল উপস্থাপন করেন বি টি রণদীভ। উত্থাপিত এই দলিলে বলা হয়,

> এতদিন আমরা সংস্কারপন্থী পথে অগ্রসর হয়েছি, বুর্জোয়া নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তি করেছি। স্বাধীনভাবে উদ্যোগ নিয়েও স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারিনি। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমঝোতার ভিত্তিতে তথাকথিত স্বাধীনতা এনেছে। এই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থার মত এখনো বিপ্লবী অবস্থা বিরাজ করছে, কাজেই সংগ্রাম করে বুর্জোয়া নের্তৃত্বের উচ্ছেদ করতে হবে।[৩]

মোট কথা ভুয়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ধর্মঘট, জঙ্গি মিছিল, সভা ও সশস্ত্র সংগ্রাম প্রভৃতির আহ্বান জানানো হয়। পরে নীতিগতভাবে বলা হয়, ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিলম্বিত, অথচ পৃথিবীতে প্রলেতারিয়েত বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হয়েছে। কাজেই দুই বিপ্লব অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও

---

১. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম (প্রথম খণ্ড)*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৩), পৃ, ৮৯।
২. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, (ঢাকা : পড়ুয়া, ১৯৯৭), পৃ, ২৭।
৩. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮৯।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে এবং উভয় বিপ্লব একসাথে সম্পন্ন করতে হবে। সর্বহারাদের নিয়ে বিপ্লবে এগিয়ে যেতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে এবং এই সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া নেতৃত্বের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে।

বি টি রণদীভের উত্থাপিত দলিলের উপর ব্যাপক আলোচনা হয়, ভবানী সেনসহ অনেক বড় বড় কমিউনিস্ট নেতা আলোচনায় অংশ নেয় এবং কংগ্রেস কর্তৃক দলিলটি গৃহীত হয়। কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির পৃথকীকরণ তথা 'পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্টদের জাতীয় সীমানার মধ্যে কাজ করার' বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং ভারত ও পাকিস্তানের জন্য দেশভিত্তিক স্বতন্ত্র আলাদা দুটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিরা ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ কলকাতায় একটি পৃথক কংগ্রেসে মিলিত হয়ে পাকিস্তানের জন্য আলাদা একটি কমিটি গঠন করে।[৪] নবগঠিত এই কমিটি পাকিস্তানের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক দলিল ও সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে, যা ছিল রণদীভের দলিলেরই প্রতিচ্ছবি।[৫]

কংগ্রেসে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির একটি কমিটি গঠন করা হয়। সাজ্জাদ জহির নবগঠিত এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন: মোহাম্মদ আতা, জামালুদ্দীন বুখারী, ইব্রাহীম, মণি সিংহ, নেপাল নাগ, কৃষ্ণবিনোদ রায়, খোকা রায় ওরফে সুধীন রায় ও মনসুর হাবিব।[৬] এছাড়া সাজ্জাদ জহির, খোকা রায় এবং কৃষ্ণবিনোদ রায়কে নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি রাজনৈতিক ব্যুরোও নির্বাচন করা হয়।[৭] একই দিন অর্থাৎ ৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা পৃথকভাবে একটি প্রাদেশিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক

---

৪. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, ১৯৩৮-১৯৬৮, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ, ৭০ এবং ৭১।

৫. জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৬৮), পৃ ১১৯-১২০।

৬. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন,১৯৯৬), পৃ, ২৪২।

৭. মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সমকালীন রাজনীতি ও ইলা মিত্র*, (ঢাকা: আই এল বি বি এস, ২০০১), পৃ, ৯২।

কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। খোকা রায় প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমিটির অপর সদস্যরা হলেন মণি সিংহ, নেপাল নাগ, খোকা রায়, বারীণ দত্ত, রওশন আলী, মনসুর হাবিব, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, ফণি গুহ, নিরঞ্জন গুপ্ত, আলতাব আলী, অবনী বাগচী, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, প্রমথ ভৌমিক, ইয়াকুব মিঞা, আব্দুল কাদের চৌধুরী, মারুফ হোসেন, অমূল্য লাহিড়ী প্রমুখ।[৮] অপরদিকে ভারতের জন্য পৃথক একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সেই কমিটির সাধারণ সম্পাদক হন বি টি রণদীভ।

কংগ্রেস পরবর্তী পার্টি কার্যক্রম ও সঙ্কট

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকার কোর্ট হাউজ স্ট্রিট এবং কাপ্তান বাজারে যথাক্রমে পার্টির শহর ও কেন্দ্রীয় অফিস খোলা হয়।[৯] ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিল প্রায় বারো হাজার এবং এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। পার্টির সমর্থক, দরদী এমনকি পার্টির নেতৃত্বাধীন শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র ও মহিলা প্রভৃতি গণ-সংগঠনগুলোর সদস্যদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। এসকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত।[১০] কিন্তু ভারতবর্ষ বিভক্তির পর হিন্দু সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠীর সাথে কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্য, দরদী ও সমর্থক এবং পার্টির নেতৃত্বাধীন গণ-সংগঠনগুলোর হাজার হাজার সভ্যও পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে আবাস গড়ে তোলে।[১১] ফলে পার্টির সভ্য সংখ্যা একেবারেই কমে যায়। ঢাকেশ্বরী সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন, ই বি আর শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির গণভিত্তি বিনষ্ট হয়। এমনকি বহু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন কৃষক সমিতিও দুর্বল হয়ে পড়ে।[১২]

১৯৪৮ সালে কংগ্রেসে গৃহীত রণদীভ লাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল যতদূর সম্ভব প্রলেতারিয়েত শ্রেণি থেকে আগত কমরেডদের পার্টির

৮. মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ১০৬।
৯. বদরউদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৪৩।
১০. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ৭২।
১১. বদরউদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৪২।
১২. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ৭৩।

নেতৃত্বে নিয়ে আসা। পুনর্গঠিত রাজশাহী জেলা শাখার প্রতিনিধিরা জেলা কংগ্রেসে আজহার হোসেন নামের এক সক্রিয় প্রান্তিক কৃষক কমরেডকে পার্টির জেলা শাখার সম্পাদক নির্বাচিত করে পার্টি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে এগিয়ে নিতে শুরু করে।[১৩] এছাড়া কংগ্রেসে সশস্ত্র সংগ্রাম বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল পার্টির শক্তিশালী ইউনিটগুলোতে স্থানীয় জোতদার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরুর মাধ্যমে তারও বাস্তবায়ন ঘটতে থাকে।

১৯৪৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ মহাপরিদর্শকের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়ঃ

> পুরো বছরটিতে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল একটা নৈমিত্তিক আপদ। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে জনমনে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি কয়েকটি জেলার নমশূদ্র কৃষক, ময়মনসিংহের হাজং ও কৃষক, ছাত্র, কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। প্রায় ১০০ জন শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট এ বছর আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে বিশেষত সীমান্ত এলাকা যেমন আসাম সীমান্তে ময়মনসিংহ এবং সিলেট এলাকা, চব্বিশ পরগনা সীমান্তে যশোর এবং খুলনা, বার্মা সীমান্তে চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে রংপুর ও দিনাজপুরে পার্টির ভিত্তি সংগঠিত করবার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।[১৪]

পুলিশের অপর একটি প্রতিবেদনে আরো বলা হয়

> কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃতিগতভাবে সাহসী উপজাতি ও নমশূদ্রদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন যায়গায়

---

১৩. মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ১১২।

১৪. "Report on the Police Administration of the Province of East Bengal for the year 1948", By Z. Hossine, উদ্ধৃত হয়েছে মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৯৩| Inspector General of Police, East Bengal, (File No P & R-14/49, Government of East Bengal, Home Department, Police Branch, Central Achieves, Dhaka).

> স্থানীয় ইস্যু নিয়ে লড়াই সংগ্রামে সংগঠিত করছে। অনেক যায়গাতেই এ ধরনের লড়াই-এ মানুষ আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বেপোরয়া সব কর্মকাণ্ড চালিয়েছে।[১৫]

মূলত পুলিশের রিপোর্টে কমিউনিস্ট পার্টি এসময় ত্রাস ও ভয়-ভীতিরোধে পুলিশকে সহায়তাদানকারী লোকজনের বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাস চালিয়েছিল এবং এ জাতীয় কতিপয় নিগ্রহ, অপহরণ ও হত্যার কথা উল্লেখ করা হয়।

কলকাতা কংগ্রেসে 'রণদীভ লাইন' গৃহীত হবার পর এই নীতির অনুসরণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি 'দালাল হালাল করো' নীতি অবলম্বন করে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জেলা ও মহকুমাগুলো এই নীতির আলোকে প্রত্যেক যায়গায় দালালের তালিকা প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়।[১৬] এই নীতি বাস্তবায়নের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নড়াইলের তে-ভাগা আন্দোলনের নেতা নুর জালালের 'স্মৃতিকথা' থেকে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাদের অঞ্চলে অর্থাৎ নড়াইলে দালালদের যে তালিকা তৈরি করা হয় তার এক নম্বরে ছিল নুর জালালের বড় ভাই নুরুল হুদার নাম। এই নুরুল হুদাকে আটক ও হত্যা করে সশস্ত্র কমিউনিস্ট কর্মীগণ। কৃষক নেতা নুর জালাল আরো লিখেছেন যে, তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য স্থানেও 'দালাল হালালের' নীতি বাস্তবায়িত হতে শুরু হয়। নড়াইলে এগারোখান গ্রামেও এক দালাল হালাল হয়ে যায়। এছাড়া খুলনাতেও কমরেড বিষ্ণু চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে এক দালালকে হালাল করা হয়।[১৭]

'দালাল হালালের' আরো কিছু বিবরণ পাওয়া যায় জসীমউদ্দীন মণ্ডল-এর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ *জীবনের রেলগাড়িতে*। নাটোরের বাসুদেবপুরের এক বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন

> পরদিন সকাল হতেই আমরা বৈঠকের জন্য নির্দিষ্ট গ্রামে গিয়ে দেখি, বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। গ্রামের সবাই ভয়ে ভীষণ

---

১৫. Report on the Police Administration of the Province of East Bengal for the year 1948, উদ্ধৃত হয়েছে মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৩।
১৬. মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৯৩।
১৭. নূর জালালের স্মৃতিকথা, উদ্ধৃত হয়েছে মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৯।

> কাতর। চারদিকে একটা চাপা গুঞ্জনও। ব্যাপার কি জানতে চাইলে তারা বললো, কয়েকদিন আগে খোঁজে খোঁজে একজন টিকটিকি অর্থাৎ সি.আই.ডি এসেছিল এখানে। তাকে মেরে পাটনার ভিতর গুম করে রাখা হয়েছিল। তার খোঁজে যে কোন সময় পুলিশ এসে পড়তে পারে।[১৮]

কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের আলোকে উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে এক ধরনের ভীতির সৃষ্টি হয় এবং তাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম লীগ এই দল সম্পর্কে বিভিন্ন অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। কমিউনিস্ট পার্টি মূলত নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারায় অভ্যস্ত। তাই হঠাৎ করে সশস্ত্র বিপ্লবের কঠোর রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করলেও তা বাস্তবায়নের মতো অবকাঠামো ও প্রস্তুতি পার্টির ছিল না। তাছাড়া পার্টির সদস্যগণও সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে কংগ্রেসে গৃহীত রণদীভের লাইন বাস্তবায়ন করা দলের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।[১৯] তবুও দল তার সীমিত সম্পদ ও প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যায়।

কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র সংগ্রাম

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রতিনিধি দল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমদ্দীনের সাথে দেখা করে টঙ্ক প্রথার বিলোপ ও তে-ভাগা কার্যকর করার বিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী তা বিবেচনা করার আশ্বাসও দিয়েছিল।[২০] কিন্তু মাসের পর মাস চলে গেলেও মুসলিম লীগ সরকার এ বিষয়ে কিছুই করেনি। টঙ্কচাষী ও আধিয়ারদের উপর সরকার ও সামন্তবাদী শোষকদের শোষণ ও জুলুম সমানভাবেই চলছিল। তাই শ্রমজীবী কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য আন্দোলন খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। পাশাপাশি কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত রণদীভের থিসিস ও তেলেঙ্গানার পথে চল প্রভৃতি বিষয়গুলো কৃষকদের শোষণ মুক্তির জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের পথে উদ্বুদ্ধ করে।

---

১৮. জসীম উদ্দীন মণ্ডল, *সংগ্রামী স্মৃতি কথা: জীবনের রেলগাড়ি*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯২), পৃ, ৪৭।

১৯. বদরউদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৪৪।

২০. খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৭৯।

ফলে শোষিত ও নির্যাতিত কৃষকদের পক্ষ থেকে আন্দোলন শুরুর জন্য কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির উপর চাপ বাড়ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর এক বৈঠকে পরবর্তী ধান কাটার মৌসুমে পুনরায় টঙ্ক ও তে-ভাগা আন্দোলন শুরু এবং কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক ও ছাত্রফ্রন্টেও আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু পার্টি নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আন্দোলনের পদ্ধতি ও কৌশল কেমন হওয়া উচিত কিংবা পার্টির সদস্যদের একটি বড় অংশের দেশ ত্যাগের পরও সশস্ত্র পদ্ধতিতে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল কিনা এই বিষয়গুলো কোনো আলোচনা করেনি। যদিও এই বিষয়টির পর্যালোচনা অপরিহার্য ছিল। মূলত কৃষকদের চাহিদা আর দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রদেশিক নেতৃত্ব শ্রমজীবী, কৃষক, রেল শ্রমিক ও ছাত্রদের প্রতি "প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে জঙ্গি সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।"[২১]

প্রাদেশিক কমিটির এই আহ্বান এবং সংশ্লিষ্ট জেলা শাখাগুলোর সিদ্ধান্তের পর ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চল, দিনাজপুর, রংপুর, যশোর, খুলনা, রাজশাহীর নাচোল, এবং সিলেট জেলার বড়লেখা অর্থাৎ যে সকল স্থানে তখনও পার্টির নেতৃত্বে শ্রমজীবী কৃষকদের সংগঠন কিছুটা বজায় ছিল সেই সকল স্থানে যথাক্রমে টঙ্ক প্রথার বিলোপ, তে-ভাগা এবং নানকার প্রথা অবসানের জন্য ১৯৪৯ সালের সূচনা থেকেই পুনরায় কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর প্রভৃতি শহরে পার্টির নেতৃত্বাধীন ছাত্রগণ সরকারের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, শোভাযাত্রা ও মিছিলের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করে। পার্টির অনুসারী ছাত্র-যুবকদের কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হয় "লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়, ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়।"[২২]

---

২১. খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮০।
২২. বদরউদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৪৭।

শেষ পর্যায়ের টঙ্ক আন্দোলন

সশস্ত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট থানার নাগেরপাড়া গ্রামে ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সভায় পুনরায় টঙ্ক আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত হয়। টঙ্ক আন্দোলন মোট তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত, পূর্বে আলোচিত দুটি পর্যায় থেকেই আমরা জেনে গেছি যে, এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন মণি সিংহ। টঙ্ক আন্দোলনের পুরোধা মণি সিংহ তার জীবন সংগ্রাম বইয়ে আন্দোলন সম্পর্কে লিখেন

> 'বাংলার লোকেরা সব সময়ই বিপ্লবমনা ছিল। কিন্তু এতদিন আমরা সংস্কার পন্থায় ডুবে ছিলাম...এই বেদনা বিপ্লবী হিসেবে আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কাজেই আমরা জঙ্গি আন্দোলনের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি।'[২৩]

জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের পর তা স্থানীয় কমরেড, কৃষক কমিটি ও টঙ্ক সংশ্লিষ্ট কৃষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়। দ্রুত গতিতে আন্দোলনের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃষকরা টঙ্ক ধান দেওয়া বন্ধ করে দেয়।[২৪] শুরু হয় টঙ্ক আন্দোলনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়। প্রথমে এই আন্দোলন পাহাড়ের হাজংদের মধ্যে শুরু হলেও ক্রমান্বয়ে তা মুসলমানসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিস্তার লাভ করে। যদিও মুসলমানরা এবার হাজং, বালাই, ও ডালুদের মত সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েনি, কিন্তু তারাও টঙ্ক দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান সরকার আনসার বাহিনী এবং পুলিশের সহযোগিতায় টঙ্ক ধান আদায়ের সিদ্ধান্ত নেয়। টঙ্ক ধান আদায়ের জন্য আন্দোলনরত এলাকায় সরকারি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। সরকারি বাহিনী ও জমিদার বাহিনী একত্রিত হয়ে টঙ্ক ধান প্রদানের জন্য কৃষকদের উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। তারা কৃষকদের শারীরিক নির্যাতন করে, কৃষকের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকদের স্ত্রী, কন্যা ও ঘরে অবস্থানরত অন্য মহিলাদের ধর্ষণ পর্যন্ত করে। কিন্তু সরকার ও জমিদার বাহিনীর এই নির্যাতন কৃষকদের মনোবলকে বিন্দুমাত্র দমাতে পারেনি, বরং তার টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদের জন্য আরো মরিয়া হয়ে ওঠে।

---

২৩. ঐ, পৃ, ৯২।
২৪. প্রমথ গুপ্ত, *যে সংগ্রামের শেষ নেই*, (কলিকাতা : কালান্তর প্রকাশনী, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড), পৃ, ১১৪।

১৯৪৯ সালের ৮ জানুয়ারি জমিদারের লোকেরা কলমাকান্দা থানার চৈতন্যগড়ের নীলচাঁদ হাজংয়ের বিশ মণ টঙ্ক ধান নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসী বাধা দিয়ে ধান ছিনিয়ে নেয় এবং তা পুনরায় নীলচাঁদকে ফেরৎ দেয়। টঙ্ক আন্দোলনের এই সাফল্যের খবর চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তা আন্দোলনকারীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ যোগায়। ১৫ জানুয়ারি বটতলা গ্রামে টঙ্ক ধান আদায়ের সময় গ্রামবাসী জমিদারের লোকদের বাধা দেয়। সংবাদ পেয়ে ১৬ জানুয়ারি কলমাকান্দা থানার দারোগা ৬ জন সশস্ত্র পুলিশ, কয়েকজন চৌকিদার ও আনসার বাহিনীসহ বটতলায় উপস্থিত হয়ে ৫ জন কৃষককে গ্রেফতার করে তাদের অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন করে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জনৈক কৃষক পুলিশকে ধানের সন্ধান বলে দেওয়ার পর দারোগা ২৫ মণ টঙ্ক ধান গরুর গাড়িতে বোঝাই করে রওয়ানা দেয়।[২৫] কিন্তু গাড়ি অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই কৃষকরা গাড়ি ঘেরাও করে ধান ফেরৎ চাইলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ গুলি চালালে দুজন কৃষক আহত হয় এবং অন্য কৃষকরা আত্মরক্ষার জন্য মাটিতে শুয়ে পড়ে।[২৬] এই সুযোগে তারা পুনরায় ধানসহ গাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে হাজার হাজার কৃষকের দ্বারা সরকারি বাহিনী ও জমিদারের লোকেরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কৃষকরা এবার সরাসরি পুলিশকে আক্রমণ না করে সুশৃঙ্খলভাবে তাদেরকে ঘেরাও করে স্লোগান দিতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় পুলিশও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে ধান ছাড়াই থানায় ফেরৎ যায়।[২৭] কৃষকরাও ধানের গাড়ি মাঠের মধ্যে রেখেই তাদের আহত দুজন সাথীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে যায়।

টঙ্ক আন্দোলনের সব চাইতে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লেঙ্গুরা বাজার পুলিশ ক্যাম্পের সামনে। সেদিন ছিল লেঙ্গুরা হাটের দিন। বেলা ১১টার দিকে হাট বসার কিছুক্ষণ পর ২৫ জন টঙ্ক চাষীর একটি প্রচার বাহিনী উত্তরদিক দিয়ে হাটে প্রবেশ করে। দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত কৃষকরা হাতে লাল ঝাণ্ডা, পোস্টার, ড্রাম, বিউগল ইত্যাদি নিয়ে হাটের কাছাকাছি এসে আওয়াজ তুলে, "জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ কর; ধান সিজ বন্ধ কর; জান দিব তবু ধান দিব না;

২৫. প্রমথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১১৫।
২৬. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৯৪।
২৭. বদরউদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৯৫।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।[২৮] হাটের সাধারণ জনগণও প্রচার দলটির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করে। প্রচার বাহিনীর সদস্যরা তাদের কাজ শেষ করে ফিরে যেতে শুরু করা মাত্রই পুলিশ ক্যাম্প থেকে তাদের উপর গুলি বর্ষণ শুরু করলে ঘটনাস্থলেই প্রচারবাহিনী দলের নেতা মঙ্গল সরকার ও অগেন্দ্র নিহত হয়। মঙ্গল সরকার ও অগেন্দ্র-র নিহত হওয়ার খবর খুব দ্রুত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র এক চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দলে দলে জঙ্গি কৃষক হাতের কাছে দা, কুড়াল, লাঠি, বর্শা, জাঠসহ যে যা পায় তা নিয়েই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হাটের দিকে আসতে থাকে। বেলা তিনটার দিকে সমগ্র পুলিশ ক্যাম্পটি চতুর্দিক থেকে সশস্ত্র কৃষকদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তারা পুলিশ ক্যাম্পটি আক্রমণ করে। ক্যাম্পের সিপাহীরাও আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে ঘটনাস্থলেই ১৯ জন কৃষক নিহত হয়।

লেঙ্গুরা সংঘর্ষের সময় মণি সিংহসহ টঙ্ক আন্দোলনের কোন নেতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। মণি সিংহ এসময় সাংগঠনিক কাজে নেত্রকোনায় ছিলেন। সংঘর্ষের পরপরই মণি সিংহসহ আন্দোলনের সাথে যুক্ত অধিকাংশ নেতা-কর্মী লেঙ্গুরা চলে আসেন এবং ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ শুরু করেন। কমিউনিস্ট পার্টি এসময় উপলব্ধি করে যে, সরাসরি সরকারি বাহিনীকে আক্রমণ করা তাদের মোটেও ঠিক হয়নি। কারণ এতে শুধু তাদের ক্ষতিই হবে, পুলিশের কিছুই হবে না। পরবর্তীতে লেঙ্গুরার ঘটনার প্রেক্ষিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভবিষ্যতে সরাসরি জমিদার ও সরকারি বাহিনীর সাথে সম্মুখ সংঘর্ষের পরিবর্তে গেরিলা কায়দায় লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গেরিলা কায়দায় লড়াই সংগঠিত করার লক্ষ্যে এবং পুলিশি হয়রানি এড়াতে পাহাড়ের মধ্যে নয়টি গেরিলা ক্যাম্প তৈরি করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্পে একশত পঞ্চাশ থেকে দু'শত লোকের অবস্থানের ব্যবস্থা ছিল। যাদের উপর পুলিশি অত্যাচারের আশঙ্কা ছিল তাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়। কমরেড বিপিনসহ হাজং কারিগরদের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু দেশী বোমা ও পঞ্চাশটির মত গাদা বন্দুক

---

২৮. দৈনিক মাতৃভূমি, জুলাই ২৮, ২০০১ (মণি সিংহের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র)।

এবং কতগুলো বড় বন্দুক যার মধ্যে পলিতা দিয়ে একসাথে ত্রিশ-চল্লিশটি গুলি ছোড়া যায় তা তৈরি করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সংঘর্ষ ও চোরাগোপ্তা হামলার সময় সিপাহীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কয়েকটি রাইফেল, স্টেনগান ও দুটি পিস্তলও ছিল। হাজং মেয়েদের রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ভলান্টিয়ারদের রাইফেল চালানো ও গেরিলা কায়দায় শিক্ষিত করা হয়। ইতোপূর্বে মণি সিংহ কেবলমাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও এই পর্যায়ে তিনি সরাসরি বিভিন্ন অপারেশনগুলোতে অংশ নিতে শুরু করেন। পুলিশি গ্রেফতার এড়াতে এবং আন্দোলনকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে মণি সিংহ এ সময় বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থান করতেন।[২৯]

অপরদিকে লেঙ্গুরা সংঘর্ষের পর আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশও মরিয়া হয়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুসং-দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট ও নলিতাবাড়ি থানার মোট ২৫টি পুলিশ ক্যাম্পে সশস্ত্র সিপাহীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পাশাপাশি আনসার বাহিনীও মোতায়েন করা হয়। এ সকল সিপাহী ও আনসার দরিদ্র কৃষক ও জনগণের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। সংঘর্ষ, জখম ও গ্রেফতারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পর স্থানীয় জনগণের বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে টঙ্ক বিরোধী কর্মীবাহিনী নলিতাবাড়ি পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে, ফলে বিক্ষুব্ধ জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। জনতা এসময় রাস্তার ব্রিজ, কালভার্ট প্রভৃতি ভেঙ্গে সরকারি বাহিনীর যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটায়। প্রশাসনও পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে এ সকল এলাকায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে জনগণের উপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়।[৩০] এমনিতেই লেঙ্গুরার সংঘর্ষের পর এক হাজার সিপাহীর এক সশস্ত্র বাহিনী এই অঞ্চলকে এক প্রকার অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, তার উপর যুক্ত হওয়া নতুন সিপাহীরা মিলে নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। তারা কৃষকদের গৃহ লুণ্ঠন, শারীরিক নির্যাতন, নারী ধর্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

---

২৯. প্রমথ গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ, ১২৫।
৩০. দৈনিক মাতৃভূমি, জুলাই ২৮, ২০০১ (মণি সিংহের জন্মশতবার্ষিকীর বিশেষ ক্রোড়পত্র)।

১৯৪৯ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলের কোন না কোন যায়গায় প্রতিদিনই পুলিশের সাথে কৃষকদের সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। মূলত আন্দোলরত সমগ্র এলাকা একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। টঙ্ক, লেভি, মহাজনী ঋণ সবই বন্ধ হয়ে যায়। কৃষক সমিতির স্লিপ ছাড়া কেউ একসাথে বেশি পরিমাণ ধান বিক্রয় পর্যন্ত করতে পারত না। সশস্ত্র পুলিশও ভীত হয়ে পড়ে। কখন কোথা থেকে চোরাগোপ্তা গুলি আসে বা বোমা ফাটে কিছুই ঠিক নেই। পাশাপাশি সরকারও মরিয়া হয়ে সংগ্রামীদের দমাবার জন্য প্রচণ্ড দমননীতি চালিয়ে যেতে থাকে।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধের এক গভীর রাতে প্রায় পাঁচশত সিপাহী, পুলিশ ও আনসার চারদিক থেকে গুলি করতে করতে একটি গ্রাম আক্রমণ করে। পুলিশের গুলিতে রাতের অন্ধকারেই শিশু, বৃদ্ধ নারী নির্বিশেষে ৪০ জন নিরীহ গ্রামবাসী ঘুমন্ত অবস্থাতেই নিহত হয় এবং প্রচুর পরিমাণ লোককে গ্রেফতারের পর পুলিশ গ্রামটি জ্বালিয়ে দেয়। এভাবে টঙ্ক আন্দোলন ক্রমান্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে, পাশপাশি পুলিশি নির্যাতনের সীমাও সকল সভ্যতাকে হার মানায়।

বিরাট এলাকা জুড়ে যখন কৃষক ও সরকারি বাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছিল, যখন সংর্ঘষে কোথাও পুলিশ মারা পড়ছিল আবার পালিয়ে জীবন রক্ষা করছিল আবার কখনো কখনো কৃষক গেরিলারা হার মানছিল ঠিক সেই সময় কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর (কমিনফরম) মুখপত্র "ফর এ লাস্টিং পীস অ্যান্ড ফর এ পিপলস ডেমোক্রেসি" নামক সম্পাদকীয়তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি রণনীতি ও রণকৌশলে ভুল করছে বলে জোরের সাথে লেখা হয়। এটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশব্যাপী পার্টির সভ্যরা তখনকার ভারতের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার সাধারণ সম্পাদক রণদীভের উপর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং তারা বুঝতে পারে যে সশস্ত্র আন্দোলনের পথটি ভুল ছিল। অন্যদিকে ১৯৫০ সালে সমগ্র বাংলায় শুরু হয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফলে মুসলিম লীগ সরকারও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও টঙ্ক আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এসকল ঘটনার

প্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন সুসং এলাকায় এক জনসভা করে বলেন,

> "আমরা তোমাদের দাবি অনুযায়ী টঙ্ক প্রথা তুলে দিচ্ছি, সবাই জমির স্বত্ব পাবে, জমিদারি প্রথাও আইন করে তুলে দেওয়া হবে কাজেই তোমরাও আন্দোলন থামিয়ে দাও।"[৩১]

নূরুল আমিনের ঘোষণা ও লাস্টিং পীস পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় এবং দাঙ্গা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মণি সিংহের আহ্বানে ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে সুসং-দুর্গাপুরের এক পাহাড়ি ক্যাম্পে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নেতা-কর্মী এবং কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের নিয়ে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টঙ্ক আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সাথে সাথে নূরুল আমিনের ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। এভাবে ইতিহাস খ্যাত টঙ্ক আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ

কলকাতা কংগ্রেসের পর কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য যে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে তারই ধারাবাহিকতায় নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তৎকালীন নবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত নাচোল থানায় প্রচুর পরিমাণে সাঁওতাল কৃষক বাস করত। তে-ভাগা ইস্যুকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সাঁওতালগণ জমিদারদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে যা নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ নামে পরিচিত। নবাবগঞ্জ মহকুমার কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী ইলা মিত্র এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেছিল।

১৯৫০ সালের ধান কাটার মৌসুমে কৃষকরা তে-ভাগার অনুকরণে ধান বন্টন শুরু করলে জমিদারের সাথে কৃষকদের মতবিরোধ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জমিদারের পোষ্য বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ জমিদারদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে এবং কৃষকদের ব্যাপক নির্যাতন করে। কৃষকরাও এক পর্যায়ে পুলিশের বিরুদ্ধে পাল্টা

৩১. ঐ, পৃ, ১০৪।

আক্রমণ শুরু করে। ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা তফিজউদ্দিন ৩ জন কনস্টেবলসহ গরুর গাড়িতে করে ঘাসুড়া গ্রামে যায়। পুলিশ কৃষকদের ধান সিজ করতে এসেছে—এই আশংকায় গ্রামবাসী তাল গাছের মাথায় লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে, ঢোল ও নাকাড়া বাজিয়ে পুলিশ আসার খবর দ্রুত ছড়িয়ে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যে তীর-ধনুক, বর্শা ও লাঠি সজ্জিত চার-পাঁচ হাজার সশস্ত্র সাঁওতাল কৃষক ঘাসুড়া গ্রামে হাজির হয়। ক্ষুব্ধ কৃষকদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পুলিশ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পুলিশ এতটাই ঘাবড়ে যায় যে, তাদের অস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেনি। অন্যদিকে জনতা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ছিল, তারা পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে মারপিট শুরু করে এবং দারোগাসহ পুলিশের সকল সদস্য নিহত হয়।[৩২]

নুরুল আমিন সরকার চরম নৃশংসতার সাথে এ ঘটনা মোকাবিলা করে। তিনি পাঁচশ জনের এক বিশাল বাহিনী নাচোলের সাঁওতাল কৃষকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন।[৩৩] সরকারি বাহিনী সাঁওতাল কৃষকদের ঘরে ঘরে হানা দিয়ে ব্যাপক লুটতরাজ, পুরুষদের নির্মম প্রহার ও নারীদের ধর্ষণ করে। বহু কৃষককে গ্রেপ্তার করে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অকথ্য অত্যাচার করা হয়। মারণাস্ত্রে সজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর সামনে টিকতে না পেরে নাচোলের কৃষকগণ দলে দলে গ্রাম ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। রমেন্দ্রনাথ মিত্র ও পার্টির অন্য কর্মীগণ আত্মগোপন করতে পারলেও ইলা মিত্রসহ একদল সাঁওতাল কৃষক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

গ্রেপ্তারের পর নাচোল থানায় পুলিশ লক্-আপে ইলা মিত্রের উপর বীভৎস অত্যাচার হয়। অনবরত কিল-ঘুষি, লাথি, বেত দিয়ে তাকে প্রহার করা হয়। তার চুল উপড়ে ফেলা হয়। পুলিশ তাঁকে ধর্ষণসহ তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে তার নারীত্বের চরম অবমাননা করে। পুলিশ লক-আপে একজন মহিলা রাজনৈতিক কর্মীর উপর এ ধরনের পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা সভ্য দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। লজ্জা-সঙ্কোচ দূরে ঠেলে ইলা মিত্র তার জবানবন্দিতে যে চিত্র সেদিন উদঘাটন করেছিল পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের ভিত্তিমূল তাতে কেঁপে উঠতে পারতো, যে কোন বিবেকবান মানুষের মনেও জ্বলতে পারতো ঘৃণার আগুন। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের এই

৩২. ঐ, পৃ.১২৯।
৩৩. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

কলঙ্কিত কাহিনী সেদিন পূর্ব বাংলার মানুষ ভাল করে জানতে পারেনি। সরকারের আজ্ঞাবহ সংবাদপত্রসমূহ এ জবানবন্দি প্রকাশে ছিল নীরব। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অমানুষিক প্রহারের ফলে ২৪ জন সাঁওতাল নাচোল থানা হাজতেই মারা গিয়েছিল।[৩৪]

সাঁওতাল রাজবন্দিদের পুরো দলটিকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানেও তাদের উপর অত্যাচার অব্যাহত থাকে। রাজশাহী জেলে একটি ছোট ঘরের মধ্যে তাদের বিনা চিকিৎসায় রাখে এবং আধপেটা খাইয়ে ও ক্রমাগত অত্যাচার করে তাদের অনেককে হত্যা করা হয়। কিন্তু সাঁওতাল রাজবন্দিদের প্রতি অমানবিক নির্যাতনের পরও পুলিশ তাদের মধ্য থেকে একজনেরও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পরেনি।[৩৫] নবাবগঞ্জ থেকে ইলা মিত্রসহ অন্য রাজবন্দীদের রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ইলা মিত্রসহ সকল সাঁওতাল রাজবন্দির পক্ষে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল কুমিল্লার উকিল ও রাজনৈতিক নেতা কামিনী দত্ত। মামলার দিন আদালতের সামনে জবানবন্দি দিতে গিয়ে ইলা মিত্র ঠিক কি বলবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় অপ্রত্যাশিতভাবে বরিশালের মনোরমা বসু, খুলনার ভানু দেবী প্রভৃতির কাছ থেকে ইলা মিত্র গোপনে একটি চিঠি পান। চিঠির মূল মর্মার্থ ছিল

> "পাকিস্তান সরকারের চরিত্র উদঘাটন করে দেবার ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ, আপনি এই সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করবেন না। আদালতে আপনি জবানবন্দী দেবার সময় আপনার উপর যত কিছু অত্যাচার হয়েছে তার সব কথা পরিষ্কারভাবে খুলে বলবেন। মেয়েদের সংস্কার এবং লজ্জা যেন আপনাকে সেই সত্য কথাগুলি স্পষ্ট ভাষায় বলতে কোন রকম বাধা দিতে না পারে।"[৩৬]

গ্রেফতারের পর নাচোল থানা হাজতে নিয়ে গিয়ে ইলা মিত্রের উপর পাকিস্তানি সরকারের পুলিশ যে চরম নির্যাতন করেছিল সেই নির্যাতনের চিত্র রাজশাহী আদালতের সামনে নিজের জবানবন্দিতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত পত্রটি

---

৩৪. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড,পৃ. ২১২।
৩৫. সত্যেন সেন, *বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম*, (ঢাকা: কালি-কলম প্রকাশনী,১৯৮৪), পৃ, ১১০।
৩৬. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১১৯।

খুবই সহায়ক হয়।[৩৭] ১৯৫০ সালের ৭ নভেম্বর একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ মিয়ার কাছে ইলা মিত্র "Examination of accused Person" হিসেবে স্বীকারোক্তিমূলক যে জবানবন্দি দিয়েছিল তা হুবহু সংযোজনী ২-এ তুলে দেওয়া হলো।

জেলের অভ্যন্তরে গ্রেফতারকৃতদের উপর এরূপ নৃশংস ও ভয়াবহ নির্যাতনের পাশাপাশি পাকিস্তান সরকার আন্দোলন অধ্যুষিত সাঁওতাল গ্রামগুলোতে চালায় আরো অনেক অনেক ভয়াবহ ও নৃশংস অত্যাচার। এসময় সরকারি নির্যাতনে ঠিক কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, কত নারী ধর্ষিত হয়েছে, কতজন গ্রেফতার হয়েছে এবং কতজন নির্যাতনের কারণে চিরতরে পঙ্গু ও আহত হয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার চিহ্ন বহন করেছিল এর প্রকৃত হিসাব বের করা খুবই কঠিন। সরকারের ব্যাপক দমন নীতির কারণে নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত একটি প্রত্যক্ষ ফলাফলবিহীন আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের ফলে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারায়, অনেক মা- বোন ধর্ষিত হয়, অসংখ্য লোক গ্রেফতার হয় এবং সর্বোপরি ঐ অঞ্চলের এক বিশাল জনগোষ্ঠী পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল যাদের অধিকাংশই আর কোন দিন ফিরে আসেনি। কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিপ্লব সম্পন্ন করার নীতি যে সঠিক ছিল না নাচোল কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতার মাধ্যমে তা আরো একবার প্রমাণিত হয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ভারত বিভক্তির পর ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার কালশিরা গ্রামের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা শুরু হয় এবং তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সালের ২০ ডিসেম্বর খুলনা জেলা পুলিশের একটি দল জয়দেব নামের একজন কমিউনিস্ট কর্মীকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে তৎকালীন বাগেরহাট মহকুমার কালশিরা গ্রামে উপস্থিত হয়। বাড়ি তল্লাশির সময় অন্যান্য নির্যাতনের সাথে মহিলাদের ধর্ষণের চেষ্টা করলে তারা কমিউনিস্ট সমর্থক এক বিশাল জনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই

---

৩৭. সত্যেন সেন, পূর্বোক্ত, পৃ, ১১১-১১২।

জনতার অধিকাংশই ছিল নমঃশূদ্র। ঘটনাস্থলে একজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত এবং অন্যরা আহত হয়।[৩৮] পুলিশের সাথে থাকা কয়েকজন আনসার পার্শ্ববর্তী মুসলমান গ্রামবাসীকে সাম্প্রদায়িক প্রচারণার দ্বারা উত্তেজিত করে তাদের সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তাদের সহায়তায় আহত পুলিশ কনস্টেবলরা পালিয়ে যায়।[৩৯] পরবর্তীতে এলাকাটিতে ব্যাপক পুলিশি নির্যাতন শুরু হলে কালশিরা, ঝালেরডাঙ্গা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নমঃশূদ্র গ্রামবাসী তাদের বহনযোগ্য কিছু কিছু মালপত্র নিয়ে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করে। এলাকা ত্যাগের পর তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি স্থানীয় কিছুসংখ্যক মুসলমানদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।[৪০]

সংঘর্ষের সময় স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও সে সময় বা তার পরবর্তী পর্যায়ে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেখানে ঘটেনি। মূলত ১৯৫০ সালের এই দাঙ্গার জন্য প্রধাণত দায়ী ছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের কতকগুলো সাম্প্রদায়িক পত্রিকার মিথ্যা ও উস্কানিমূলক খবর ও তৎকালীন দুই এলাকার রাজনীতিবিদদের অদূরদর্শিতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব। ১৯৪৯ সালের ২৪ থেকে ২৬ ডিসেম্বর কলকাতার ভারতীয় হিন্দু মহাসভার এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডক্টর এম বি খারে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয়লাভকারী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি জেলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন। এই দাবি আদায়ের জন্য তিনি প্রয়োজনে পাকিস্তানের উপর বলপ্রয়োগেরও হুমকি দেন। এছাড়া মহাসভার একটি প্রস্তাবে পাকিস্তানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলা হয়।[৪১] মহাসভার এই সম্মেলনের পর মহাসভার নেতারা পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা এবং তাদের উপর মুসলমানদের নির্যাতন সম্পর্কে বিভিন্ন অপপ্রচার চালাতে থাকে। পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক পত্রিকাগুলো তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা থেকে প্রকাশিত মর্নিং নিউজ, দৈনিক আজাদসহ বিভিন্ন পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক মসজিদ নষ্ট হওয়ার কাহিনী

৩৮. *The Daily Morning News*, January 28, 1950.
৩৯. বদরউদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২২৮।
৪০. E. B. L. A. Proceedings, 10th March (1950, Vol. IV. No. 8), P.-183.
৪১. E. B. A. Proceedings, 10th March. (1950, Vol. IV. No. 8), p-188.

প্রচার করে। তা ছাড়া হিন্দু মহাসভার কলকাতা সম্মেলনের বক্তব্য এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক বক্তব্য বিবৃতি, সম্পাদকীয় প্রভৃতি পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিশেষ স্থান লাভ করে।[৪২] পত্র-পত্রিকাগুলোর পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন যেমন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং পূর্ব বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের মত রাজনৈতিক নেতৃবর্গ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের উস্কানিমূলক সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রদান করতে শুরু করেন যা অবস্থার অবনতি ঘটায় এবং দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। ১৫ জানুয়ারি সর্দার প্যাটেল কলকাতার গড়ের মাঠে এক বিরাট জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,

> পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলার সীমানা কৃত্রিম এবং সেই সীমানা পূর্ব বাংলার ভাইদের সাহায্য করার জন্য পশ্চিম বাংলা ও ভারতের হিন্দুদের সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।[৪৩]

প্যাটেলের এই বক্তব্যের পর পশ্চিম বাংলার পত্র-পত্রিকাগুলো পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য ও কাহিনী প্রকাশ করতে শুরু করে এবং কালশিরার ২০ ডিসেম্বরের ঘটনাকে বিকৃত করে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেখানে ব্যাপক হত্যা, লুটতরাজ, মারপিট ও ধর্ষণের মনগড়া কাহিনী প্রকাশ করে।[৪৪] ১৮ জানুয়ারি যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকা কালশিরার ঘটনা নিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যা কার্যত দাঙ্গার সকল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং ১৯ জানুয়ারির পর থেকে পশ্চিম বাংলার কোন কোন এলাকায় দাঙ্গা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বনগাঁ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় 'সংখ্যালঘু অধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিল' ও হিন্দু মহাসভা একক ও যৌথভাবে ২১ থেকে ২৪ জানুয়ারি সাম্প্রদায়িক সভা-সমাবেশ শুরু করে এবং এরপরই বনগাঁ, বহরমপুর, গোরাবাজার, মুর্শিদাবাদ, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতার মানিকতলা ও বেলেঘাটাতে দাঙ্গা শুরু হয়।[৪৫] ২৯ জানুয়ারি মহাসভা বাটানগরে একটি জনসভা

---

৪২. দৈনিক আজাদ ও মর্নিং নিউজ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য

৪৩. যুগান্তর এবং আনন্দ বাজার পত্রিকা; জানুয়ারি ১৬, ১৯৫০।

৪৪. E. B. L. A. Proceedings, 10th March. (1950, Vol. IV. No. 8), P.-184.

৪৫. *দৈনিক আজাদ*, জানুয়ারি ২৫, ১৯৫০।

করে এবং এরপর সেখানেও এক ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয় যা পর্যায়ক্রমে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল তথা আসাম ও বিহারে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।[৪৬]

পূর্ব পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও পশ্চিমবঙ্গের এই দাঙ্গাকে পুঁজি করে খবর প্রকাশ ও বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান শুরু করে। যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা তৈরির গ্রাউন্ড ওয়ার্ক। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ঢাকার দৈনিক মর্নিং নিউজ ও দৈনিক আজাদ পত্রিকা এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ। ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার চিফ সেক্রেটারিদের দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলন শুরু হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে চিফ সেক্রেটারিদয় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধিকর জনসভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ, পুস্তিকা, প্রচারপত্র প্রভৃতির মুদ্রণ ও বিতরণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে বা আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে এরূপ সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য উভয় দেশের সংবাদপত্রসমূহের সহযোগিতা কামনা করেন।

কিন্তু এরপরও ৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় দাঙ্গা শুরু হয়।[৪৭] ঢাকার এই দাঙ্গা সম্পর্কে তাজউদ্দীনের ডায়রিতে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

> দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত নবাবপুর, সদরঘাট, পাটুয়াটুলি, ইসলামপুর, ডিগবাজার, ইংলিশ রোড, বংশাল, চকবাজার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঘুরে মুসলমানরা হিন্দুদের যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে তা দেখে বেড়ালাম। রাত্রি যাপন করলাম কমরুদ্দীন সাহেবের বাসায়।
>
> বিশেষ নোট: স্বাধীনতার পর এই প্রথম আজ দুপুর ১২টা থেকে ঢাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেছে। এর কারণ, কলকাতার হাঙ্গামা বিশেষত বিহারীরা, এই গণ্ডগোলের জন্য দায়ী। স্থানীয় লোকেরা বিরুদ্ধে না থাকলেও উদাসীন ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত লুটতরাজ, হত্যা এবং অগ্নিদাহ অপ্রতিরোধ্যভাবে চললো। এসব

---

৪৬. বদরউদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৩০।
৪৭. *দৈনিক আজাদ*, ফেব্রুয়ারি ১২, ১৯৫০।

> থামাবার জন্য পুলিশ কিছুই করলো না। অবাঙালি পুলিশেরা উৎসাহ দিলো। সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলো। সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারি করা হলো কিন্তু কার্যকর হলো না।[৪৮]

১০ তারিখে শুরু হওয়া এই দাঙ্গা ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এসময় ঢাকাতে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি লুণ্ঠনের পর তাদের জীবন নিয়ে শুরু হয় টানা-হেঁচরা। বিভিন্ন যায়গায় চলতে থাকে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ, অনেক সংখ্যালঘুকে পরিবারসুদ্ধ হত্যা করা হয়, এমনকি চলন্ত ট্রেনের কামরার মধ্যেও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঢাকায় সরকারের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হলেও সংখ্যালঘুরা তাতে তেমন একটা আসেনি। প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে সৈন্য মোতায়েন এবং সান্ধ্য আইন জারি করা হলেও সংখ্যালঘুদের সম্পদ লুণ্ঠন ও তাদের হত্যাকাণ্ড থামানো সম্ভব হয়নি।[৪৯]

১৩ ফেব্রুয়ারি বরিশালে গুজব ছড়ায় যে কলকাতায় ফজলুল হককে হত্যা করা হয়েছে। আর এই গুজবের সাথে সাথেই বরিশালে দাঙ্গা শুরু হয় এবং তা বিভিন্ন মহকুমা ও থানায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৩ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালি জেলার ফেনীতে দাঙ্গা শুরু হয়। চট্টগ্রামে দাঙ্গা শুরু হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি আর ১৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার বিভিন্ন এলাকায়। পূর্ব পাকিস্তানের এই দাঙ্গা প্রায় সকল জেলাতেই ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে, অন্যদিকে ভারত থেকে অসংখ্য মুসলমান তাদের সর্বস্ব ছেড়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। এসময় ভারতে মুসলমান উদ্বাস্তু যাত্রী বোঝাই ট্রেনে হিন্দুদের হামলা অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের অনুরূপভাবে হিন্দু উদ্বাস্তু যাত্রী বোঝাই ট্রেনে মুসলমানদের হামলা অহরহ ঘটতে শুরু করে। এই হামলাগুলোতে অসংখ্য লোক প্রাণ হারায়। যার প্রমাণ মেলে ১৩ ফেব্রুয়ারি ভৈরবে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি সান্তাহারের ট্রেন আক্রমণের ঘটনায়।[৫০]

---

৪৮. তাজউদ্দীন আহমেদের ডায়রি।
৪৯. বদরউদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৩৬।
৫০. E. B. L. A. Proceedings, (Vol. IV, No. 8), P. -186-87.

কুমিল্লায় বসবাসকারী ফরাসি জমিদার পিয়ের ভিলানির সাথে এক সাক্ষাৎকারের পর লন্ডন ইকনমিস্ট ও ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েনের প্রতিনিধি তায়া জিনকিন কুমিল্লার পরিস্থিতি ও ভৈরব সেতুর কাছে উদ্বাস্তু ট্রেনযাত্রীদের হত্যা সম্পর্কে লেখেন :

> এর ফলে কুমিল্লার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়নি, কিন্তু চারদিকে এমন ভীতির সঞ্চার হয়েছিল যে তা তেলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেক হিন্দু ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলো। তিনি (পিয়ের) তাদেরকে থেকে যাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করেছিলেন কিন্তু তারা তা শুনতে চায়নি। বোধহয় তারাই সঠিক ছিল, কারণ তিনি নিজেও তো সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন, কাজেই তারা যখন গাদাগাদি করে ট্রেনে চড়ে ভারতের দিকে রওয়ানা হচ্ছিলো তখন তিনি তাদেরকে বিদায় জানালেন। ট্রেনটি নদী পার হয়ে যখন ময়মনসিং জেলার মধ্যে প্রবেশ করলো তখন সেটিকে সেতুর উপরই ঘেরাও করা করা হলো। ইঞ্জিনের ড্রাইভার ইচ্ছে করেই ট্রেনটা থামিয়ে দিয়েছিলো। সেতুটির দুই দিক থেকেই খুনির দল যাত্রীদের আক্রমণ করলো। যারা নিরাপত্তার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সাঁতরে তীরের দিকে যেতে চেষ্টা করলো তাদের মাথায় ইঁট মেরে ডুবিয়ে দেয়া হলো। পিয়েরের মতে প্রায় ১,০০০ হিন্দু সেইভাবে নিহত হয়েছিল; তার ধারণা মতে সমগ্র পূর্ব বাঙলায় নিহতের সংখ্যা হলো ৩০,০০০ এবং ধর্ষণের সংখ্যা ২,০০০।[৫১]

মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একরকম থেমে যায়। এই দাঙ্গার ফলে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানে এক বিরাট উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৫০ সালের ১০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশকারী রেজিস্ট্রিকৃত উদ্বাস্তুদের যে তালিকা প্রস্তুত করে তাতে বলা হয়, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বনগাঁও, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগতদের সংখ্যা ৩৮,৩৪০; কাছাড় জেলা থেকে সিলেটে আগতদের

---

৫১. Taya Zinkin: Reporting India, Chatto Windus.

সংখ্যা ২৩,১১৫; গোয়ালপাড়া থেকে রংপুরে আগতদের সংখ্যা ৫৪,৫৬৯।[৫২] এই সংখ্যা যখন দেওয়া হয় তখন পশ্চিম বাংলা ও আসামের আশ্রয় শিবিরে অসংখ্য উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং ট্রেন, স্টিমার ও প্লেন ভর্তি হয়ে প্রতিদিনই বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়া হিন্দু উদ্বাস্তুদের কোন সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সূত্র থেকে পাওয়া যায়নি। তবে সে সংখ্যাও যে কয়েক লক্ষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[৫৩]

১৯৫০ সালের এই দাঙ্গা শুরু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে দাঙ্গার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি বেলা ১টা ৩০মি. কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-ছাত্র, পরিষদ সদস্য, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসতি কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। 'পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের নিকট আবেদন'–শীর্ষক একটি ইশতেহারের মাধ্যমে দাঙ্গা ও শান্তি সম্পর্কে এই কমিটির বক্তব্য জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়।[৫৪] শক্তিশালী পাকিস্তান গঠনের জন্য শান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধর্মের নামে এবং ভারতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতনকে দাঙ্গার যুক্তি হিসেবে খাড়া করার বিরুদ্ধে এই ইশতেহারটিতে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সর্বস্তরের জনগণকে দলমত ও ধর্ম নির্বিশেষে সরকারের ও শান্তি কমিটির শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়।[৫৫]

প্রগতিশীল ছাত্রদের নিয়ে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটি' নামে আরো একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ১৯৫০ সালের ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা আহ্বান করে

---

৫২. E. B. L. A. Proceedings, (Vol. IV, No. 8), P. -189.
৫৩. বদরউদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৩৮।
৫৪. E. B. L. A. Proceedings, (Vol. IV, No. 8), 10th March. 1950, P-184.
৫৫. বদরউদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৪১।

এবং সে উপলক্ষে '২ মার্চ শান্তি দিবস পালন করুন, নামে তারা একটি ইশতেহার প্রকাশ করে। ইশতেহারটিতে দাঙ্গার কারণ, দাঙ্গার উদ্দেশ্য প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা ছাড়াও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রতি এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুরোধ জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ তোয়াহা। এসময় "save Bengals from the Clutches of Riot-Mongers" শিরোনামে ইংরেজিতে দাঙ্গাবিরোধী একটি ইশতেহার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের নামে প্রচারিত হয়। মূলত এই ইশতেহারটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টির, যার মাধ্যমে দাঙ্গা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য তুলে ধরা হয়।[৫৬] ইশতেহারে দাঙ্গার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে দায়ী করা হয়। ইশতেহারের মাধ্যমে দেশের ছাত্র, শিক্ষকসহ সমাজের সকলের প্রতি দাঙ্গার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানানো হয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়কে স্বদেশভূমি ত্যাগ না করার অনুরোধ জানানো হয়।

রণদীভের রাজনৈতিক লাইন পরিবর্তন

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্ট থেকে কমিনফর্ম (কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো) মুখপত্র হিসেবে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। পরে এ পত্রিকাটির নাম হয় 'লাস্টিং পিস'। পত্রিকাটি ছিল সোভিয়েত রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টির মতামত বিনিময়ের একটি প্রকাশ্য বুলেটিন। এতে বিশ্বের বিভিন্ন কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক ও নেতৃবৃন্দ নিয়মিত লিখতেন। এ পত্রিকায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত লেখাগুলো থেকে সকলেই শিক্ষা গ্রহণ করত। ১৯৫০ সালের শুরুর দিকে এই পত্রিকায় ভারতীয় উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়,

> স্বাধীন হয়েও ভারত মূলত আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী একটি দেশ। এমনি ধরণের দেশে কায়েম হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরোক্ষ শাসন, যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির মৌলিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়। এসব দেশে সাম্রাজ্যবাদ-

---

৫৬. অনিল বিশ্বাস (সম্পাদিত), *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য (প্রথম খণ্ড)*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২), পৃ. ১৯৩।

> সামন্তবাদবিরোধী বিপ্লব এখনও অসমাপ্ত। একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ত বাদবিরোধী সকল শ্রেণি ও ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে সত্যিকারের স্বাধীনতা বা মুক্তি আসবে। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের সমর্থনে এসব দেশের বিপ্লব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত হয়েছে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব তৈরি করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র।[৫৭]

ভারতীয় উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিরাট আলোড়ন ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং এর তীব্রতা ও তিক্ততা পার্টিকে দ্বিধা বিভক্তির দিকে নিয়ে যায়। সকলেই রণদীভ লাইন গ্রহণের ফলে পার্টির যে ক্ষতি হয়েছিল তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকে এবং নতুন রাজনৈতিক লাইন উদ্ভাবনের দাবি সর্বতোভাবে উঠতে শুরু করে। রণদীভের কেন্দ্রীয় কমিটির উপর বিক্ষোভ প্রবল আকারে দেখা দেয়। পূর্বে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টি রণদীভের রাজনৈতিক লাইনের কঠোর সমালোচনা করে একটি থিসিস প্রকাশ করেছিল।[৫৮] এখন তারা কমিনফর্মের নিবন্ধ বিস্তারিতভাবে দলের মধ্যে প্রচার শুরু করে। এ অবস্থায় ১৯৫০ সালের মে মাসে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রণদীভের রাজনৈতিক লাইন থেকে সরে আসা এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বি টি রণদীভের দলীয় সদস্যপদ বাতিল ও তাকে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। সাথে সাথে দলের জন্য একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিও গঠন করা হয়। নব গঠিত এই কমিটির সম্পাদক হন অন্ধ্র প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক রাজেশ্বর রাও।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির লাইন পরিবর্তনের পরপরই ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির এক বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাদেশিক কমিটির সদস্যগণ এবং বিভিন্ন জেলা ও ফ্রন্ট থেকে আগত নেতৃবর্গ মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন উপস্থিত হয়। বৈঠকে পার্টির বিগত ২/৩ বৎসরের কার্যক্রম, নতুন রণনীতি, আশু

---

৫৭. শরবিন্দু দস্তিগার, জীবনস্মৃতি, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ, ১১৫।

৫৮. Khaled, Mortuza, *A Study in Leadership: Muzaffar Ahmad and the Communist Movement in Bengal*, (Calcutta: Progressive Publishers, 2001), p.103.

কর্মকৌশল (Tactical line) এবং নতুন প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়।

১. কার্যক্রম রিপোর্টে পার্টি নেতৃত্বের বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী ও হটকারী বিচ্যুতির কথা আত্মসমালোচনামূলকভাবে স্বীকার করা হয়;
২. পার্টির নতুন রণনীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে কমিনফর্মের মুখপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয়র বক্তব্যগুলোর আলোকে পাকিস্তানের বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সে ভিত্তিতে পার্টির রণনীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল রচনা ও মতামতের জন্য পার্টির অভ্যন্তরে বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়;
৩. পার্টির আশু কর্ম-কৌশলগত প্রশ্নে মূল সমস্যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যগরিষ্ঠ জনগণের সাথে পার্টির সংযোগ সাধনের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। সে সম্পর্কে অনেক আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত দুটি গ্রহণ করা হয়:
    ক. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সকল রাজবন্দির মুক্তি, শ্রমিক, কৃষক ও কর্মচারীদের সমস্ত দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য তাদের সাথে একাগ্রভাবে কাজ করা;
    খ. সরকারের তীব্র দমননীতির কারণে পার্টির নামে জনগণের মধ্যে সরাসরি কাজ করা সম্ভব ছিল না এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তখনও নানা প্রশ্ন বিদ্যমান ছিল, তাই সাময়িক কর্মকৌশল হিসেবে পার্টির প্রকাশ্য সদস্য ও কর্মীদের নিজেদের কমিউনিস্ট পরিচয় গোপন রেখে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে তার মাধ্যমে জনগণের ভিতর কাজ করা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভিতর পার্টির যোগাযোগ গড়ে তোলা;
৪. পার্টির সাংগঠনিক সংক্রান্ত বিষয়ে 'জেলা কমিটিগুলোর অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনে সেগুলোর পুনর্গঠন করা;
৫. সভায় কো-অপশনের ক্ষমতাসহ ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রাদেশিক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন (১) মণি সিংহ; (২) নেপাল নাগ; (৩) বারীন দত্ত; (৪) রওশন আলী; (৫) সুখেন্দু দস্তিদার; (৬) মন্টু মজুমদার; (৭) শহীদুল্লাহ কায়সার; (৮) মীর্জা আব্দুস সামাদ

ও (৯) শচীন বসু।[৫৯] কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মণি সিংহ। এছাড়া মণি সিংহ, নেপাল নাগ, বারীন দত্ত ও সুখেন্দু দস্তিদারকে নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়।

বৈঠকের পরবর্তী চার মাসের মধ্যে প্রাদেশিক কমিটি একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল (কর্মসূচি) রচনা করে তা ছাপিয়ে পার্টির সমর্থকদের মধ্যে বিলি করে। দলিলের মূল কথা ছিল :

> 'জনগণের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও তাদের সহযোগী বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক সমাজ, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি জনগণের সমন্বয়ে দেশে একটি ঐক্য ফ্রন্ট গঠন করা। পাশাপাশি দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজবন্দীদের মুক্তি, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, আমূল ভূমি সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি প্রদান, শ্রমিকদের জন্য উন্নত মজুরির ব্যবস্থা করা, পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি প্রভৃতির জন্য জনগণের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা।'[৬০]

প্রাদেশিক কমিটির বর্ধিত এই পূর্ণাঙ্গ বৈঠক ছিল পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পুনর্গঠন ও রণনীতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। বৈঠকে গৃহীত নতুন রণনীতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পূর্বের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠা এবং ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে কাজ করা এবং জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। সর্বোপরি ১৯৪৮ সালের পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের মাধ্যমে পার্টি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হতে শুরু করে।

ভাষা আন্দোলন

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ-এর প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এক সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে উর্দু ও ইংরেজির সাথে

---

৫৯. ঐ, পৃ, ১০৮।
৬০. জগলুল আলম, *বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা*, (ঢাকা : প্রতিক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯০), পৃ, ২২-২৩।

বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি জানায়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও মন্ত্রী গজনফর আলী এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বলেন, "উর্দু কোন প্রদেশের ভাষা নয়, উর্দু হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির প্রতীক।"[৬১] পূর্ব পকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুউদ্দীনও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরা একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে; সুতরাং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, রাজনৈতিক মহল ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং খাজা নাজিমউদ্দীনের বক্তব্যকে সকলে অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক বলে মনে করতে থাকেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায় এই ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে। গণতান্ত্রিক যুবলীগ, গণআজাদী লীগ, তমুদ্দুন মজলিশ এবং আরো কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে।[৬২] ১১ মার্চ ধর্মঘট চলাকালে হাইকোর্টের সামনে পিকেটিংরত ছাত্রদের ওপর পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ করলে এর প্রতিবাদ হিসেবে হাইকোর্টের উকিলরা আদালত বর্জন করে। ঢাকার বাইরেও পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ ও গণ-গ্রেফতার করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১১ মার্চের ধর্মঘটে পুলিশের আক্রমণে প্রায় দুই শতাধিক আহত এবং নয় শতাধিক গ্রেফতার হয়। তবে দিন শেষে পুলিশ ৬৯ জনকে জেলে পাঠিয়ে অবশিষ্টদের ছেড়ে দেয়।[৬৩] ১১ মার্চের এই পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৩ মার্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং ১৪ ও ১৫ মার্চ যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুরে ধর্মঘট পালিত হয়।

ছাত্রদের এই আন্দোলনে খাজা নাজিমউদ্দীন কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে যত দ্রুত সম্ভব

৬১. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৪০।
৬২. বদরউদ্দীন উমর, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৬১।
৬৩. ঐ, পৃ, ৭১।

পূর্ব পাকিস্তান সফরের অনুরোধ জানায়। ১৯ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন 'Urdu and Urdu shall be state language of Pakistan'. ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সমাবেশেও ভাষা প্রশ্নে তিনি একই মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া ভাষা আন্দোলনকারীদের তিনি পঞ্চমবাহিনী হিসেবেও অভিহিত করেন।

ইতোমধ্যে সংগ্রাম পরিষদের সাথে বর্ধমান হাউজে খাজা নাজিমুদ্দীনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পরিষদের পক্ষ থেকে আট দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলোকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম পরিষদের সাথে খাজা নাজিমউদ্দীনের তুমুল তর্ক-বিতর্ক হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি দাবিগুলো মেনে নেন।[৬৪]

এসময় পূর্ব পাকিস্তানসহ সমগ্র পাকিস্তানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে তিনি অনেককে বুঝাতে সক্ষম হন যে, ভাষা আন্দোলন হচ্ছে কমিউনিস্টদের কারসাজি। দেশের সংহতি বিনষ্ট করার জন্যই এই আন্দোলন করা হচ্ছে। অন্যদিকে খাজা নাজিমউদ্দীন সংগ্রাম পরিষদের দাবিগুলো মেনে নেওয়ায় পরিষদও মোটামুটি সন্তুষ্ঠ ছিল। ফলে সামগ্রিকভাবে ভাষা আন্দোলন কিছুটা শিথিলতা দেখা দেয়। কিন্তু এরপরও প্রতি বছর ছাত্ররা ১১ মার্চ-কে ভাষা দিবস পালন করত।

সংগ্রাম পরিষদের দাবিসমূহ মেনে নেওয়া ছিল আন্দোলনকে স্থিমিত করার জন্য খাজা নাজিমউদ্দীনের একটি কৌশল মাত্র। জিন্নাহ ও লিয়াতক আলীর মৃত্যুর পর খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলে ছাত্ররা ভেবেছিল এবার তিনি তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। কিন্তু বাস্তবতা ছিল একেবারেই বিপরীত। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় মুসলিম লীগের অধিবেশনে এবং ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"– বলে ঘোষণা করেন।

---

৬৪. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৪২।

এই ঘোষণার পর ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং এর প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। একই দিন বার লাইব্রেরিতে আওয়ামী মুসলিম লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদ ও খিলাফতে রাব্বানি পার্টিকে নিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। কর্মপরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন কাজী গোলাম মাহবুব এবং সদস্যরা হলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান, আবুল হাসেম, কামরুদ্দীন আহম্মেদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আব্দুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ।[৬৫]

খাজা নাজিমদ্দীনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিরোধ সংগঠিত করার জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসময় কমিউনিস্ট পার্টি আইনত নিষিদ্ধ না হলেও কার্যত একরকম নিষিদ্ধই ছিল। কারণ কোনো ব্যক্তিকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বলে চিহ্নিত করা গেলে পুলিশ তাকেই গ্রেফতার করত। কমিউনিস্টদের আশ্রয়গুলোর ওপর নিয়মিত আক্রমণ চালানো হত এবং কাউকে কমিউনিস্ট পার্টির কোন ধরনের সমর্থক ও দরদী বলে মনে হলেই তার উপর সরকারী বাহিনী নির্যাতন চালাত। কাজেই এ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সরাসরি কোন সভা অথবা মিছিল সংগঠিত করা অথবা সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এরপরও ১৯৫২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি 'বাংলা ভাষার অধিকার ও সকল ভাষার সমান মর্যাদা কায়েম করুন' শীর্ষক একটি গোপন ইশতেহারের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের মতামত প্রকাশ করে। ইশতেহারে খাজা নাজিমদ্দীনের দেওয়া বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা ও উর্দু ভাষার সমান মর্যাদা দানের দাবি জানানো হয় এবং আরবী হরফের মাধ্যমে বাংলা ভাষা লেখার পশ্চিমা চক্রান্তকে ব্যর্থ করার হন্য জনগণকে আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি পাকিস্তানের সকল ভাষা যেমন বাংলা, পশতু, পাঞ্জাবী, উর্দু, সিন্ধিসহ সকল ভাষাকেই রাষ্ট্রে সমান অধিকার প্রদানের দাবি জানানো হয়।[৬৬]

বাংলা ভাষা প্রশ্নে নজিমউদ্দীনের এরূপ অবস্থানের প্রেক্ষিতে ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং এক বিবৃতির মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি ধর্মঘটকে সমর্থন

---

৬৫. *দৈনিক আজাদ* ও *Daily Morning News*, February, 01, 1952.
৬৬. পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির বিবৃতি, ফেব্রুয়ারি ২, ১৯৫২।

করে। ইতোমধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হলে ছাত্ররা ১১ মার্চের পরিবর্তে ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেদিন পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, মিছিল ও শোভাযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল মূলত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।[৬৭]

২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। পরদিন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত এবং সেখান থেকে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্ররা স্থির করে যে, দশজনের ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পার্লামেন্ট ভবনের (বর্তমানে জগন্নাথ হল) গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্ররা দশজনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। প্রথম দলটি ছিল ছাত্রীদের। পুলিশ প্রথমে গ্রেফতার শুরু করলেও এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে শুরু করে। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাদানে গ্যাস ছাত্রদের উত্তেজিত করে তোলে। বিকেলে কোন হুঁশিয়ারি না দিয়েই পুলিশ মিছিলে গুলি চালাতে শুরু করে ফলে সালাউদ্দীন, জব্বার, রফিক ও আবুল বরকতসহ অনেকে শহীদ এবং ২০ জনের মত আহত হয়। আহতদের মধ্যে আব্দুস সালাম ৭ এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়।[৬৮]

পুলিশ দিয়ে হত্যাকাণ্ডের খবর প্রচারিত হওয়ার পরপর সমগ্র ঢাকা বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে এবং সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরপরই কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান সংগঠনী কমিটি "অত্যাচারী নুরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ববঙ্গব্যাপী তুমুল

---

৬৭. ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৯০

৬৮ *সাপ্তাহিক নওবেলা*, এপ্রিল ১০, ১৯৫২।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোল গড়িয়া তুলুন" শীর্ষক একটি সাইক্লোস্টাইল করা ইশতেহার প্রচার করে। ইশতেহারের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

> ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে ঢুকিয়া বারবার গুলি ও টিয়ার গ্যাস ও বেপরোয়া লাঠি চালাইয়া জুলুমবাজ নূরুল আমিন সরকার ভাষা আন্দোলনের ১৪ জন দেশপ্রেমিক কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। শহীদদের খুনে আজ লাল হইয়া উঠিয়াছে আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলন।
>
> নিজ মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজ যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাঁহারা জাতির বুকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যে ঢাকা নগরী আমাদের প্রিয় শহীদের খুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে সেই ঢাকা নগরীর বিক্ষুব্ধ জনগণ নুরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের জবাব দিবার জন্য আগাইয়া আসুন।
>
> লীগ সরকার জনগণের কোন সমস্যাই সমাধান করে নাই এবং তাঁহাদের জীবনে সঙ্কটকে আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আজ আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে নুরুল আমিন সরকার রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিতে চায়। এই জুলুমবাজ সরকারের অবসান ছাড়া জনগণের বাঁচার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন পথ নাই।
>
> জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ইশতেহারটিতে বলা হয়, দলমত নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণ একই সাথে আওয়াজ তুলুন:
>
> - নাজিম-নুরুল আমিন সরকার গদি ছাড়ো!
> - অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই!
> - হত্যাকারীর শাস্তি চাই; বেসরকারি তদন্ত কমিশন চাই, হত ও আহতদের জন্য পুরা ক্ষতিপূরণ চাই!
> - অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি চাই!
> - নিরাপত্তা আইন, ১৪৪ ধারা ও সমস্ত দমনমূলক আইনের প্রত্যাহার চাই!

> জুলুমবাজ লীগ সরকারের অবসানের দাবিতে, হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে, নিজ মাতৃভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে সমগ্র প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা করিয়া প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলুন। শহীদদের অসমাপ্ত আন্দোলনকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য শহীদদের নামে শপথ লউন।[৬৯]

২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে একের পর এক হরতাল পালিত হতে শুরু করে। সাধারণ জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে মর্নিং নিউজ ও সংবাদ অফিস পুড়িয়ে দেয়।[৭০] উল্লেখ্য যে, সংবাদ ও মর্ণিং নিউজ ছিল মুসলিম লীগের পত্রিকা। মন্ত্রীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা সামরিক ছাউনিতে আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে নুরুল আমিন এই আন্দোলকে কমিউনিস্টদের কারসাজি বলে বিবৃতি দেয়। তিনি বলেন, "কমিউনিস্টরা সাপ, তারা দিনের বেলায় গর্তে থাকে আর রাত্রি বেলায় বের হয়।"[৭১] তিনি আরো বলেন, ভারত থেকে পায়জামা পরে হিন্দুরা এসে এই আন্দোলন করছে।" কিন্তু তার এসব কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। একের পর এক হরতালে ঢাকা শহর অচল হয়ে পড়ে এবং সরকার মিলিটারি ও ই.পি.আর বাহিনীকে রাস্তায় নামিয়ে দেয়। ফলে আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপক সরকারি দমননীতি শুরু হয়। কিন্তু এরপরও সমগ্র দেশব্যাপী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য জনগণ মরিয়া হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বাংলা ও উর্দু ভাষায় কয়েকটি ইশতেহার বিলি করে তার মাধ্যমে 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও সকল ভাষার সমান মর্যাদা প্রদান, গুলি চালানোর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি তদন্ত কমিশন গঠন, ১৪৪ ধারা ও মিলিটারির প্রত্যাহার, শহীদদের ক্ষতিপূরণ, বন্দিদের মুক্তিদান, নিরাপত্তা আইন নাকচ, নুরুল আমিন সরকারের পদত্যাগসহ বিভিন্ন দাবি জানানো হয়।[৭২] ২৫ ফেব্রুয়ারি অপর একটি সার্কুলেশনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নূরুল আমিন ও মুসলিম লীগের বিভিন্ন অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ থাকার

---

৬৯. পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পুর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির বিবৃতি, ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৫২।
৭০. *দৈনিক সংবাদ*, ফেব্রু. ২৪, ১৯৫২ এবং *Daily Morning News*, February 01, 1952.
৭১. *Daily Morning News*, February 25, 1952.
৭২. পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পুর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির বিবৃতি, ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৯৫২।

আহ্বান ও সংগ্রাম কমিটির দাবিগুলোর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এই আন্দোলনে সকলকে শরীক হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।[৭৩] এ সময় নুরুল আমিন একদিকে পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে আন্দোলনকারী শত শত নেতা কর্মীকে গ্রেফতার আর অন্যদিকে আন্দোলনের তীব্রতা দেখে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আইন পরিষদে সুপারিশ করে। বাংলা ভাষা সম্পর্কে নুরুল আমিনের এই সুপারিশ ও সরকারের তীব্র দমননীতির কারণে আন্দোলনের গতি স্তিমিত হতে শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয় এবং সেখানে উর্দুর সাথে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন

ভাষা আন্দোলনের উত্তাপ শেষ হতে না হতেই ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। নির্বাচনের সময় ধার্য করা হয় ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস। সরকারের এই ঘোষণার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি দেশের বিভিন্ন জেলায় অফিস স্থাপন করে প্রকাশ্যে কাজ শুরু এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ঢাকার বংশাল রোডে পার্টির একটি অফিস উদ্বোধন করা হয়। নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পার্টি সভ্য মির্জা সামাদকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ বিভিন্ন নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে যুক্তফ্রন্ট গঠন সংক্রান্ত কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি পৌঁছে দেন।[৭৪]

---

৭৩. পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির বিবৃতি, ফেব্রুয়ারি ২৫ ও ২৮, ১৯৫২।

৭৪. নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০বছর*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ, ২৫।

নির্বাচন প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের কারণে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তায় একদিকে যেমন ব্যাপক ধস নেমেছিল ঠিক অপরদিকে আভ্যন্তরীণ কুন্দোলের কারণে এর সাংগঠনিক কাঠামোও বেশ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। সরকারি নির্যাতন ও হটকারী লাইন গ্রহণের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি অনেকটাই জন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও হটকারী লাইন পরিত্যাগ ও ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১৯৫৩ সালের দিকে কমিউনিস্ট পার্টি পুনরায় জনগণের আস্থা অর্জন করতে শুরু করে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানও তেমন একটা শক্তিশালী ছিল না।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের এক সম্মেলনে খোন্দকার ইলিয়াছ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব উথাপন করে। যুবলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ন্যায় প্রগতিশীল যুব ও ছাত্র সংগঠগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য মিছিল-সমাবেশের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির উপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৫৩ সালের শেষদিকে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।[৭৫] মুসলিম লীগ বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য প্রচেষ্টায় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টে যোগ দিতে পারেনি। মূলত নেজামে ইসলামসহ কতিপয় ইসলামপন্থী সাম্প্রদায়িক কিন্তু মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রবল আপত্তির মুখে মাওলানা ভাসানী, ফজলুল হক কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টে সামিল করতে আগ্রহী হয় নি। এরপরও কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নেয়, যে আসনগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী থাকবে না সেখানে তারা বাইরে থেকে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দিবে। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে যুক্তি ছিলঃ

> "কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারলেও, মুসলিম লীগ বিরোধী ফ্রন্টের অন্যান্য শরীক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগকে পরাজিত করাই হবে একটা বড় রকমের রাজনৈতিক বিজয়। কেননা, এতে করে একটা সাম্প্রদায়িক, চরম

৭৫. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ৬৭-৬৮।

> প্রতিক্রিয়াশীল, স্বৈরাচারী ও সংকীর্ণ-ধর্মান্ধ সরকারের শুধু যে পরিবর্তন ও পতনই হবে তাই নয়, মুসলিম লীগের পতন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে বয়ে আনবে এক গুণগত ও যুগান্তকারী পরিবর্তন। আর সে পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রদায়িকতার স্থান গ্রহণ করবে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও চেতনা, গড়ে উঠবে শ্রেণি ও গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার মত একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ।[৭৬]

যুক্তফ্রন্টে যে সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল তার মধ্যে আওয়ামী লীগ, কে.এস.পি, গণতন্ত্রী দল এবং নেজামে ইসলামের নাম উল্লেখযোগ্য।[৭৭] নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে কমিউনিস্ট পার্টি ফ্রন্টের বাইরে থেকে তাতে সমর্থন দেয়।[৭৮] ১৯৫৪ সালের এই নির্বাচনের একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল মুসলমান ভোটাররা মুসলিম প্রার্থীকে এবং হিন্দু ভোটাররা হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরি আটটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করায়, এর মধ্যে তিনটি ছিল মুসলিম ও পাঁচটি ছিল হিন্দু আসন। এছাড়া কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন ও যুক্তফ্রন্টের শরীক দল গণতন্ত্রী দলের মাধ্যমে চারজন এবং আওয়ামী লীগের ব্যানারে কয়েকজন কমিউনিস্ট সভ্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। যে আসনগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিল না সেখানে তারা যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীকে সমর্থন দেয়।[৭৯]

নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ব্যানারে অংশগ্রহণকারী হিন্দু আসনের সকল প্রার্থী জয়লাভ করে এবং মুসলিম আসনের সকল প্রার্থী হেরে যায়। তবে জেলে থেকেও যশোহরের আব্দুল হক হেরেছিলেন মাত্র কয়েকশ ভোটের ব্যবধানে। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমেও বেশ কয়েকজন কমরেড নির্বাচিত হয়। প্রদেশের সার্বিক ফলাফলে মুসলিম লীগের ব্যাপক ভরাডুবি ঘটে। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে মাত্র ৯টি আসন আর যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৮টি আসন।[৮০]

---

৭৬. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ২০।
৭৭. আবুল মুনসুর আহম্মদ, *আমার- দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৫), পৃ, ২৫১।
৭৮. নূরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৬।
৭৯. শরদিন্দু দস্তিগার, জীবন স্মৃতি, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ, ১৩৪।
৮০. নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৬।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল ছিল পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অধিকার আদায় ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকারের প্রথম পদক্ষেপ। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ধর্ম অপেক্ষা নিজেদের সংস্কৃতি, স্বকীয়তা ও জাতিগত চেতনাবোধকে যে বেশি মূল্য দেয় সে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে যে জনগণ মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল মাত্র সাত বছরের ব্যবধানে তারাই আবার সেই দলকে সরাসরি প্রত্যাখান করে এবং ২১ দফা তথা নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যুক্তফ্রন্টকে বিপুলভাবে জয়লাভ করায়। অপরদিকে ৫টি আসনে জয়লাভের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিহারের ফলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি জনগণের যে আস্থা তৈরি হয়েছিল এই নির্বাচনের মাধ্যমে সেটিরও প্রতিফলন ঘটে।

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টি অনুসরণ করেছিল বি টি রণদীভের সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনৈতিক লাইন। 'উপমহাদেশ একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে তা অনেকদূর এগিয়েছে তাই এ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ববর্তী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর পৃথকভাবে অতিক্রমের প্রয়োজন নেই। এখন সরাসরি সর্বহারা শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে'-এই উপলব্ধিবোধ থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির এ পদক্ষেপ এক অলীক স্বপ্ন থেকে যায়। মুসলিম লীগ সরকার নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলন প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করে দেয়। আন্দোলনরত কমিউনিস্ট বন্দী ইলামিত্রসহ অন্যান্যের সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ফলে পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবের স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কমিউনিস্ট পার্টিসহ বাঙালি জাতির দ্বিতীয় আঘাত আসে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে। ধর্মের নামে বিজাতীয় ভাষা এ দেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে রোধ করতে গিয়ে জীবন দিতে হয় ছাত্র-জনতাকে। এ সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি উপলব্ধি করে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পূর্বশর্ত হিসেবে পাকিস্তানে আগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণতান্ত্রিক পাকিস্তান নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় ১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ উদ্যোগে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে কমিউনিস্ট পার্টি আশা করেছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে তারা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৪ সাল পরবর্তী সময়ে শাসকগোষ্ঠী একের পর এক চক্রান্ত শুরু করে। ফলে জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার পথ বাধাগ্রস্ত হতে শুরু করে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা

নির্বাচনে জয়লাভের পর ১৯৫৪ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান যুক্তফ্রন্ট নেতা ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানালে

১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল ফজলুল হকের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।[1] নতুন মন্ত্রিসভায় কমিউনিস্ট পার্টির কোনো এম.এল.এ. অথবা যুক্তফ্রন্টের পতাকায় নির্বাচিত কোনো কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নদের যায়গা হয়নি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভায় আন্তর্ভুক্ত না করায় যুক্তফ্রন্টের মধ্যে মারাত্মক বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মে মাসের মাঝামাঝির দিকে ফজলুল হক তার মন্ত্রিসভা বর্ধিত করে আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করে সমস্যার সমাধান করেন।[2]

নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পরপরই মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফজলুল হক কলকাতা সফরে যান। কলকাতায় তিনি ৩ ও ৪ মে দুটি সমাবেশে আবেগময় বক্তব্য দেন। সমাবেশ দুটিতে তিনি বলেন,

> আজ আমাকে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। আশা করি 'ভারত' শব্দটি ব্যবহার করায় আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এর দ্বারা পাকিস্তান ও ভারত উভয়কে বুঝিয়েছি। এই বিভাগকে কৃত্রিম বিভাগ বলে আমি মনে করতে চেষ্টা করব। আমি ভারতের সেবা করবো। দুই বাংলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা একটা স্বপ্ন ও ধোঁকা মাত্র। করুণাময় খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করব, এই ব্যবধান দূর করার জন্য।[3]

ফজলুল হকের এই বক্তব্যকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে ব্যাখ্যা করে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো একের পর এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেতে থাকে। কলকাতা থেকে ফিরে ফজলুল হক তার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের পর সংবিধান পরিষদ বিলোপ এবং শীঘ্রই কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবি করে। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী এই দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।[4] অপরদিকে নির্বাচনের পর থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানের কল-কারখানাগুলোতে বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং মে মাসের মাঝামাঝি থেকে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিল এবং চট্টগ্রামের

---

১. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত '*বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ, ৪৭৮।

২. আবুল মুনসুর আহম্মদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৫), পৃ,২৬২।

৩. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ, ২৩।

৪. আবুল মুনসুর আহম্মদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ,২৬৩।

চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই কারখানা দুটিতে সংঘর্ষে বহু শ্রমিক প্রাণ হারায়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ফজলুল হককে করাচিতে তলব করে। কয়েকজন মন্ত্রীসহ ফজলুল হক সেখানে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতায় দেওয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনে এবং তাকে বলা হয় যে, "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাকে আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় না।" অবশেষে ফজলুল হক ও তার মন্ত্রীরা পাকিস্তানের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রদান করে। কিন্তু ফজলুল হক ও তার মন্ত্রীরা পূর্ব পাকিস্তানে আসার জন্য পথে থাকা অবস্থাতেই ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শাসন জারি করে।[৫]

হক মন্ত্রিসভা বাতিলের সময় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে একজন স্বঘোষিত রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করে সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টিত অবস্থায় নিজ বাড়িতে অন্তরীণ করার পাশাপাশি পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যুক্তফ্রন্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় দেড় হাজারের অধিক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ত্রিশজন ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। গ্রেফতারের পাশাপাশি যুক্তফ্রন্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের উপর চলতে থাকে নির্যাতনের স্টিম রোলার। কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ভেঙ্গে ফেলা হয়। এ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ নেতাকর্মী আত্মগোপন করে। ১৯৫৪ সালের ৪ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টিকে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং অধিকাংশ নেতার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর এ নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানের পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানেও সমানভাবে চলতে থাকে এবং ২৪ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সিনিয়র নেতাদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় এবং অনেকে গ্রেফতারও হন।[৬]

---

৫. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৮০।
৬. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী), পৃ, ১৩৮।

অস্থিতিশীল গণতন্ত্র

১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধিত সভার পর থেকেই দলের নেতা-কর্মীরা প্রয়োজনে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল দলগুলোর মাধ্যমে কাজ করে আসছিল। এমনকি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কয়েকজন সদস্য আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্রী পার্টির পতাকায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জয়লাভও করে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের ৪ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর দলটির কিছু নেতা সরাসরি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায় এবং সেখান থেকে পার্টির কার্যক্রম চালায়, অপর একটি বড় অংশ বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলে যোগদান করে তাদের মাধ্যমে দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন।

ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার কয়েক মাস পর, ২৩ অক্টোবর পাকিস্তানের গণ-পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু গণ-পরিষদের স্পিকার তমিজউদ্দীন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে গণ-পরিষদ পুনরায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৭]

১৯৫৫ সালের প্রথমমার্ধে গভর্নর জেনারেল এক ডিক্রি জারির মাধ্যমে মে মাসে গণ-পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে এবং পাকিস্তান থেকে জরুরি অবস্থা ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৯২ (ক) ধারা প্রত্যাহার করে নেয়। ৯২ (ক) ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে আইনসভার কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয় এবং আইনসভার যে সকল সদস্য কারাগারে আটক ছিল তারাও মুক্তি পায়। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, এমনকি তাদের যে সকল নেতা-কর্মী জেলে অন্তরীণ ছিল তাদেরকেও মুক্তি দেওয়া হয়নি এবং যে সকল আন্ডারগ্রাউন্ড নেতার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল তাও বহাল থাকে।

রাজনৈতিক এই অরাজগতার সুযোগে সেনাবাহিনী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়তে শুরু করে।

৭. হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, (ঢাকা: নিউএজ পাবলিকেশন্স, ২০০১), পৃ, ১৯৯।

ফলে গোলাম মোহাম্মদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তার পদত্যাগের পর পরই বগুড়ার মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ থেকে বাদ পড়েন। জেনারেল ইসকান্দার মির্জা নতুন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়।[৮] চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর শপথ গ্রহণের পর ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে গণ-পরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে তা কার্যকর হয়।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে গণ-পরিষদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্টের (কেএসপি) নেতা আবু হোসন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের কিছুদিন পর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে,

> "আমি এখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, সুতরাং কমিউনিস্টদের এখন আর গোপনে থাকার প্রয়োজন নেই। আপনাদের যাদের নামে ওয়ারেন্ট আছে, আমি সেসব উঠিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়েছি। কাজেই যারা গোপনে আছেন তারা শীঘ্রই প্রকাশ্যে চলে আসুন।"[৯]

মুখ্যমন্ত্রী এই নিশ্চয়তা দেওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান আলোচ্যসূচি ছিল পার্টির প্রকাশ্যে কাজ করা ও না করা নিয়ে। দুই পক্ষেই বেশ জোরালো মতামত আসে এবং গোপন ভোটের মাধ্যমে প্রকাশ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়।[১০] ফলে মণি সিংহসহ আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা সকল নেতা-কর্মী প্রকাশ্যে এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। অপরদিকে আবু হোসন সরকারও তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরদার ফজলুল করিমসহ অধিকাংশ কমিউনিস্ট নেতাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়। জেল থেকে মুক্ত নেতাদের সংবর্ধনার জন্য ঢাকার পল্টন ময়দানে একটি জনসভাও করা হয়। এসময় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পার্টির নীতি, কৌশল প্রভৃতি বিষয়গুলো জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু ২১ নভেম্বর ঢাকার পুলিশরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু করলে আবু হোসেন মন্ত্রিসভা 'এই ধর্মঘটের পিছনে কমিউনিস্টদের হাত রয়েছে'– এমন অজুহাতে কমিউনিস্ট

---

৮. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৮।
৯. ঐ, পৃ, ২৮।
১০. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৪৮।

পার্টিকে অভিযুক্ত করে এবং দলের নেতা-কর্মীদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। আকস্মিক এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ২১ নভেম্বর সন্ধ্যায় সিদ্দিক বাজারে কমিউনিস্ট পার্টির একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মণি সিংহের প্রস্তাব অনুযায়ী পার্টির যে সকল নেতাকর্মীর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে তারা পুনরায় আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে গোপনে এবং যাদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা নেই তারা প্রকাশ্যে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।[১১]

২২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেফতার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ববঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের অংশ বিশেষকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে— এই মর্মে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে মৌখিক অভিযোগ আনা হয়।[১২] হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনসভা, সভা-সমাবেশে প্রভৃতির মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির উপর সরকারি এই দমননীতির তীব্র সমালোচনা করে।[১৩]

আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা ক্ষমতা গ্রহণের পর পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র এক ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রশাসনের সর্বস্তরে দেখা দেয় ব্যাপক দুর্নীতি, পাশাপাশি চলতে থাকে খাদ্য সঙ্কট। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক ভুখা মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে একজন কৃষক নিহত হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৯৫৬ সালের ৩১ আগস্ট আবু হোসেন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানায়। ৬ সেপ্টেম্বর গণতন্ত্রী দল, কংগ্রেস ও তফসিলী ফেডারেশনকে নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

অপরদিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতেও সমানভাবে অস্থিরতা চলতে থাকে। ১২ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়।[১৪]

---

১১. *সরদার ফজলুল করিমের সাক্ষাৎকার*, ১২ আগস্ট ২০০৪।
১২. খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৪৯।
১৩. *দৈনিক আজাদ*, ২৯ নভেম্বর, ১৯৫৫।
১৪. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৩৪।

কমিউনিস্ট পার্টি তাদের গণ-পরিষদ সদস্য সরদার ফজলুল করিমের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'সেফটি অ্যাক্ট' উত্থাপন করা হলে কমিউনিস্ট পার্টি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তাঁরা ধারণা করেছিলেন এই আইন রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু গণপরিষদে সরদার ফজলুল করিম এই আইনকে সমর্থন প্রদান করে। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে ফজলুল করিমের বিরোধ দেখা দেয় এবং ফজলুল করিমও পার্টির সাথে তার সংস্রব রক্ষায় অপারগতা প্রকাশ করে। একপর্যায়ে তাঁকে পার্টির সভ্যপদ থেকে অব্যহতি প্রদান করা হয়।[১৫] তবে পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়।

১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত গোপনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল (১) পার্টির কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা (২) রণ-কৌশলগত নীতি নির্ধারণ (tactical line) (৩) নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন এবং (৪) আওয়ামী লীগের মাধ্যমে কাজ করার কৌশল প্রসঙ্গ।

সম্মেলনে পার্টির কর্মসূচি প্রসঙ্গে কেন্দ্রে চৌধুরী মোহম্মদ আলীর প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের পরিবর্তে দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক দল, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন এবং পূর্ব পাকিস্তানে আবু হোসেন মন্ত্রিসভার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সমন্বয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, পাকিস্তানকে সামরিক জোট থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ, এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি বিষয়গুলো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে স্থান পায়।

মণি সিংহকে সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিন করা হয় এবং এই কমিটি 'পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির শাখা

---

১৫. ঐ, পৃ, ৩৫।

হিসেবে কাজ না করে বরং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে পার্টির কাজ করার কর্মকৌশলগত নীতি অপরিবর্তিত থাকে।[১৬] অপরদিকে 'পররাষ্ট্র নীতি'কে কেন্দ্র করে সোহরাওয়ার্দী প্রগতিশীল দলসমূহের দ্বারা এমনকি নিজ দল আওয়ামী লীগের ভিতরেও ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ প্রশ্নে মিসরের উপর ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইসরাইলের যৌথ অগ্রাসনকে সমর্থন, সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান এবং যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রধান দফা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে পাশ কাটানো প্রভৃতি বিষয়গুলোকে মেনে নিতে পারেন নি।[১৭] রাজনৈতিক এই মতবিরোধকে কেন্দ্র করে ১৯৫৭ সালের জুন মাসে তিনি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।[১৮] ন্যাপ গঠনের পর পরই কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য কর্মী যারা আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রীদলসহ বিভিন্ন দলের ব্যানারে কাজ করছিল তারা পার্টির নির্দেশে ঐ দলগুলো ত্যাগ করে ন্যাপে যোগ দিয়ে কাজ শুরু করে।[১৯]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব ব্যানারে ৫টি আসন লাভ করলেও যুক্তফ্রন্টের অন্য দলগুলোর ব্যানারে আরো ২১/২২টি আসন লাভ করেছিল। ন্যাপ গঠনের পর কমিউনিস্ট পার্টির এই সদস্যারা আইনসভায় ন্যাপ গ্রুপে যোগ দেয় এবং আইনসভায় তারা প্রত্যক্ষভাবে ন্যাপের ও পরোক্ষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করে।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে যাওয়ার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সোহরাওয়ার্দী ও ইসকান্দার মির্জার মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে ১৯৫৭ সালের ১৩ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী ক্ষমতা হারান এবং আই আই চুন্দ্রিগড়-এর মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ

---

১৬. *১৯৬৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ১৬।

১৭. খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৬২ ।

১৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, (ঢাকা : হাক্কানি পাবলিসার্স, ২০০৩), পৃ, ২২৯।

১৯. খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৬৫ ।

করে। কিন্তু মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে চুন্দ্রিগড় মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে ফিরোজ খান নুনের নেতৃত্বে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত করেন।

দ্বন্দ্ব, সংঘাত আর অবিশ্বাসের এই রাজনীতি কেবল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা বিভিন্ন প্রদেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। মওলানা ভাসানী বের হয়ে যাওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভাপতি আতাউর রহমান ও সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সংঘাত শুরু হয়। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কে.এস.পি, মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অলিখিত একটি জোট গঠন করে এবং তারা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় এবং ১৮ জুন আওয়ামী মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। আবু হোসেন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে।[২০] মূলত আইনসভায় ন্যাপভুক্ত কমিউনিস্ট সদস্যদের নিকট এই পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না পৌঁছানোর কারণে তারা একরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল।[২১]

ইতিপূর্বে আবু হোসেনের শাসনামলে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছিল, তাই তারা সবসময় আবু হোসেন সরকারের বিরোধী ছিল। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা পতনের পরপরই কমিউনিস্ট পার্টি সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এক জরুরি সভায় মিলিত হয়। সভায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগের অবস্থান এবং এ ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। আলোচনায় বলা হয় 'প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে সোহরাওয়ার্দী কিছু প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্ম এবং আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ-এর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার ও গুণ্ডামি করলেও, আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসারে এবং সমগ্র পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল।

২০. সৈয়দ আবুল মকসুদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৩৭।
২১. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৯।

এছাড়া, আওয়ামী লীগের বর্তমান ভূমিকা ষড়যন্ত্রী ইস্কান্দার মির্জার বিরুদ্ধে পরিচালিত, যে ইস্কান্দার মির্জা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্ত ভূস্বামী গোষ্ঠীর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে চলেছে। তাই বৃহত্তর জনস্বার্থেই পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা বহাল রাখা প্রয়োজন।' সাথে সাথে কমিউনিস্ট পার্টি আরো সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা এই সুযোগে আওয়ামী লীগকে কয়েকটি শর্ত প্রদান করবে এবং সেই শর্তগুলো মেনে নিলেই তারা আইনসভায় আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিবে। শর্তগুলো ছিল (১) যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা; (২) সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা; (৩) সার্টিফিকেট প্রথা রদ; (৪) স্বাধীন ও সক্রিয় জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ; (৫) সব ধরনের সামরিক জোট বর্জন ইত্যাদি।[২২] সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের মাধ্যমে উল্লিখিত শর্তগুলো আওয়ামী লীগের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে বলা হয়, এসকল শর্ত মেনে নিলেই কমিউনিস্ট পার্টি আইনসভায় আওয়ামী লীগকে সমর্থন করবে। মণি সিংহের মতে, 'উল্লিখিত শর্তগুলোর বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব থেকেই ওয়াকিবহাল ছিল এবং তা মেনেও নিয়েছিল, কেবলমাত্র বাদ ছিল আতাউর রহমান খান। শর্তগুলো পাওয়ার পর তিনিও তা মেনে নেয়।

১৯৫৮ সালের ২১ জুন প্রাদেশিক আইনসভায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবু হোসেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ন্যাপভুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা পার্টির নির্দেশানুসারে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে, ফলে মাত্র দুই দিন ক্ষমতায় থাকার পর আবু হোসেন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। মূলত দুইদিন পূর্বে ন্যাপভুক্ত পার্টির সদস্যদের ভোটে আওয়ামী লীগ একদিকে যেমন ক্ষমতা হারিয়েছিল ঠিক দুই দিন পর তাদের সমর্থন সূচক ভোটে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আবু হোসেন মন্ত্রিসভার পতন ও আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি এসময় যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক মহল থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিনন্দনও জানানো হয়।[২৩]

---

২২. ঐ, পৃ, ৫০।

২৩. মর্তুজা খালেদ, *বাংলাদেশে বাম রাজনীতি: রাজশাহী জেলা ভিত্তিক একটি সমীক্ষা*, ১৯২০-

সামরিক শাসনের অভ্যুদয়

২১ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে তা চেয়ার ও ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ি পর্যন্ত গড়ায়। ঘটনার এক পর্যায়ে আইন সভার ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মারাত্মকভাবে আহত হয়ে একদিন পর হাসপাতালে মারা যায়। অন্যদিকে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনে ব্যাপক মন্দা প্রভৃতির কারণে অর্থনৈতিক অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটে, যার কারণে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাধতে শুরু করে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আসন বণ্টনকে কেন্দ্র করে ফিরোজ খান নুনের সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, যার পরিণতিতে ১৯৫৮ সালের ২ অক্টোবর আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলে নতুন করে আরো একটি সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে নতুন সংবিধানের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভার সাথে ইসকান্দার মির্জার বিরোধ শুরু হয়। ফিরোজ খান ও আওয়ামী মন্ত্রীরা ছিল এই নির্বাচনের পক্ষে এবং তারা নির্বাচনের তারিখ পর্যন্ত ঘোষণা করে, কিন্তু নির্বাচনে হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় ইসকান্দার মির্জা নির্বাচনের বিরোধিতা করে। রাজনৈতিক এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ইসকান্দার মির্জা 'দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের' অজুহাত দেখিয়ে ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারি করেন।

সামরিক শাসন জারির ফলে দেশ পরিচালনার জন্য সাধারণ আইন কানুনের বদলে সামরিক আইন চালু করা হয় এবং দেশের শাসন ভার তুলে দেওয়া হয় সেনাবাহিনীর হাতে। সংবিধান বাতিলসহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর প্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।[২৪] কিন্তু মাত্র ২০ দিন পর, ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান

২০০০, (বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের গবেষণা প্রকল্পের অপ্রকাশিত রিপোর্ট, ২০০৫), পৃ, ৯৪-৯৫।

২৪. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৫২।

রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের শাসন ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করে এবং প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জাকে সস্ত্রীক দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। আইয়ুব খান নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তার নিকট দায়ী একটি মন্ত্রিসভাও গঠন করে। মন্ত্রিসভায় লোক দেখানো কিছু বে-সামরিক লোক অন্তর্ভুক্ত করা হলেও মূল মূল দপ্তরগুলো ছিল তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও বিশ্বাসভাজনদের হাতে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হয় পুলিশের সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল জাকির হোসেনকে।

সামরিক শাসন জারির পর কমিউনিস্ট পার্টির যে সকল নেতা-কর্মী স্বপরিচয়ে অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে কাজ করছিল তাদের সকলেই আত্মগোপনে চলে যায়। ফলে সরকার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেফতার শুরু করলেও অন্যান্য দলের তুলনায় কমিউনিস্ট পার্টির গ্রেফতারের পরিমাণ ছিল কম। সামরিক শাসন জারির প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে সামরিক শাসন জারির কারণ ব্যাখ্যা এবং পার্টির সভ্য ও কর্মীদের করণীয় নির্ধারণ করে।[২৫]

বৈঠকে সামরিক শাসন জারির কারণ হিসেবে বলা হয় (১) দেশব্যাপী সরকার বিরোধী গণজাগরণ; (খ) ফিরোজ খান নুন মন্ত্রিসভা কর্তৃক নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ; (৩) শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে উপদলীয় কোন্দল; (৪) ইরাক বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটগুলোর বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হওয়া প্রভৃতি ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর সামনে যে গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয় তা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের শেষ অস্ত্র সামরিক শাসন জারির আশ্রয় গ্রহণ করে।[২৬] মূলত সামরিক শাসন ছিল পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতায় টিকে থাকার শেষ প্রচেষ্টা।[২৭]

---

২৫. ঐ, পৃ, ৫১।
২৬. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৭৫।
২৭. ঐ, পৃ, ১৭৫।

সামরিক শাসন জারির উপর্যুক্ত কারণ বিশ্লেষণের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কমিটি সামরিক শাসনের অবসান, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজবন্দিদের মুক্তি, শ্রমিক-কৃষকসহ অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের আশু ও জরুরি দাবি-দাওয়া পূরণ ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রভৃতি ন্যূনতম দাবিতে সামরিক শাসন বিরোধী সকল দল ও শক্তিকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৮]

প্রকৃতপক্ষে সামরিক শাসন জারির পর কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল প্রথম সংগঠন যারা অতি দ্রুত নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের মাধ্যমে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সামরিক শাসন বিরোধী সকল শক্তিকে নিয়ে একটি ফ্রন্ট গঠনের চিন্তা করেছিল। এসময় পার্টির বে-আইনি মুখপত্র *মার্কসপন্থী*র নাম পরিবর্তন করে *শিখা* রাখা হয় এবং এই *শিখা* পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির বক্তব্য পার্টির মধ্যে প্রচার করা হয়।

সামরিক শাসনবিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভাবনা

ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই আইয়ুব সরকার পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমত ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা থেকে বাড়িয়ে ৩২০ বিঘা করা হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে কৃষির উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিক ও প্রান্তিক কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।[২৯] শহরাঞ্চলে শিল্পায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার পুঁজিপতিদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করলে শিল্পের দ্রুত প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে আদমজী, দাউদ, বাওয়ানি, দাদা, সায়গল প্রভৃতি পুঁজিপতি-ব্যবসায়ী পরিবার গড়ে ওঠে, যারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সকল পুঁজিপতি শ্রমিকদের নির্মমভাবে শোষণ করে মুনাফার পাহাড় গড়তে শুরু করে। যার কারণে

২৮. *ঐ*, পৃ, ১৭৫।
২৯. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৫৭।

মারাত্মক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়।[৩০] দ্বিতীয়ত: ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইয়ুব সরকার দেশের প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy) চালু করে। এই গণতন্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তি হলো ইউনিয়ন বোর্ড। প্রত্যেক বোর্ডে ১০জন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করার বিধান রাখা হয়। উভয় পাকিস্তানে এই রকম ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী' প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। পরবর্তীতে তারা পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য ও প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করবেন। প্রথমদিকে আইয়ুব খান রাজনৈতিক দল গঠনের বিপক্ষে থাকলেও পরবর্তীতে রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার সুবিধার্থে মুসলিম লীগের এক কনভেনশনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে নিজে এর সভাপতির পদে আসীন হন।[৩১] এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সর্বত্র এক গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়। তৃতীয়ত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য আইয়ুব সরকার বিচারপতি হামদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি 'শিক্ষা কমিশন' গঠন করে। কমিশনের রিপোর্টে ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দীর্ঘদিনের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও ইসলামী ভাবধারা চালুর নামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় আরবী ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। এসময় আইয়ুব সরকার গ্র্যাজুয়েট কোর্স তিন বৎসরের এবং শিক্ষার বেতন বৃদ্ধিসহ কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৬০ সালের ১ মে একটি মার্কিন গোয়েন্দা বিমান সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশে গুপ্তচরবৃত্তি চালানোর সময় সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ভূপতিত হয়। সোভিয়েত তদন্তের মাধ্যমে বের হয়ে আসে, বিমানটি পাকিস্তানের পেশোয়ার বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করেছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যকার বৈঠক ভেঙ্গে যায় এবং বিশ্ব নেতারা পাকিস্তানের এই কর্মের নিন্দা জ্ঞাপন করে। পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে।[৩২]

---

৩০. খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৭৮।
৩১. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৫৭।
৩২. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৫৫।

সামরিক শাসন জারির পর পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ ও সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, এমনকি উঠতি পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশসহ সাধারণ জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এমনকি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মহলের কোন কোন অংশে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবিও গুঞ্জরিত হতে দেখা যায়। ফলে সামরিক শাসনের প্রথম দিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে মোহ দেখা গিয়েছিল ক্রমেই তা ভেঙ্গে যেতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির বিবেচনা মতে, ১৯৬১ সালে গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিতে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার একটি বাস্তব অবস্থা বিরাজ করছিল। ১৯৬০-৬১ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যন্তরে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সকল সভ্যই 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবিকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনেও করেছিল।[৩৩]

'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' ভাবনার পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি এটিও উপলব্ধি করে যে, সার্বিক পরিস্থিতি আন্দোলনের অনুকূলে হলেও পার্টির একার পক্ষে এতবড় গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিসহ পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মধ্যে ঐক্য বা সমঝোতা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর এই উপলব্ধি থেকেই পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। জহুর হোসেন চৌধুরী দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞার সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন।[৩৪] ১৯৬১ সালের শেষের দিকে প্রথম

---

৩৩. ঐ, পৃ, ১৮১।

৩৪. প্রথম বৈঠকটি হয় কমরেড মণি সিংহ, খোকা রায় ও মানিক মিঞার মধ্যে। বৈঠকের আলোচনায় মানিক মিঞা ও মণি সিংহের কথপোকথন ছিল নিম্নরূপ। মানিক মিঞা বলেন, "আইয়ুব খান খুব শীঘ্রই একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে। নিশ্চয়ই এই সংবিধানটি হবে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংবিধান। এ অবস্থায় আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একযোগে আন্দোলন না করলে তার সঙ্গে এঁটে উঠা যাবে না। আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি যদি এক সাথে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে তবে তাকে পরাস্ত করা মোটেও কঠিন হবে

বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান ও তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞা এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মণি সিংহ ও খোকা রায় উপস্থিত ছিলেন।[৩৫] ১৯৬১ সালের শেষ থেকে শুরু করে ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে উভয় দলের মধ্যে অন্তত ৩-৪টি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান বক্তব্য ছিল, 'পাঞ্জাবের বিগ বিজনেস যে ভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছে ও দাবিয়ে রাখছে তাতে ওদের সাথে আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক মণ্ডলীর অনেকেই এই বক্তব্যের সাথে একমত ছিল, তবে উভয় দলের সিনিয়র নেতারা বিশেষত মণি সিংহ ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতামত ছিল, 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করার মত পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয় নি এবং এই মুহূর্তে আন্দোলন শুরু করলে তা সফলও হবে না। এর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে পরবর্তীতে তা শুরু করতে হবে। আর এই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নিম্নলিখিত ইস্যুগুলো নিয়ে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইস্যুগুলো হচ্ছে :

১. সামরিক শাসনের অবসান;
২. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা;
৩. সমস্ত রাজবন্দির মুক্তি;
৪. ২১ দফা কর্মসূচি মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন;
৫. ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার ও হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল;
৬. কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের জরুরি দাবি-দাওয়া পূরণ।

না। কাজেই আপনি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করুন। আমরা সকলে মিলে যাতে আন্দোলন করতে পারি সেই ব্যবস্থা করুন। উত্তরে মণি সিংহ বলেন, "ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে দিন দুয়েকের মধ্যে খবর দেব। অতঃপর বিষয়টি নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীতে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, 'শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করা হবে।

৩৫. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মঞ্জুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০০৫।

উল্লিখিত দাবিগুলো নিয়ে ১৯৬২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত উভয় দলের নেতা-কর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

ছাত্র আন্দোলন

ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ। আদর্শগত কারণে সংগঠন দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত লেগেই ছিল। এসময় আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমঝোতার ফলে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা উভয় দল তাদের ছাত্র সংগঠনকে জানিয়ে দেয়। পাশাপাশি উভয় দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশ ও হস্তক্ষেপের কারণে ছাত্র সংগঠন দু'টির মধ্যেকার দ্বন্দ্বেরও কিছুটা অবসান হয়। কেন্দ্রীয় নির্দেশে তারা ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি এবং হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ও অগ্রহণযোগ্য সুপারিশ বাতিলের দাবিতে ১৯৬২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।[৩৬]

কিন্তু ৩০ জানুয়ারি সরকারবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে হঠাৎ করেই আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন সোহরাওয়ার্দী করাচীতে গ্রেফতার হলে পরদিন ৩১ জানুয়ারি থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও তার মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের ঢাকা আগমনের দিন সোহরাওয়ার্দীর মুক্তি, হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বাতিলসহ ছাত্রদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু দাবিকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।[৩৭] ক্রমান্বয়ে এই ছাত্র আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে ওঠে এবং সমগ্র প্রদেশব্যাপী তা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা বিভিন্ন দোকান, অফিস আদালত ও দেওয়ালে ঝোলানো আইয়ুব খানের ছবি ছিঁড়ে ফেলে ও তাতে আগুন দেয়। বিভিন্ন স্থানে আইয়ুব খানের প্রতিকৃতি তৈরি করে গলায় জুতোর মালা দিয়ে মিছিল সহকারে প্রদর্শন ও আইয়ুব খানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। আইয়ুব সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ছাত্ররাই ছিল প্রথম সংগঠন যারা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল।

---

৩৬. নিতাই দাস, *মোহাম্মদ ফরহাদ: জীবন ও সংগ্রাম*, (ঢাকা : ১৯৯০), পৃ, ৮৩।
৩৭. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৬১।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল ছাত্রদের এই আন্দোলন তা ভেঙ্গে দেয় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বার উন্মোচিত করে। ছাত্রদের এই আন্দোলনকে দমনের জন্য আইয়ুব সরকার পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর মাধ্যমে রাজপথে ব্যাপক নির্যাতন চালায়। এছাড়া গণ-গ্রেফতার, হুলিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়। ফলে মে মাসের দিকে আন্দোলন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মোহাম্মদ ফরহাদসহ অধিকাংশ ছাত্রনেতা আত্মগোপন করে। এ আন্দোলন হয়েছিল মূলত ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে এবং পর্দার আড়াল থেকে এদের সহায়তা করেছিল আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি।[৩৮]

মে মাসে আইয়ুব খান দেশে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। কমিউনিস্ট পার্টিসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এই সংবিধান প্রত্যাখ্যান করলেও আইয়ুব খান নতুন সংবিধানের অধীনে এপ্রিল মাসে মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিষদ ও মে মাসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করেন। যদিও এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টিসহ কোন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে নি।[৩৯] নির্বাচনের পর ৮ জুন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে দেশ থেকে সামরিক শাসন তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া সকল রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনকে প্রকাশ্যে কাজ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। ফলে পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতেও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ রয়ে যায়।

জুন মাসে মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই তিনি গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে গঠন করেন এনএফএস (National Student Federation) নামক একটি ছাত্র সংগঠন। মূলত উচ্ছৃঙ্খল ও গুণ্ডা প্রকৃতির ছাত্ররাই এর সদস্যপদ গ্রহণ করে। তারা ছাত্র আন্দোলনে সমর্থন প্রদানের অপরাধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মাহমুদকে আক্রমণ করে মারাত্মকভাবে আহত করে। মোনায়েম খান পাকিস্তানি সংস্কৃতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে এবং 'রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদের কবি'– এ কথা বলে তাকে বর্জনের আহ্বান জানায়।

---

৩৮. নিতাই দাস, পূর্বোক্ত, পৃ, ৮৩।
৩৯. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৬৫।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ছাত্র সংগঠনগুলো মোনায়েম খান কর্তৃক গঠিত এনএফএস-এর অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও গুণ্ডামির প্রতিরোধ, অপসংস্কৃতির প্রচার বন্ধ ও সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি (হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ) বাতিলের দাবিতে পুনরায় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত কমিউনিস্ট পার্টির পরামর্শ ও নির্দেশনার কারণেই ছাত্র ইউনিয়ন এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেপ্টেম্বরের ছাত্র আন্দোলন ফেব্রুয়ারি-মার্চের আন্দোলনের চাইতে ব্যাপক ও জঙ্গি আকার ধারণ করে। যে সকল ছাত্র ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নি তারাও এবার অংশগ্রহণ করে। ছাত্ররা ১৭ সেপ্টেম্বর সমগ্র প্রদেশে ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং তা পালনের প্রস্তুতিও নেয়। শ্রমিকরাও ছাত্রদের এই আন্দোলনে যোগ দেয় এবং ধর্মঘটের সমর্থনে সভা, সভাবেশ ও মিছিল-মিটিং করতে শুরু করে।[৪০] ফলে সেপ্টেম্বরের এই আন্দোলন ছাত্র-শ্রমিকের যৌথ আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট চলাকালে সেনাবাহিনী মোতায়েন করার পরও ছাত্র-জনতার মিছিলে টঙ্গী, তেজগাঁও, ডেমরাসহ বিভিন্ন স্থানগুলোতে স্থানীয় শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষেরা অংশগ্রহণ করে এবং ধর্মঘট সাফল্য মণ্ডিত হয়। ঢাকায় ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশ পিছন থেকে গুলি চালালে তিন জন ও টঙ্গীতে একজন নিহত হয়। এছাড়া ঢাকার বাইরেও কয়েকজন নিহত হয়। মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে ছাত্র ও শ্রমিক হত্যা এবং প্রচুর পরিমাণে গ্রেফতারের ফলে আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে এবং প্রদেশের সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ সেপ্টেম্বর স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুব সরকার আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের অংশ বিশেষ বাতিল করে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয় এবং ঐ বছরের ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রদান ছাড়াই পাস করিয়ে দেয়। শিক্ষা কমিটির রিপোর্টের অংশ বিশেষ বাতিল করে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা আর অন্যদিকে ডিগ্রি পরিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেকে সরে যেতে শুরু করা ইত্যাদির কারণে আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লে মোহাম্মদ ফরহাদ, সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিকসহ সকল ছাত্রনেতা মিলে আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিতের ঘোষণা দেয়।[৪১]

৪০. কমরেড সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিকের সাক্ষাৎকার, ১২ডিসেম্বর, ২০০৪।
৪১. নিতাই দাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮৮।

বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন ছিল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর প্রথম কোন গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন মূল ভূমিকা পালন করেছিল, আর ছাত্রলীগসহ অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা ছিল অনেকটা সহযোগীর মত। এই আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভিতর হতে কমিউনিস্ট পার্টি বেশ কয়েকজন উদ্যোগী, সাহসী ও বিচক্ষণ নেতা পেয়েছিল, যারা আন্দোলনের পর খুব দ্রুত পার্টির সভ্যপদ লাভ করে এবং ষাটের দশক থেকে শুরু করে পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

ছয় দফা আন্দোলন

১৯৬৪ সালের জুন মাসে আইয়ুব খান দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে এবং সম্ভাব্য সময় হিসেবে পরবর্তী জানুয়ারি মাসের কথা বলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচনকে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে পাওয়া একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং প্রধান বিরোধী দলগুলোর সমন্বয়ে 'কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি' (কপ) গঠন করে।[৪২] কপের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নার বোন মিস ফাতেমা জিন্নাকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হয় এবং তিনি বেশ বড় ভোটের ব্যবধানে আইয়ুব খানের কাছে পরাজিত হন।[৪৩] ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে গঠিত এই মোর্চায় নিষিদ্ধ থাকার কারণে কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। তবে ন্যাপের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির যে সকল সদস্য ছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির যে সকল প্রকাশ্য সদস্য, যাদের পরিচয় পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনের নিকট ছিল না

---

৪২. ১৯৬২ সালের ২৬ জুন দৈনিক ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কপের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ), আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক ও ইউসুফ আলী চৌধুরী (কৃষক শ্রমিক পার্টি), পীর মোহসেন উদ্দীন দুদু মিঞা (নেজামে ইসলাম), নুরুল আমিন (মুসলিম লীগ) এবং মাহমুদ আলী (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)।

৪৩. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৮৮। কপে যে সকল রাজনৈতিক দল যোগ দিয়েছিল তারা হচ্ছে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি।

তারা এই নির্বাচনে কপের পক্ষে অংশ নেয় এবং নির্বাচনের ফলাফলকে কপের পক্ষে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।[88]

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৭ দিন যুদ্ধ চলার পর তাশখন্দ শহরে নিরাপত্তা পরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধ চলাকালে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে যে অসংখ্য প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রকামী নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয় তার ফলে ন্যাপ ও বিভিন্ন কল কারখানায় শ্রমিকদের সাথে কর্মরত বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট কর্মী আটক হন।[৪৫] যুদ্ধের সময় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ছিল একরকম অরক্ষিত। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল থেকে এই প্রদেশকে বহিঃআক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পৃথক সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলা অথবা সামরিক বাহিনীতে অধিক সংখ্যায় বাঙালি সৈন্য নিয়োগ করার দাবি ওঠে। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের দৌলতানা ও জামাত নেতা মওলানা মওদুদী সমগ্র পাকিস্তানভিত্তিক একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়ে তার ৬-দফা কর্মসূচি উত্থাপন করে সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন কামনা করেন।[৪৬]

৬-দফাকে কেন্দ্র করে সম্মেলনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে শেখ মুজিব সম্মেলন বয়কট করে ঢাকায় ফিরে আসে এবং ৬-দফাকে নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। ৬-দফাকে তিনি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলে অভিহিত করেন।[৪৭] সরকার ৬-দফাভিত্তিক এই রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে ব্যাপক গ্রেফতার শুরু করে এবং শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী গ্রেফতার হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পক্ষে ৬-দফা যেহেতু একটি উপযুক্ত কর্মসূচি ছিল তাই কমিউনিস্ট পার্টি এই ৬-দফাকে সাদরেই গ্রহণ করে এবং এর

---

৪৪. *কমরেড সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিকের সাক্ষাৎকার।*

৪৫. *কমরেড মঞ্জুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার।*

৪৬. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮০।

৪৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

পক্ষে সমর্থনও প্রদান করে।[৪৮] কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মতে, ৬-দফায় যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটগুলোর সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কোচ্ছেদ, ভূমি সংস্কার, কৃষকের হাতে জমি তুলে দেওয়া, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ এবং শ্রমিকদের জীবন ধারণের উপযুক্ত মজুরির গ্যারান্টিযুক্ত দফা বা দাবি বাস্তবায়নের কর্মসূচি নেই, তাই এই ৬-দফা বাস্তবায়িত হলে বাঙালি জাতির আংশিক অধিকার অর্জিত হবে, কখনোই পূর্ণ অধিকার অর্জিত হবে না। সুতরাং এই আংশিক অধিকারযুক্ত ৬-দফা কখনোই বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হতে পারে না।

৬-দফার ইস্যুতে আওয়ামী লীগের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষীণ মতবিরোধ দেখা দিলেও তা কাটিয়ে উঠতে তেমন একটা সময় লাগেনি।[৪৯] ৬-দফার আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য সরকার গণহারে গ্রেফতার ও ইত্তেফাকের প্রকাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর কমিউনিস্ট পার্টির সকল প্রকাশ্য ও আত্মগোপনরত নেতা-কর্মী বেশ সতর্কতার সাথে পথ চলতে শুরু করে। কিন্তু এরপরও তাদের বেশ কয়েকজন কর্মী গ্রেফতার হয়। ৬-দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকারি নির্যাতন ও গণ-গ্রেফতার শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সকল সদস্য আত্মগোপন করে।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভক্তি

১৯৫৭ সালের ১৪-১৬ নভেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কোতে ১২টি সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মাও সেতুংসহ বড় বড় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে এবং তারা সকলে মিলে একটি ঘোষণা দেয়, যা ইতিহাসে ১২ *পার্টি ঘোষণা* নামে পরিচিত। ১২ পার্টির এই দলিলে বলা হয় :

> ‘বর্তমান যুগ হচ্ছে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ। মহান অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই যুগের সূত্রপাত ঘটেছে এবং বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে। ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণি

---

৪৮. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮৪।
৪৯. *কমরেড মনজুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার।*

> তার অগ্রবাহিনীর নেতৃত্বে অন্যান্য পার্টির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, তাহলে গৃহযুদ্ধ ছাড়াই তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব।"[৫০]

এই ঘোষণার মূল বক্তব্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সংহতি জোরদার করা এবং বিশ্বের সকল দেশের জনগণকে সচেতণ থাকার আহ্বান জানানো।

১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে মস্কোতে পৃথিবীর ৮১টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির অপর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নেপাল নাগ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহ সর্বসম্মতভাবে ১৯৫৭ সালে গৃহীত ঘোষণা এবং শান্তি কর্মসূচির প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে। সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা হয়, "সমাজতন্ত্র আজ এক বিশ্ব-সমাজব্যবস্থায় পরিণত হতে চলেছে, তাই ইউরোপ ও এশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রোধ করার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের নেই। এসকল স্থানে সমাজতন্ত্রের জয় অবশ্যই হবে।"[৫১]

১৯৬০ সালের সম্মেলন শেষে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ৮১ পার্টির ঘোষণা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঐ ঘোষণার সমর্থনে ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে তা পার্টির মুখপত্র *শিখা* পত্রিকা মাধ্যমে সকল নেতা-কর্মীকে অবগত করে।[৫২]

৮১টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চৌ এন লাই। তিনি ৮১ পার্টির ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরও করেছিলেন। কিন্তু সম্মেলনের কিছুদিন পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা যুদ্ধ ও শান্তি, কোন কোন দেশে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ৮১ পার্টির ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা করা শুরু করে। এর বিকল্প হিসেবে তারা উগ্র বামপন্থার

---

৫০. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৬৬।
৫১. খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৮৮।
৫২. *১৯৬৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ২৭।

কথা বলে এবং অন্যদেরও অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের এসকল কাজকর্মের বিরোধিতা করে এবং ৮১ পার্টির ঘোষণাকে রক্ষা করা ও এর পক্ষে কমিউনিস্ট বিশ্বে জনমত তৈরির প্রচেষ্টা চালায়।[৫৩] এভাবে ১৯৬১ সাল থেকে যুদ্ধ ও শান্তিসহ কতকগুলো মতাদর্শগত প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে তীব্র মত-পার্থক্য দেখা দেয়, যা বিশ্বে মস্কো বনাম পিকিং বিরোধ নামে পরিচিত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যকার এই মতাদর্শগত বিরোধের প্রভাব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির উপর পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানেও এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬২ সালের শেষ দিকে মোহাম্মদ তোয়াহা, সুখেন্দু দস্তিদার এবং যশোরের আব্দুল হকের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক পার্টি সভ্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শী হয়ে ওঠে এবং তারা নিজেদের পিকিংপন্থী বলে ঘোষণা দেন।[৫৪]

মস্কো বনাম পিকিং বিরোধকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে বিভেদাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয়। ১৯৬২ সালের শেষ দিকে ভারত ও চীনের মধ্যকার সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি মৈত্রী গড়ে ওঠে। এই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ফলে আইয়ুব সরকারের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মিত্রতা ছিল তাতে চিড় ধরে। চীনের সাথে পাকিস্তানের মৈত্রী ও আইয়ুব সরকারের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধের যুক্তি দেখিয়ে পিকিংপন্থীরা ১৯৬৩ সাল থেকে আইয়ুব সরকারকে সমর্থন করার কৌশল গ্রহণ করেন।[৫৫] অন্যদিকে মস্কোপন্থীরা ছিল এর ঘোর বিরোধী।

---

৫৩. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৮৮।
৫৪. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, (ঢাকা : পড়ুয়া, ১৯৯৭), পৃ, ১৭৮।
৫৫. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৯০।

পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি (মস্কোপন্থী) অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি স্থাপন এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পক্ষে মতামত প্রদান করে। যুদ্ধ সম্পর্কে তারা তাদের নীতি ব্যাখ্যা করে একটি লিখিত প্রবন্ধ *শিখা* পত্রিকার মাধ্যমে পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করে। অপর দিকে পিকিংপন্থী হিসেবে পরিচিত তোয়াহা, সুখেন্দু দস্তিদার, আব্দুল হকসহ কেন্দ্রীয় কমিটির অপর একটি অংশ যুদ্ধ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে যুদ্ধের পক্ষে মতামত প্রদান করে। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যকার মতাদর্শগত বিরোধের ঢেউ ধীরে ধীরে বিভিন্ন গণ-সংগঠন ও গণআন্দোলনের ক্ষেত্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে বিভক্তি দেখা দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙ্গে দুই টুকরো হয়ে যায়। একটি সভাপতির নেতৃত্বে মেনন গ্রুপ এবং অপরটি সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে মতিয়া গ্রুপ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রাশেদ খান মেননের প্রবল মানসিক সম্পৃক্তি ছিল মাওবাদী চিন্তা চেতনার প্রতি।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির মধ্যকার চলমান এই সমস্যা সমাধানের জন্য সোভিয়েত ও চীনের মতাদর্শগত বিরোধ নিয়ে পার্টির মধ্যে যে দুটি মতের সৃস্টি হয়েছে সেই মত দুটি লিখিতভাবে পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও আলোচনা এবং পরে যথোপযুক্ত সময়ে সম্মেলন করে এই মতাদর্শগত বিরোধ সম্পর্কে পার্টির সভ্য ও কর্মীদের মতামতকে বিচার করে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পিকিংপন্থী সদস্যগণ তা মেনে নিয়ে একটি দলিল প্রস্তুত করে তা পার্টির সভ্য ও কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করে। অন্যদিকে মস্কোপন্থীরাও তাদের মত করে অপর একটি দলিল তৈরি করে তা পার্টির মধ্যে প্রচার করে।[৫৬] কিন্তু পরে পার্টির মধ্যে এ বিষয় নিয়ে আর কোন আলোচনা হয় নি।

১৯৬২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হওয়া এই মতাদর্শগত বিরোধের কারণে কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ শৃংঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। দলের ভিতর মস্কো লাইন বনাম পিকিং লাইন নিয়ে বিরামহীন বিতর্ক চলতে থাকে। বিতর্কের ফলে পার্টির অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমনকি নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট

---

৫৬. *১৯৬৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ২৮।

পার্টির সাংগঠনিক বিষয় ও আন্ডারগ্রাউন্ড নেতাদের চলাফেরা নিয়েও পার্টির এক শ্রেণির সভ্য ও কর্মীর ভেতর প্রকাশ্যেই এমন সব আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয় যা বে-আইনি পার্টির নিরাপত্তার জন্যেও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

এরূপ বিশৃংঙ্খল ও অস্থির পরিস্থিতিতে পার্টির কর্তব্য নির্ধারণ করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পদকমণ্ডলী ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা আহ্বান করে। সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৩২ জন নেতা-কর্মী উপস্থিত হয়। সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল পার্টির মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে করণীয়। প্রাথমিক আলোচনার পর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্বীকৃত শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী পার্টির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে লেনিনবাদী গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি পালন করা পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেকটি সভ্য ও কর্মীর অবশ্য কর্তব্য।[৫৭] প্রস্তাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে বুঝিয়ে বলা হয় যে, পার্টির নিয়ম শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে তারপর পার্টির মধ্যকার মতাদর্শগত বিরোধ নিয়ে আলোচনা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হবে। কিন্তু মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদারসহ প্রদেশের জেলাভিত্তিক আরো কয়েকজন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং ১৯৬৬ সালের ২০ ডিসেম্বর তা বেশ বড় ব্যবধানেই পাস হয়। এরপর পিকিংপন্থীরা গণতান্ত্রিকভাবে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত অমান্য করে 'আমরা আর সংস্কারপন্থীদের সাথ থাকবো না'– শীর্ষক স্লোগান তুলে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করে আলাদা দল গঠন করে।[৫৮] আলাদা পার্টি গঠনের প্রাকালে মণি সিংহ সুখেন্দু দস্তিদারকে বলেছিলেন, "আপনারা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ভঙ্গ করে আজ পার্টি ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনারা একদিন এর ফল ভোগ করবেন, দেখবেন আপনারা যে পার্টি গড়তে যাচ্ছেন তা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।"[৫৯] পার্টির এই ভাঙ্গনের পর মোহাম্মদ ফরহাদ, অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম ও বগুড়ার সুবোধ লাহিড়ীকে কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক হিসেবে নির্বাচিত ও কো-

৫৭. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮৭।
৫৮. খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২০১।
৫৯. *কমরেড মনজুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার।*

অপ্ট করা হয় এবং মোহাম্মদ ফরহাদকে পরবর্তীতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৬০]

কমিউনিস্ট পার্টির এই ভাঙ্গনের হাওয়া সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে জেলা, থানাসহ প্রদেশের কমিউনিস্ট শিবিরের সকল স্তরে পার্টি মূলত চীনাপন্থী ও মস্কোপন্থী এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালের পার্টির এক রিপোর্টে দেখা যায়, ভাঙ্গনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির শতকরা প্রায় ২৫ জন চীনা মতবাদ গ্রহণ করে পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং এদের অধিকাংশই ছিল খুবই কর্মঠ।[৬১]

কমরেড তোয়াহা এবং অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত থাকলেও পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে তাঁরা ন্যাপের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় ছিল। মূলত ন্যাপ একটি প্রগতিশীল ও কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন রাজনৈতিক দল। যার অধিকাংশ নেতা-কর্মী মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী। পিকিংপন্থী ও মস্কোপন্থী চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট শিবিরের এই বিভক্তিকালে ন্যাপ এর বাইরে ছিল না। ১৯৬৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ ভেঙ্গে যায় এবং এর এক গ্রুপের সভাপতি হন অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ, আর অপরটির সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী নিজেই থেকে যান।[৬২] অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ মস্কোপন্থী এবং মওলানা ভাসানী পিকিংপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙ্গে যাওয়ার পর মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী হলেও দল দুটি পরস্পর বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করতে শুরু করে। মস্কোপন্থীদেরকে আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন করতে দেখা যায়, অন্যদিকে চীনাপন্থীরা 'Don't disturb Ayub'-নীতি অনুসরণের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী যে কোন আন্দোলনের বিরোধিতা

৬০. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ২০১।
৬১. আমজাদ হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৭৯।
৬২. মণি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৮৭।

করে।[৬৩] এমনকি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ৬-দফাকে তারা সি.আই.এ-র দলিল বলে আখ্যা দেয় এবং এর বিরোধিতা করে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অসন্তোষ শুরু হলে যে সকল নেতা-কর্মী চীনাপন্থীদের মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজেছিল তারা হতাশ হয়ে পড়ে এবং বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে চীনাপন্থীরা কাজ শুরু করলেও আইয়ুব সরকারকে সমর্থনের কারণে তারা দলের ভেতর ও বাইরে দ্রুত সমর্থন হারাতে থাকে।

এভাবে দেখা যায়, ১৯৬০-এর দশকে মস্কো বনাম পিকিং মতবাদ ও বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রথমে ছাত্র ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট পার্টি এবং শেষে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ ভেঙে যায়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট শিবির মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী - এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মতাদর্শগত বিরোধ ও বিভক্তির কারণে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি সামর্থ্য অনেক কমে যায় এবং কমিউনিস্ট শিবিরে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব আর অবিশ্বাস। ১৯৬৩ সালে শুরু হওয়া মতাদর্শগত এই বিরোধের কারণে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের মধ্যে হতাশার জন্ম নেয় এবং কোনটি সঠিক আর কোনটি বে-ঠিক তা নির্ধারণেই নেতা-কর্মীরা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এসময় পার্টির পক্ষে বড় ধরনের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি, যা পার্টিকে এক রকম স্থবির করে ফেলেছিল। মূলকথা হচ্ছে একদিকে সরকারি নির্যাতন আর অন্যদিকে নিজেদের মধ্যকার মতাদর্শগত পার্থক্য ১৯৬০-এর দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট অগ্রযাত্রাকে অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত করে।

১৯৬৮ সালের সম্মেলন

পিকিংপন্থী বনাম মস্কোপন্থী বিরোধকে কেন্দ্র পার্টির বিভক্তির পর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অবস্থা পর্যালোচনা করে পার্টিকে পুনরায় গুছিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে এক গোপন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি হয়েছিল ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকার আগারগাঁও এলাকার কোন এক বাড়িতে এবং তা পাঁচদিন স্থায়ী ছিল।[৬৪] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এটি ছিল পার্টির চতুর্থ সম্মেলন এবং পার্টি

---

৬৩. কমরেড মনজুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার।
৬৪. কমরেড মনজুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার।

নিষিদ্ধ হওয়ার পর দ্বিতীয়। এর আগের সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৮, ১৯৫১ এবং ১৯৫৬ সালে।

আইয়ুব সরকারের নির্যাতন এবং পার্টির মধ্যকার মতাদর্শগত বিরোধের কারণে ১৯৫৬ সালের সম্মেলনের পর দীর্ঘ ১২ বছরে পার্টির কোন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নি। তবে এর মধ্যে ১৯৬০ ও ১৯৬৬ সালে জেলা কমিটির সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি দুটি বর্ধিত প্লেনামের আয়োজন করেছিল।[৬৫] ১৯৬৮ সালের এই সম্মেলনটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে অনেক উত্থান-পতনের ও ভাঙ্গনের কাহিনী রচিত হয়েছে। এ সময় পার্টিকে একদিকে সরকারের নির্যাতন আর অন্যদিকে নিজেদের মধ্যকার মতাদর্শগত বিরোধ মোকাবিলা করতে হয়। মতাদর্শগত বিরোধের কারণে পার্টি ভেঙ্গে দুই টুকরো হয়ে যায়, অন্যদিকে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সরকার পার্টির সভ্য, নেতা-কর্মীসহ সকলকে গণহারে গ্রেফতার করতে থাকে। এমনকি পার্টি ভেঙ্গে যাওয়ার পর-পরই ১৯৬৭ সালে পার্টির সাধারণ সম্পাদক মণি সিংহ পর্যন্ত গ্রেফতার হন। এই গ্রেফতারের পিছনে পিকিংপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতা কাজ করেছিল। মূলত তারাই আত্মগোপনে থাকা এই কমিউনিস্ট নেতার তথ্য পুলিশকে দিয়েছিল বলে মনে করা হয়।

সম্মেলন শুরুর কয়েক মাস পূর্ব থেকে সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তুতি হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক রচিত দলিল নিয়ে বিভিন্ন জেলায় পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালানো হয়।[৬৬] এরপর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী প্রস্তুতি সভা। তারপর এই সম্মেলন। সুতরাং বলা যায় সম্মেলনের জন্য নেতৃবৃন্দ প্রস্তুতির কোন ঘাটতি রাখেন নি। সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধিবর্গ, বিভিন্ন ফ্রন্টের নেতৃবর্গ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সব মিলিয়ে ৪২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন।[৬৭] এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দু'জন প্রতিনিধি ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে যোগদান করে। সম্মেলনে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, যা নিম্নরূপ:

---

৬৫. *১৯৬৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ৩০।
৬৬. খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২০৪।
৬৭. ঐ, পৃ, ২০৪।

পার্টির ১৯৪৮ সালের সংবিধান সংশোধন: ১৯৪৮ সালের কলকাতা সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কমিটিকে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অধীন একটি প্রাদেশিক কমিটি ও পার্টিকে প্রাদেশিক শাখা হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত পার্টির দুই অংশের নেতৃবর্গের মধ্যে কোন যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তান সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত প্রাদেশিক কমিটিকে এককভাবে নিতে হয়। ১৯৫৬ সালে পার্টির নেতৃবর্গ তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হতে পেরেছিল যে, এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত দুটি পৃথক অঞ্চল নিয়ে কৃত্রিমভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার কারণে সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিতে একটি সুসংবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই অভিজ্ঞতার আলোকে পার্টি ১৯৫৬ সালের সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান পার্টিকে একটি প্রাদেশিক পার্টি হিসেবে গণ্য না করে পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক একটি স্বতন্ত্র পার্টি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।[৬৮] ১৯৬৮ সালের এই সম্মেলনের প্রথমদিন ১৯৪৮ সালের পার্টি সংবিধানের কয়েকটি ধারাকে সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি স্বশাসিত ও স্বতন্ত্র পার্টির মর্যাদা দেওয়া হয় এবং পার্টির এই সম্মেলনকে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস হিসাবে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৬৯]

পার্টির লক্ষ্য ও কর্মসূচি: ১৯৬৮ সালের এই সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কতকগুলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মূলত বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রামাণ্য দলিল ৮১ পার্টির ঘোষণা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পার্টি এই কর্মসূচি গ্রহণ করে। পার্টির লক্ষ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয়, জনগণের মুক্তির জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া উপনিবেশিক শোষণ এবং দেশের বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্তবাদী গোষ্ঠীর শোষণ ও শাসন খতম করা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী ও বৃহৎ পুঁজিপতি বিরোধী স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপুঁজিবাদী বিকাশের পথে অগ্রসর হওয়া।[৭০] এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি

---

৬৮. *১৯৬৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ৩১।
৬৯. খোকা রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২০৪।
৭০. *১৯৬৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ৩২।

ও সামন্তবাদী ভূস্বামী এবং তাদের স্বার্থরক্ষক কেন্দ্রীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে একটি ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন করা।[৭১] মোর্চার ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ এবং মোর্চার নেতৃত্বে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যগুলো সম্পাদন করা।[৭২] পাশাপাশি জনগণের জরুরি দাবি-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে আইয়ুব সরকারের শাসনের স্থলে কেন্দ্র ও প্রদেশে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার কায়েম ও ৬-দফা মোতাবেক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা।[৭৩] বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে বলা হয়, সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটগুলোর সাথে সম্পর্ক ছেদ করে স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতি অনুসরণ, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশ ও প্রগতিকামী স্বাধীন দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন, সকল দেশের সাথে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন দান।[৭৪]

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতি থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের অবসান, ভূমি সংস্কার ও কৃষককে জমি প্রদান, প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ জাতীয়করণ, শ্রমিক ও কর্মচারীদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরির ব্যবস্থা করা, বাক স্বাধীনতা, সকল প্রকার হয়রানিমূলক অধ্যাদেশ বাতিল এবং সকলের শিক্ষার সুযোগ প্রদান ও মণি সিংহসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তিদানের দাবির কথা পার্টির আশু রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়।[৭৫]

সম্মেলনে ভিয়েতনামবাসীর স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন, বেলুচিস্তানসহ সমগ্র পাকিস্তান ও বিভিন্ন দেশের সৌহার্দমূলক পার্টিসমূহের সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং বিশ্বের সকল কমিউনিস্ট সংগঠন ও দেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৭৬]

---

৭১. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ২০৫।
৭২. নুরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ, ৪৮।
৭৩. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ২০৫।
৭৪. *১৯৬৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ৩২।
৭৫. খোকা রায়, পূর্বোক্ত, পৃ, ২০৪।
৭৬. *১৯৬৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ৩৩।

কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয় যার সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড আব্দুস সালাম (বারীণ দত্ত)। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন, অনিল মুখার্জী, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ, চৌধুরী হারুনুর রশীদ, মোজাফ্ফর আহমদ, আমজাদ হোসেন, নুরুল ইসলাম, জ্ঞান চক্রবর্তী ও বরুণ রায়। সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যরা ছিলেন, আব্দুস সালাম, অনিল মুখার্জী, খোকা রায় ও মোহাম্মদ ফরহাদ।[৭৭]

১৯৬৮ সালের এই কংগ্রেস ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ১৯৬৬ সালে পার্টির বিভক্তির পর এই সম্মেলন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সম্মেলনের সময় মণি সিংহ জেলে অন্তরীণ থাকলেও কমিটি গঠন থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে তার মতামত ও চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয়েছিল।[৭৮] ১৯৬৬ সালে যে সকল অভিযোগ এনে কেন্দ্রীয় কমিটির দু'জন সদস্য ও আরো কিছু পার্টি সভ্য কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে গিয়েছিল ১৯৬৮ সালের এই কংগ্রেসের মাধ্যমে পার্টি তা সঠিক বিবেচনা করে নাই এবং পার্টি তার চলতি কর্মধারায় কোন পরিবর্তন করে নি। তারা পূর্বের ন্যায় ন্যূনতম দাবির ভিত্তিতে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানব্যাপী বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের মধ্যে বিশেষত আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যাপের মধ্যে থেকে পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার নীতিতে অটল ছিল। সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯৬৬ সালের বিভক্তির পর পার্টির একটি নতুন কমিটি গঠন, বিভক্তির ফলে ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারণ এবং সাংগঠনিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সম্মেলন থেকে মণি সিংহ, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করা হয় এবং তাঁদের মুক্তির জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন ফ্রন্ট ও অন্যান্য দলগুলোকে সাথে নিয়ে আন্দোলনের কথা বলা হয়।[৭৯]

---

৭৭. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৮৮।
৭৮. *কমরেড মনজুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার।*
৭৯. আমজাদ হোসেনের সাক্ষাৎকার, ২৬ জুলাই, ২০০৫ (তিনি ১৯৬৮ সালের কংগ্রেসে যে কমিটি নির্বাচিত হয় তার সদস্য ছিলেন, বর্তমানে ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে জড়িত)।

পঞ্চম অধ্যায়

ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান মণি সিংহসহ পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি প্রদানের মাধ্যমে তার ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়; কিন্তু মণি সিংহসহ কারামুক্ত নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ছাত্রদের আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার পরিবর্তে তা আরো গতিলাভ করে এবং আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে। ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই মণি সিংহকে গ্রেফতারের মাধ্যমে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের পূর্ববর্তী শাসকদের কমিউনিস্টবিরোধী নীতিতে অটল থাকেন। মণি সিংহ গ্রেফতার হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে পুনরায় স্থবিরতার সৃষ্টি হয় এবং পার্টির নেতাকর্মীরা আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পার্টির আত্মগোপনরত নেতৃবৃন্দ মণি সিংহের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে মণি সিংহ জেল থেকে পরোক্ষভাবে দিক নির্দেশনা প্রদান করলেও ১৯৭১ 'সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরেই তিনি জেলে অবস্থানরত বন্দিদের নিয়ে জেল ভেঙ্গে বের হন এবং প্রিয় মাতৃভূমিকে হানাদারমুক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান

ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া দমন-নিপীড়নের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে দায়ের করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। মামলার মোট আসামির সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। মামলার অভিযোগে বলা হয়,

> এক নম্বর আসামি ভারতের সাহায্যে সশস্ত্র পন্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে

> চলেন। এমনকি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তারা গোপনে বৈঠকেও মিলিত হয়েছেন।[১]

পূর্ব বাংলার জনগণ খুব সহজেই বুঝতে পারে এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা। কেননা ছয় দফা আন্দোলন শুরু হওয়ার পরপরই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়, অথচ মামলায় তাকেই করা হয় প্রধান আসামি।

সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে সাধারণ জনগণের অধিকাংশই সরকারের উপর অসন্তুষ্ট ছিল তার উপর এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের ও এর প্রহসনমূলক বিচার দেশের জনগণকে আরো বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং ক্রমান্বয়ে তা গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৫৪ সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে নি। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমগুলো ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতো। ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা গ্রেপ্তার হলে আওয়ামী লীগও একই কৌশল গ্রহণ করে।[২] আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির প্রথম কংগ্রেসের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন করা এবং সেই মোর্চার ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে প্রতিক্রিয়াশীল এই শাসকগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে মোর্চার নেতৃত্বে দেশে একটি স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।[৩] আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলে ১৯৬৬ সালের পর আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে।[৪] ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণি সিংহ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই কমিউনিস্ট

---

১. হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, ১৭৫৭-২০০০*, (ঢাকা: ২০০১), পৃ,২৬৬।

২. *ঐ*, পৃ, ২৭১।

৩. *১৯৬৮ সালের পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*।

৪. *দৈনিক আজাদ*, ৭ নভেম্বর ১৯৬৮।

পার্টি এবং তাদের প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন মণি সংহিসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করে আসছিল। ১৯৬৮ সালের পার্টি কংগ্রেসের পর থেকে তারা এই দাবির পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন গড়ে তুলতে শুরু করে। এসময় পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীন ও পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী মহল থেকে মণি সিংহের মুক্তি দাবি করে।[৫]

গ্রেফতার অবস্থায় মণি সিংহ কমিউনিস্ট পার্টির যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেল খানা থেকেই দিক নির্দেশনা প্রদান করতেন। ১৯৬৮ সালের কংগ্রেসে রাজনৈতিক প্রস্তাবসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তার মতামত প্রতিফলিত হয়েছিল এবং কেবলমাত্র তার ইচ্ছাক্রমেই তাকে কংগ্রেসে পার্টির সভাপতি বা সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান থেকে বিরত থাকা হয়। কিন্তু এই কংগ্রেসের খবর সরকারের কাছে পৌঁছালে জেলে তার সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। ফলে কয়েক মাস তিনি পার্টিকে কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারেন নি।

১৯৬৮ সালে আইয়ুব সরকার 'উন্নয়ন দশক' পালনকালে খুব দ্রুত পরবর্তী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন বলে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। রাজনৈতিক এই প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট পার্টি পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে তা পার্টির অভ্যন্তরে এবং অন্য প্রগতিশীল দলগুলোর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর কারাগারে আটক মণি সিংহ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে ঐক্য গড়ে তোলার পরামর্শ দেয়। পরবর্তীতে পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সভা ডেকে মণি সিংহের মতামতের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ (মোজাফ্ফর) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি মোর্চা গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হয় এবং ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে একটি ঐক্য গড়ে ওঠে।[৬]

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে ব্যাপক মোর্চা গড়ে তোলা এবং অন্যদিকে ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে ছাত্র সমাজের

---

৫. মাসিক *শিখা*, জানুয়ারি, ১৯৬৯।
৬. ন্যাপের সাবেক সভাপতি *অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের সাক্ষাৎকার*, তারিখ: ২৫ ডিসেম্বর ২০০৪।

মধ্যে আন্দোলন সংগঠিত করার কৌশল গ্রহণ করে। ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্ররা তাদের কতকগুলো ন্যায্য দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে আইয়ুব সরকার তা দমনের জন্য গ্রেফতার ও নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। ছাত্র ইউনিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের এই আন্দোলনের সমর্থন এবং তাদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রদান করে এবং তা সমগ্র ছাত্র সমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হয়। এ সময় ছাত্র ইউনিয়ন একদিকে ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি এবং মণি সিংহ ও শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করে আর অন্যদিকে ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সাথে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়।

কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠার পর সংগঠন তিনটি তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চালায়। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন ও মতিয়া উভয় গ্রুপ), জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের দোলন গ্রুপ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুব বিরোধী মঞ্চ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। ডাকসুর সহ-সভাপতি ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ এর সভাপতি নির্বাচিত হয়।[৭]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মূল চালিকা শক্তি ছিল ছাত্র ইউনিয়ন। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ফরহাদকে ছাত্রফ্রন্টের কাজ দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি মাত্র কিছুদিন পূর্বেই ছাত্র ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যোগ দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির পরামর্শক্রমে ফরহাদ ছাত্র ইউনিয়নকে প্রয়োজনীয় দিন নির্দেশনা প্রদান করতেন। ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক অনিল মুখার্জি একটি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর অপর দু'জন সদস্য বারীণ দত্ত ও খোকা রায় ছিলেন ভারতে। ফলে মণি সিংহের পরামর্শক্রমে তিনি আন্দোলন সম্পর্কে একের পর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৮] ছাত্র আন্দোলনের পরবর্তী করণীয় জানতে

---

৭. হারুন-অর-রশীদ,পূর্বোক্ত, পৃ, ২৭১।
৮. আওয়ামী লীগ নেতা *তোফায়েল আহমেদের সাক্ষাৎকার*, তারিখ: ২৫ নভেম্বর ২০০৪।

ফরহাদ গোপনে জেলখানায় কারাবন্দি নেতা মণি সিংহ এবং মণি সিংহের পরামর্শক্রমে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন। উভয় নেতার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এবং কমিউনিস্ট পার্টির অন্য নেতাদের পরামর্শক্রমে তিনি ছাত্র আন্দোলন ও ১১ দফার মূল পয়েন্টগুলো লিখে দেন এবং এসব নিয়ে তৎকালীন ইকবাল হলের ছাত্র সংসদ অফিসে কর্মসূচি প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে। জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা দাবি পেশ করে।[৯]

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ তাদের ছয় দফা দাবি সরকারের কাছে পেশ করে তার বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ছয় দফার সাথে আরো কতকগুলো দাবি সংযুক্ত করার পরামর্শ দিলেও আওয়ামী লীগ তখন কমিউনিস্ট পার্টির সেই পরামর্শ গ্রহণ করেনি।[১০] পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পেশকৃত ১১-দফায় ছয় দফার সাথে কমিউনিস্ট পার্টির দাবিগুলোর অধিকাংশকেই মেনে নেওয়া হয়।[১১] কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকলেও তারা বিভিন্ন জোট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এরই ধারাবাহিকতায়

---

৯. নিতাই দাস, *মোহাম্মদ ফরহাদ: জীবন ও সংগ্রাম*, (ঢাকা: নওরোজ, ১৯৮৬), পৃ. ১৪০।

১০. *১৯৬৮ সালের পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*।

১১. *মাসিক শিখা*, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি সংখ্যা। শিখায় প্রকাশিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা ছিল ১. হামদুর রহমানর শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান, ছাত্র বেতন হ্রাস ও ছাত্রদের অন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন, বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস-আদালতের ভাষা হিসাবে চালু; ২. সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার; ৩. ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন প্রদান; ৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে দেশের পশ্চিম অংশে একটি সাব-ফেডারেশন গঠন; ৫. ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ; ৬. কৃষকদের উপর থেকে খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা হ্রাস, বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ এবং সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল করা; ৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস প্রদান; ৮. পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা; ৯. জরুরি অবস্থা, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য বিবর্তনমূলক আইন বাতিল; ১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোট বহির্ভূত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ; ১১. সকল রাজবন্দির মুক্তি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলা বাতিল।

১৯৬৯ সালে জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখে ঢাকায় আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, নিজামে ইসলাম, জমিউত-উল-উলামা-ই-ইসলাম, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, জামায়াতে ইসলামী ও পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এই আটটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গড়ে উঠে ডাক।[১২] ডাকে বামপন্থী ও চরম ডানপন্থীদের মিশ্রণ ঘটে। এতে একদিকে যেমন আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ ছিল ঠিক অন্যদিকে ছিল জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দলসমূহ। ডাক গঠনের পর-পরই তারা ৮ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে, তাদের ৮ দফায় পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে অন্তর্ভুক্ত না করায় তা জনগণের দ্বারা সমালোচিত হয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন ডাকের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচার চালাতে শুরু করে।[১৩] ১৭ জানুয়ারি ডাক প্রদেশব্যাপী দাবি দিবসের ডাক দিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাতে সমর্থন দিয়ে আলাদাভাবে ১১ দফাকে তুলে ধরে। এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য ছিল, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার মধ্যেই ডাকে-এর ৮ দফা লুকায়িত আছে।

২০ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘটের ডাক দেয়, ঐদিন তারা ছাত্র জমায়েত শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে মিছিল বের করে, মিছিলে ছাত্র-জনতার উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। মিছিলের শেষাংশে পুলিশের গুলিবর্ষণে ছাত্রনেতা আসাদ নিহত হয়।[১৪] আসাদের মৃত্যুর ঘটনা ঢাকাসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২১ জানুয়ারি ঢাকায় এবং ২৪ জানুয়ারি সমগ্র পূর্ব

১২. ১৯৭৩ *সালের পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*।

১৩. নিতাই দাস, *মোহাম্মদ ফরহাদ: জীবন ও সংগ্রাম*, (ঢাকা: নওরোজ, ১৯৯০),পৃ, ১৩৬। ডাক এর ৮ দফার দাবিসমূহ হচ্ছে, ১. ফেডারেল প্রকৃতির পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা কায়েম; ২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন; ৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার; ৪. পূর্ণ নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সমস্ত কালাকানুন বিশেষ করে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল; ৫. ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দি, রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সব গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার; ৬. ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার আওতায় জারিকৃত সকল নির্দেশ প্রত্যাহার; ৭. শ্রমিক ধর্মঘটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা; ৮. নতুন ডিক্লারেশন দানের উপর আরোপিত বিধিনিষেধসহ সংবাদপত্রের উপর জারিকৃত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইত্তেফাক, চাতন, প্রগেসিভ পেপারস লিমিটেডসহ সকল বাজেয়াপ্তকৃত কিংবা ডিক্লারেশন বাতিলকৃত প্রেস পত্রিকা এবং সাময়িকী তাদের আদি মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তন।

১৪. নিতাই দাস, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৪০।

পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করে। এসময় অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে এবং ছাত্র সমাজসহ তাদের ১১ দফা জনতার নিকট ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা পায়। ২১ জানুয়ারির হরতালে শ্রমিকসহ সকল শ্রেণির মানুষ ছাত্রদের আন্দোলনের সাথে একাত্ততা ঘোষণা করে রাজপথে নেমে আসে। ২১ জানুয়ারির পরিস্থিতিতে মোহাম্মদ ফরহাদের পরামর্শক্রমে ছাত্র নেতা সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ছদ্ম পরিচয়ে জেলখানায় মণি সিংহের সাথে দেখা করে আন্দোলন সম্পর্কে তাকে অবগত করে করণীয় জানতে চায়। মণি সিংহ আন্দোলনকে সামনের দিকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণার পরামর্শ প্রদান করে। মণি সিংহের পরামর্শ অনুযায়ী ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে মোহাম্মদ ফরহাদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নিকট আন্দোলনের পরবর্তী কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেন: প্রথমত, ২২ জানুয়ারি শান্তিপূর্ণ শোক মিছিল; দ্বিতীয়ত, ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মশাল মিছিল; তৃতীয়ত, ২৪ জানুয়ারি সমগ্র প্রদেশে হরতাল ও পল্টনে জনসভায় করে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা।[১৫]

২৩ তারিখের মশাল মিছিলে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ২৪ তারিখের হরতালে তাদের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পায়। মূলত জানুয়ারির ২৩ ও ২৪ তারিখের কর্মসূচিগুলোতে ছাত্রদের সাথে শিক্ষক, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করেছিল। ২৪ তারিখের হরতালের গতি দেখে আইয়ুব সরকার ভীত হয়ে পড়ে এবং আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ দিয়ে মিছিলে গুলি চালিয়ে অনেককে হত্যা করে। ঢাকার রাজপথের কয়েকটি স্থানে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ ও ই.পি.আরের সংঘর্ষ হয় এবং সংঘর্ষে টিকতে না পেরে নিরাপত্তা বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ২৩ জানুয়ারি সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিক পুনরায় মণি সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করে পল্টনের জনসভা সম্পর্কে কতকগুলো নির্দেশনা নিয়ে আসেন এবং তার উপর নির্ভর করে ২৩ জানুয়ারি রাতে পার্টি ২৪ তারিখের জনসভার মাধ্যমে নতুন কর্মসূচির খসড়া তৈরি করে। কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল, অবিলম্বে আইয়ুবের পদত্যাগ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন; প্রত্যক্ষ ভোটে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান; ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং দেশের সর্বত্র ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন প্রভৃতি। কিন্তু জনতার জঙ্গি উপস্থিতি দেখে ছাত্র নেতারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পল্টনের জনসভার পরিবর্তে নিহতদের উদ্দেশ্যে দোয়া-দরুদ পড়তে পড়তে জনগণকে ইকবাল হলের মাঠে নিয়ে যায়। পরে ইকবাল হলের মাঠে ছাত্র-জনতার

---

১৫. নিতাই দাস,পূর্বোক্ত, পৃ, ১৪১।

বিশাল সমাবেশ থেকে পরদিন ২৫ জানুয়ারি হরতাল ও রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১৬] কমিউনিস্ট পার্টি ২৪ জানুয়ারির এই ঘটনাকে জনতার অভ্যুত্থান হিসেবে বিবেচনা করে পরের দিনের স্থিরকৃত অনুষ্ঠানগুলোকে আরো বলিষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য ছাত্রদের পরামর্শ দেয়। কিন্তু ২৪ জানুয়ারি রাত ৮ টা থেকে কারফিউ জারি করা হলে ২৫ তারিখে আর কোন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়নি। কারফিউ জারির পর সরকার শত শত নেতা-কর্মীকে গ্রেফতারের মাধ্যমে আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে কোন লাভ হয়নি, ছাত্র-জনতা সরকারের কারফিউ ভঙ্গ করতে শুরু করে এবং সমগ্র পূর্ব বাংলা আন্দোলনের জোয়ারে উত্তাল হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ সাধারণ কাজে পরিণত হয়। ফলে একপর্যায়ে আইয়ুব খান একরকম বাধ্য হয়েই সান্ধ্য আইন জারি বন্ধ করেন।

১৯৬৯ সালের এই গণ-অভ্যুত্থানের ঢেউ ঢাকা শহরের বাইরে বিভিন্ন মফস্বল শহরে গিয়েও লাগে। এসময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে প্রায় ৭৫ শতাংশ মৌলিক গণতন্ত্রী পদত্যাগ করে এবং অনেক মৌলিক গণতন্ত্রী বিদ্রোহী জনতার হাতে নিহতও হয়। ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান কারফিউ প্রত্যাহার করে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করে। ডাক বৈঠকে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলে আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিতে রাজি হয়। কিন্তু শেখ মুজিব এতে রাজি ছিলেন না। তিনি আগে সরাসরি মুক্তিলাভ এবং একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে বৈঠকে যোগদানের সিদ্ধান্তের কথা সরকারকে জানান।

সান্ধ্য আইন জারি বন্ধ হলেও আন্দোলন এবং সরকারি নির্যাতন আগের মতই চলতে থাকে। ১৫ ফেব্রুয়ারি জেলখানার ভিতর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. শামছুজ্জোহা নিহত হওয়ার ঘটনা আন্দোলনকে আরো তীব্র করে তোলে। আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং মণি সিংহ, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তিদান করে।[১৭]

---

১৬. *তোফায়েল আহমেদের সাক্ষাৎকার*।
১৭. হারুন-অর-রশীদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৭১।

১৯৬৯ সালের এই গণ-অভ্যুত্থানের ফলাফল বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ভোগ করলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, এই আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত থেকে শুরু করে সকল কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের প্রভাবাধীন ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার কথা দূরে থাক, খোদ শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের কারারুদ্ধ নেতা-কর্মীদের মুক্তির জন্য তেমন কোন কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি আওয়ামী লীগ কিংবা তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। ১৯৬৮ সালের কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বিভিন্ন প্রগতিশীল দলের সমন্বয়ে জোট গঠন করে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার কথা বলা হয়। ১৯৬৮ সালের শেষ থেকে শুরু হওয়া ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন এবং এই আন্দোলনে সরকারের নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলনের সময় আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ রাস্তায় নেমে আসে এবং একপর্যায়ে আইয়ুব খান আন্দোলনকারীদের নিকট নতি স্বীকার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয় ও সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেয়। এই গণ-আন্দোলনে প্রায় ১০০ জন নিহত হয়েছিল, তার মধ্যে ৩৪ জন শিল্প কারখানার শ্রমিক, ২০ জন ছাত্র, ৭ জন সরকারি কর্মচারী, ৫ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ১ জন স্কুল শিক্ষক অন্যতম।[১৮]

গণ-অভ্যুত্থানোত্তর কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম

গণ-অভ্যুত্থানের পর মণি সিংহসহ কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সকল নেতা-কর্মী মুক্তি লাভ করে এবং নিষিদ্ধ থাকার পরও কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে বিভিন্ন সভা-সমাবেশের সুযোগ পায়। গণ-আন্দোলনে ভীত হয়ে আইয়ুব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দিলেও ছাত্রদের এই আন্দোলন থেমে যায়নি বরং তার গতি আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে রাওয়ালপিণ্ডিতে এক গোল টেবিল বৈঠক বসে। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ

১৮. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৩), পৃ.২০৫।

বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ যোগ দেয়। বিরোধী দলসমূহের বিভিন্ন দাবি মেনে নিলেও আইয়ুব খান আওয়ামী লীগের ছয় দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং শেষ পর্যন্ত গোল টেবিল বৈঠক ভেঙ্গে যায়। অন্যদিকে আইয়ুব সরকারের পতনের লক্ষ্যে ছাত্রদের আন্দোলন বিরামহীনভাবে চলতে থাকে।[১৯]

কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন সভা-সমাবেশের মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখে। ২৫ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কারামুক্ত নেতাদের এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মণি সিংহ বলেন, "কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বানচাল করার জন্যই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছিল।" তিনি আওয়ামী লীগের ছয় দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা ও তাদের চলমান আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য দেশের সকল মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।[২০] ১ মার্চ যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে মণি সিংহ ছাত্রদের ১১-দফা ও ডাকের ৮-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, পররাষ্ট্র নীতি ও কতকগুলো মৌলিক অধিকার আদায়ে সকলের ঐক্য অটুট রাখার আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে মণি সিংহ, মন্মথ দে, মণি কৃষ্ণ সেন এবং সন্তোষ ব্যানার্জী স্বাক্ষর করেন। বিবৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টির সকল নেতা-কর্মীর উপর থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।[২১]

ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতাদের বিশেষ করে মণি সিংহের সমর্থন ও সহযোগিতা আন্দোলনকে আরো অনুপ্রাণিত করে। এ আন্দোলনে গতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কোন উপায়ন্তর না দেখে আইয়ুব খান তার গদি সুরক্ষার জন্য দেশে সামরিক শাসন জারির সিদ্ধান্ত

---

১৯. হারুন-অর-রশীদ, ঐ, পৃ, ২৭১।
২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
২১. *দৈনিক আজাদ*, ২ মার্চ , ১৯৬৯।

নেয়। কিন্তু বাদ সাদে শীর্ষ সেনা কর্মকর্তারা। তাদের অস্বীকৃতির কারণে বাধ্য হয়ে ২৪ মার্চ আইয়ুব খান একটি পত্রের মাধ্যমে সেনা প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার অর্পণ করে পদত্যাগ করেন।[২২]

সামরিক আইন জারির মাধ্যমে দেশের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা, ১৯৬২ সালের সংবিধানসহ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল ঘোষণার পাশাপাশি ইয়াহিয়া নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৩] জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করার অঙ্গীকার করেন। সামরিক আইন জারির পর মণি সিংহসহ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা পুনরায় আত্মগোপন করে এবং আত্মগোপনে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে।

১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টিকে দ্বিতীয় বারের মত আরেকটি ভাঙ্গন মোকাবিলা করতে হয়। ১৯৬৮ সালের পার্টির সম্মেলনের পরপরই নাসিম আলীর নেতৃত্বে অল্প কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি নতুন গ্রুপের সৃষ্টি হয়। নবগঠিত এই গ্রুপটি আওয়ামী লীগের সাথে সখ্যের নীতি মেনে নিতে পারেনি। তাদের মতে, আওয়ামী লীগ একটি পেটি-বুর্জোয়া দল এবং তাদের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। তাছাড়া তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের প্রতি মিত্রতার সম্পর্কও সহজভাবে নেয় নি।[২৪] ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই গ্রুপটি *হাতিয়ার* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে তাতে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমের সমালোচনা করতে শুরু করে। পার্টির বিভিন্ন কার্যক্রম ও রাজনৈতিক দর্শনকে কেন্দ্র করে এই গ্রুপটির সাথে কমিউনিস্ট পার্টির মূলস্রোতের দূরত্ব বাড়তে শুরু করে এবং ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে তাদের পত্রিকার নামানুসারে হাতিয়ার গ্রুপ নামে পরিচিত হয়।[২৫] এই

---

২২. হারুন-অর-রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৭৮।

২৩. অজয় রায়, *বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*, (ঢাকা : সাহিত্যিকা, ২০০৩), পৃ, ৯৮।

২৪. *সাপ্তাহিক হাতিয়ার*, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল ৪, ১৯৬৯।

২৫. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, পড়ুয়া, ৯৭ পৃ, ৫৭।

গ্রুপের সাথে জড়িতদের মধ্যে শ্রমিক নেতা নাছিম আলী, শুভ রহমান, সোলায়মান আলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিল। এই গ্রুপের মূল দর্শন ছিল 'বল প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা।'

আত্মগোপনরত অবস্থায় ১৯৬৯ সালের ২৫ জুলাই সন্ধ্যায় মণি সিংহ গ্রেফতার হন। এসময় তার নামে কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল না।[২৬] পরদিন সাংবাদিকরা গোয়েন্দা পুলিশের ডিআইজিকে মণি সিংহের গ্রেফতারের কারণ জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। গ্রেফতারের পরপরই মণি সিংহ পূর্বের ন্যায় এবারও জেল থেকে পার্টির প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া অব্যাহত রাখেন। আর পূর্বের ন্যায় এবারও কারাগার থেকে তথ্য আদান-প্রদানের প্রধান বাহক ছিলেন ছাত্র নেতা সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিক।[২৭]

এক বেতার ভাষণের মাধ্যমে জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ভাষণে তিনি বলেন, উক্ত জাতীয় পরিষদের কাজ হবে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। এলক্ষ্যে ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কতিপয় শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপসহ আইনগত কাঠামো আদেশ বা এল.এফ.ও (Legal Framework Order-LFO) জারি করা হয়। এই আদেশের মাধ্যমে সার্বজনীন ভোটাধিকার, এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংখ্যা বণ্টন এবং জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ৩১৩টি নির্ধারণ, যার মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে ১৩টি, পাকিস্তানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে বজায় রাখা, সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত রাখা, প্রদেশসমূহকে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং নির্বাচিত সদস্যদের সংবিধান প্রণয়নের জন্য ১২০ দিন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।[২৮]

---

২৬. *দৈনিক সংবাদ*, ২৭ জুলাই, ১৯৬৯।
২৭. গণফরামের সেক্রেটারি কমরেড সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিকের সাক্ষাৎকার।
২৮. হারুন-অর-রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৭৯।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ ছাড়া সকল রাজনৈতিক দল 'অক্টোবর মাস পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়া নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নয়'– এর প্রেক্ষিতে নির্বাচন পেছানোর দাবি উত্থাপন করে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ ঘোষিত তারিখেই নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর মণি সিংহের নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ছয় দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনসহ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়া নিয়ে কাজ করার প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে ন্যাপ (মোজাফ্ফর) কমিউনিস্ট পার্টির সাথে থাকলেও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের পর থেকে আওয়ামী লীগ কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কোন আন্দোলন কিংবা নির্বাচনের আগ্রহ দেখায় নি।[২৯]

আওয়ামী লীগের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ৫ অক্টোবরের পরিবর্তে ৭ ডিসেম্বর নির্ধারণ করে। নির্বাচনের তফশীল ঘোষণার পরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে প্রচারাভিযান শুরু করে। তবে ন্যাপ (ভাসানী) এসময় ভোটের আগে ভাত চাই আওয়াজ তুলে নির্বাচন বয়কটের ডাক দেয়।

৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে এবং প্রায় ১০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে।[৩০] ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর উপকূলীয় এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি ত্রাণ তৎপরতা চালায় ও দলীয় প্রকাশ্য সভা করে। এসময় তারা পুরাতন কাপড়, শুকনা খাবার, নগদ অর্থ এবং ঔষধ সংগ্রহ করে তা দুর্গতদের মাঝে বিতরণ করে।[৩১] অপরদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্গত এলাকার জন্য সাহায্য পাঠানো হলেও পাকিস্তান সরকার এ ব্যাপারে প্রায়

---

২৯. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড *মনজুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার*, তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ নভেম্বর, ১৯৬৯।

৩১. *কমরেড সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিকের সাক্ষাৎকার।*

নীরব থাকে এবং শেষের দিকে ২২ নভেম্বর দুর্গত এলাকার জন্য ৫ কোটি টাকার সাহায্য মঞ্জুর করে। এই ভয়াবহ দুর্যোগের সময় সরকারের এরূপ উদাসীনতা জনসাধারণের মনে সামগ্রিকভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানের এই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার কথা বললেও আওয়ামী লীগ এর কঠোর বিরোধিতা করে এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের তারিখ অপরিবর্তিত থাকে। তবে যে সকল এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হেনেছিল সেসব এলাকার নির্বাচন ৭ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১৭ জানুয়ারি নির্ধারণ করা হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন

কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় ১৯৭০ সালের এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। নির্বাচনে মোট ১১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আওয়ামী লীগ বাংলার সকল আসনেই প্রার্থী দাঁড় করায়। ১৯৭০ সালের এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনমনে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৫৫.০৯ শতাংশ।[৩২] পূর্বপাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির পক্ষে নিরঙ্কুশ রায় প্রদান করে। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত ভোটের ৭৫ শতাংশ এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। অবশিষ্ট ২টি আসনের মধ্যে একটি লাভ করেন পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নূরুল আমিন এবং অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (নির্দলীয়)। একনজরে ভোটের ফলাফল অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

---

৩২. পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন, *Report on General Election, Pakistan* (1970-71) Vol.-1, 1972.

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা	প্রদেশ অনুসারে ফলাফল						মহিলা	মোট মহিলাসহ
		পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ. প. সী. প্র.	বেলুচিস্তান	উপজাতি এলাকা		
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	X	X	X	X	X	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	১২২	X	৬৪	১৮	১	X	X	৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৩২	X	১	১	৭	X	X	X	৯
মুসলিম লীগ কাউন্সিল	১১৯	X	৭	X	X	X	X	X	৭
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	৯৩	X	X	X	৬	১	X	X	৭
মারকাস-ই-জামায়াত	তথ্য নাই	X	৪	৩	X	X	X	X	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬১	X	X	X	৩	৩	X	১	৭
জামায়াতে ইসলাম	২০০	X	১	২	১	X	X	X	৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১২৪	X	২	X	X	X	X	X	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১০৮	১	X	X	X	X	X	X	১
স্বতন্ত্র	৩০০	১	৩	৩	X	X	৭	X	১৪
মোট		১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১*, (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৫৮৬।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ ৭০ শতাংশ ভোট এবং ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি লাভ করে বিপুলভাবে জয়ী হয়। অবশিষ্ট ১২টি

আসনের মধ্যে পাকিস্তান ডেমেক্রোটিক পার্টি দুটি, মস্কোপন্থী ন্যাপ একটি, জামায়াত-ই-ইসলামী একটি এবং নির্দলীয় প্রার্থীগণ পান ৮টি আসন লাভ।[৩৩] এক নজরে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ফলাফল অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল

দল	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি	২	X	২
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	X	X	X
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	X	X	X
মুসলিগ লীগ (কনভেনশন)	X	X	X
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	X	X	X
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	X	১
জামায়াতে-ই-ইসলামি	১	X	১
নেজামে ইসলামি	১	X	১
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম	X	X	X
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (হাজারি)	X	X	X
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (নূরানী)	X	X	X
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭	X	৭
মোট-	৩০০	১০	৩১০

সূত্র: *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১*, (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৫৮৬।

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বিদ্যমান কৃষ্টি-কালচার, রাজনীতিসহ চিন্তা-চেতনার মধ্যে যে ব্যাপক অমিল ও পার্থক্য ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ফলাফলের মাধ্যমে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, স্বাধীনতার ২৩ বছর পরও দেখা যায় যে পাকিস্তানে জাতীয় ভিত্তিক কোন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ বলে কিছু নেই, পাকিস্তান শুধু মাত্র ধর্মাশ্রয়ী এক কৃত্রিম রাষ্ট্র।

৩৩. পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন, পূর্বোক্ত।

পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন দখল করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোন আসনে জয়লাভ করতে পারে নি। অপরদিকে পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৩টি আসনে নির্বাচিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পূর্ব পাকিস্তানে তারা কোন আসনে প্রার্থী পর্যন্ত দিতে পারে নি। পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামী দলসমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে স্বল্প সংখ্যক আসন পেলেও পূর্ব পাকিস্তানে তারা তেমন একটা সুবিধা করতে পারে নি।

নিষিদ্ধ থাকায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে নি। তবে ন্যাপ (মোজাফফর) এর মাধ্যমে তাদের দু-একজন সভ্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি।[৩৪] বিভিন্ন প্রগতিশীল দলে কর্মরত পার্টির সভ্য ও সমর্থকরা স্ব স্ব দলের পক্ষে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছিল যার ফলে নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামী দলগুলো শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি যে সকল আদর্শ ও দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে তার অনেকগুলোই বাস্তবানের অঙ্গীকার নিয়ে মাঠে নামে এবং জনগণ তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে রায় প্রদান করে। ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, নিষিদ্ধ থাকলেও ১৯৭০ সালের নির্বচনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের সফলতা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির ভাবনা

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর-পরই আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন,

> I warmly thank the people for having given a historic verdict in favour of our six points programme. We pledge to implement this verdict. There can be no constitution except one which is based on the six-point programme.[৩৫]

---

৩৪. *অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহম্মেদের সাক্ষাৎকার*, তারিখ: ১৮ ডিসেম্বর ২০০৫।
৩৫. মো. মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২১১।

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার পর পাল্টা জবাবে পিপিপি নেতা ভুট্টো বলেন, তার দলের সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রে কোন সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। তিনি আরো বলেন, পিপলস পার্টি পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, তাই কেন্দ্রীয় সরকারে এই দুই প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজ উদ্দীন আহম্মেদ অপর এক বিবৃতির মাধ্যমে পিপলস পার্টির এই দাবিকে নাকচ করে দেন।[৩৬]

১৯৭১ সালের জানুয়ারির মধ্যভাগে ইয়াহিয়া খান এবং ২৭ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১-দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার কথা তুলে ধরলে ভূট্টো তা নাকচ করে দেয়। তিনি আওয়ামী লীগের ছয় দফার প্রথম ও শেষ দফাটি মেনে নিয়ে সংবিধান রচনার কথা বলেন। ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদের অধিবেশন ঢাকায় শুরু হবে বলে ঘোষণা দেন।[৩৭] কিন্তু ভুট্টো তার মতামত গ্রহণের অঙ্গীকার না দিলে উক্ত অধিবেশন বয়কটের হুমকি দেন। শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ১ মার্চ অপর এক ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চের অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশন স্থগিত করে।[৩৮] ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় সমগ্র পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধ ও পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। ২ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পাশাপাশি তিনি ৭ মার্চ বেলা ২টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভার মাধ্যমে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে সাংবাদিকদের জানান।[৩৯]

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর-পরই কমিউনিস্ট পার্টি এই বিজয়কে বাঙালির দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল হিসেবে দেখেছিল। পার্টির মতামত ছিল,

---

৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৭১।
৩৭. হারুন-অর-রশীদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৭।
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *সংবাদ*, ২ মার্চ, ১৯৭১।
৩৯. ড. মো. মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২১১।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছয় দফা ও ১১-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। মূল্যায়নের পাশাপাশি পার্টি আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী হয়তবা কখনোই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এমতাবস্তায় পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হবে, আর এ সংগ্রামের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করতে হবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি রাজনৈতিক প্রস্তাবের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি সম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রেসিডেন্ট কর্তৃক তার অনুমোদন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি উত্থাপন করা হয়। আর এই দাবিগুলোকে ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে আন্দোলন প্রসারিত করার মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রস্তাবে আরো বলা হয়, নির্বাচনের রায়কে কার্যকর করা না হলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলন একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দিকে যেতে পারে, তাই এরূপ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হবে এই সংগ্রামে শরিক থাকা এবং সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালনার করা।[৪০]

সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণাকে কেন্দ্র করে গণ-বিক্ষোভের চিত্র দেখে কমিউনিস্ট পার্টি উপলব্ধি করেছিল, বাঙালি জাতির এই অভ্যুত্থান দমন করার জন্য শাসকগোষ্ঠী সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করবে এবং স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হবে, সে অনুযায়ী জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার।[৪১] এই প্রস্তুত করার অংশ হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপনরত অবস্থায় ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সংগঠন ও গণতান্ত্রিক শক্তি এবং ১৯৭০ সাল থেকে প্রকাশিত হতে থাকা পার্টি পত্রিকা *সাপ্তাহিক একতার* মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য চালাতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এসময় কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সাধ্যমত পার্টির সদস্য, সভ্য, এবং জনসাধারণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল।

৭ মার্চ ও পরবর্তী কয়েকদিন

পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভাষণে "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার ও মুক্তির

---

৪০. ২৭ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রাকাশিত রাজনৈতিক প্রস্তাব শীর্ষক লিফলেট।
৪১. মোহাম্মদ শাহ আলম (সম্পাদিত), *বেতিয়ারা*, (ঢাকা: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৯৫), পৃ, ৬।

সংগ্রাম" বলে ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে তিনি যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন কমিউনিস্ট পার্টি ও মণি সিংহ তার ছিল পুরোপুরি সমর্থক। ৭ মার্চের ভাষণের সময় মণি সিংহ রাজশাহী জেলে আটক ছিলেন। জেলে থেকেই তিনি এই ভাষণ শোনেন এবং বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি টেলিগ্রাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও গোয়েন্দা বিভাগ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তা আর সম্ভব হয় নি।[৪২]

৭ মার্চের পর থেকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অলিখিতভাবে বঙ্গবন্ধুর শাসন জারি হয়। ৯ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি একটি প্রচারপত্র বিলি করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পার্টির অবস্থান সম্পর্কে জনগণকে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয়। প্রচারপত্রের মাধ্যমে বলা হয় :

> বাংলাদেশের দুশমন হইল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার ও উহাদের সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান, বেলুচ, সিন্ধি ও পাঞ্জাবি জাতিসমূহের মেহনতি জনতা পূর্ব বাংলার জনগণের শত্রু নয়।
>
> ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণদুশমনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবিতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের ডলারের শৃঙ্খলে বাধা না পড়ে সেজন্যেও সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে আগাইয়া লওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক কৃষক-ছাত্র মধ্যবিত্ত জনতাকে তাহাদের সংগ্রামে আগাইয়া লওয়ার আহ্বান জানাইতেছে।
>
> কতকগুলি তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মঘট অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির প্রয়োজন নাই; গ্রামে গ্রামে কৃষি বিপ্লব শুরু কর, জোতদারদের গোলা কাটো, ধ্বনি তুলিয়া আজিকার গণ সংগ্রামে উদ্দীপনা, সংকল্প ও প্রস্তুতিতে ভাটা আনিয়া দিতে চাহিতেছেন। মার্কিন এজেন্টরা এই সংগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া সংগ্রাম বিপথগামী করার প্রচেষ্টা করিতে পারে।
>
> জনগণকে আজ সংগ্রাম করিতে হইতেছে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র

---

৪২. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম (২য় খণ্ড)*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ, ১৩১।

> সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাই শান্তিপূর্ণ পন্থায় শেষ পর্যন্ত জনগণের সংগ্রাম বিজয়ী হইবে এই রূপ মনে করিবার কারণ নাই। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী সেনাবাহিনী জনগণের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করিতে পারে। তাই আত্ম-সন্তুষ্টির কোন কারণ নাই। সংগ্রাম যে কোন সময়ে সুতীব্র রূপ ধারণ করিতে পারে। এই অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর না করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা, উহা প্রতিরোধ করার জন্য শহর গ্রাম সর্বত্র জনগণকে সংগঠিতভাবে প্রস্তুত হইবার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।
>
> এর জন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে, কল-কারখানায় সর্বত্র দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শক্তি নিয়া গড়িয়া তুলুন সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী। সেনাবাহিনী আক্রমণ করিলে উহা প্রতিরোধের জন্য ব্যারিকেড গঠন করুন, যাহা আছে উহা দিয়াই শত্রুকে প্রতিহত করুন।[৪৩]

বঙ্গবন্ধু ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে ১৫ মার্চ থেকে যে আলোচনা শুরু হয় কমিউনিস্ট পার্টি এর বিরোধিতা না করলেও তাদের মূল্যায়ন ছিল, এই আলোচনার মাধ্যমে কোন সমাধান হবে না, কারণ জনগণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদীরা এটি মেনে নেবে না।'[৪৪] পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি তাদের ছাত্র সংগঠনসহ বিভিন্ন প্রকাশ্য সংগঠনগুলোর মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এবং আসন্ন যে কোন ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারণকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, তাদের কুচকাওয়াজ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ-তরুণীদের রাইফেল চালনা প্রশিক্ষণ, কুচকাওয়াজ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

---

৪৩. কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বিতরণকৃত প্রচারপত্র, ৯ মার্চ ১৯৭১।

৪৪. মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা*, (ঢাকা: গণপ্রকাশনী ও সমাজ চেতনা পাবলিশার্স, ২০০১), পৃ, ১৭০।

৭ মার্চের পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ও মণি সিংহ আওয়ামী লীগকে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদান করে চলে। পাশাপাশি দেশের জনসাধারণকে সম্ভাব্য সেনা হামলা মোকাবিলা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের মাঝে বিভিন্ন ধরনের লিফলেট বিতরণ ও দলীয় মুখপত্র *একতার* মাধ্যমে প্রচার চালাতে থাকে, যার মূল কথা ছিল উদ্ভূত যে কোন ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং চূড়ান্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া। মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জাতির উপর অপারেশন সার্চ লাইট নাম দিয়ে এক জঘন্য হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী প্রথমে ঢাকার অদূরে রায়পুরায় একত্রিত হয়ে একটি ঘাঁটি গড়ে তুলে সরাসরি প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নেয়। রায়পুরায় যারা একত্রিত হয়েছিল তাদের মধ্যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ, জ্ঞান চক্রবর্তী, সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিক, মন্জুরুল আহসান খান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৪৫] এখান থেকে তারা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত পার্টির সকল শাখা এবং তার অঙ্গ-সংগঠনগুলোর প্রতি পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্ভব হলে নিজেরাই ঐক্যবদ্ধভাবে অথবা ন্যাপ কিংবা আওয়ামী লীগের সাথে যৌথভাবে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ম্যাসেজ পাঠায় এবং তা বেশ দ্রুত ছড়িয়েও পড়ে।[৪৬]

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে রায়পুরা পাক বাহিনীর দখলে চলে গেলে তারা ভৈরবের আশুগঞ্জে অবস্থান নেয়। আশুগঞ্জ থেকেও কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠনের সাথে যোগাযোগ পুনস্থাপন এবং পুনর্গঠিত হয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়। কিন্তু এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে আশুগঞ্জে বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে নেতৃবৃন্দের দেশে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং তারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরায় চলে যান।[৪৭]

---

৪৫. কমরেড মঞ্জুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার।

৪৬. মেসবাহ কামাল, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা-১৭৩।

৪৭. মোহাম্মদ শাহ আলম (সম্পাদিত), *বেতিয়ারা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১২।

১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে গ্রেফতার হওয়া মণি সিংহকে ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোহরসহ বিভিন্ন জেল ঘুরিয়ে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে রাজশাহীতে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ৭ এপ্রিল ভোর রাত পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। পাক সেনারা রাজশাহীতে ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করলে ইপিআরও প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ গোলাগুলি শুরু হয়, যার আওয়াজ এবং কিছু গুলি রাজশাহী জেলে গিয়েও পড়ে। এছাড়া রাজশাহী জেলের উপর মাঝে মধ্যেই জেট বিমান টহল দিতে থাকে। ফলে কারাগারে আটক বন্দিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। জেলে আটক বন্দিদের মধ্যে মণি সিংহ ছিলেন বয়সে প্রবীণ এবং রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সুপরিচিত। অধিকাংশ বন্দিই তাকে চিনত এবং কাকাবাবু বলে ডাকত। জেলের বন্দীরা সকলেই মণি সিংহের কাছে যায় এবং মণি সিংহের নেতৃত্বে ডিআইজির কাছে গিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সকলকে মুক্ত করে দিতে অনুরোধ জানায়। ডিআইজি তাদের তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে পরের দিন ৭ এপ্রিল ভোরবেলা রাজশাহী জেলের রাজবন্দি ও কয়েদিরা মণি সিংহের নেতৃত্বে জেলের পিছনের দরজা ভেঙ্গে বের হয়ে আসে।[৪৮] ডিআইজি আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে বন্দিদের মুক্তি দিতে রাজি হননি, কিন্তু বন্দিরা জেলের দরজা ভেঙ্গে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিলে তিনি তাদের কোন বাধাও দেননি। মূলত এসময় তিনি দেখেও না দেখার ভান করে তার অফিস কক্ষে বসে ছিলেন। জেল থেকে বের হওয়ার পর স্থানীয় জনগণ নিরাপত্তার কথা ভেবে মণি সিংহকে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেয় এবং কয়েকজন রাজবন্দিসহ মণি সিংহকে নৌকায় উঠিয়ে ভারতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়।

ভারতে প্রবেশের পর মণি সিংহ বহরমপুর হয়ে কলকাতা পৌছান। কলকাতায় গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির সকল নেতৃবৃন্দ ত্রিপুরার আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছে। তিনি ত্রিপুরায় অবস্থিত নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আগরতলায় গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মূল দলটির সাথে যোগ দেন। ১০ ও ১৭ এপ্রিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং তার শপথ গ্রহণকে মণি সিংহ অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানায়।[৪৯]

---

৪৮. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৩৬।

৪৯. মোহাম্মদ শাহ আলম (সম্পাদিত), *বেতিয়ারা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।

পাক বাহিনীর আক্রমণ, নির্বিচারে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ প্রভৃতির মুখে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী, সভ্য, সমর্থক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা মিলিয়ে প্রায় ছয় হাজার নর-নারী বাংলাদেশ সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়।[৫০] যুদ্ধ শুরুর প্রথমদিকে দেশে এবং ভারতের এই তিনটি প্রদেশে অবস্থানরত কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রবাসে আশ্রয় নেওয়া দলীয় সদস্যদের জন্য আশ্রয়, খাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, সকল প্রকার পার্টি সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রবাসে পার্টিকে গুছিয়ে তোলা এবং একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া সংক্রান্ত কাজগুলো একান্ত অপরিহার্য হলেও পার্টির জন্য তা ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছিল।

এপ্রিলের মাঝামাঝির সময়ে মণি সিংহ আগরতলায় পৌছার পর প্রথমে ত্রিপুরায় এবং পরে পার্শ্ববর্তী এলাকায় আশ্রয় নেওয়া কমরেডদের সাথে যোগাযোগ এবং ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেসসহ বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নেতৃবৃন্দসহ ক্রমান্বয়ে সকলের আবাসন এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করেন এবং ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে পার্টিকে গুছিয়ে তোলা শুরু করেন।[৫১]

মুক্তিযুদ্ধ ও কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরায় ঘাঁটি নির্মাণ করে এই সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে মণি সিংহ ত্রিপুরায় দলীয় সদস্যদের এক সভা আহ্বান করেন। সভায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা এবং কলকাতা ও ত্রিপুরায় দলের অফিস খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।[৫২] এসময় চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির কতিপয় নেতা দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে রাশেদ খান

---

৫০. ১৯৭৩ *সালের পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্ট।*
৫১. কমরেড *নিবেদিতা নাগের* সাক্ষাৎকার।
৫২. মণি সিংহ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৭।

মেনন ও কাজী জাফর আহমেদের নাম অন্যতম। তারা আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে কমিউনিস্ট দলগুলোর সমন্বয়ে একটি 'বামপন্থী ফ্রন্ট' গঠন করে তার মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তাব কমিউনিস্ট পার্টিকে দেয়। ইতোমধ্যে সবকিছু গুছিয়ে নেওয়ার পর মে মাসের প্রথম দিকে আগরতলায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক চরিত্র, সংগ্রামের শক্তি এবং শত্রু-মিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করে একটি দলিল গ্রহণ করা হয়। দলিলে বলা হয় :

> স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় একতা এবং মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব ও ত্যাগ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান শক্তি। প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও দুনিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতিকামী শক্তি আমাদের বন্ধু, অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদী চীন ও বিশ্বের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা পাকিস্তানের সমর্থক ও আমাদের শত্রু।[৫৩]

সভার সিদ্ধান্তগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. আওয়ামী লীগকে বাইরে রেখে শুধুমাত্র বামপন্থীদের নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে বাংলাদেশের মাওবাদী কমিউনিস্ট নেতাদের দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী তথা আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (উভয় গ্রুপ), ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি প্রমুখ সকল শক্তির সমন্বয়ে একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট ও যৌথ বাহিনী গঠন করে তাদের মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করার কথা বলা হয়।[৫৪]
২. মোট দুই ধরনের ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। এর একটিতে মহিলা ও বয়স্কদের আশ্রয় দান এবং অপরটিতে তরুণ যাদেরকে লড়াইয়ের উপযুক্ত মনে করা হবে তাদেরকে রেখে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা হবে।
৪. কলকাতা ও আগরতলা অফিসের সমন্বয় রেখে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিচালনা করা।[৫৫]

---

৫৩. "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক মূল্যায়ন" (ধারাবাহিক প্রতিবেদন) *সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ*, ১৫, ২২,ও ২৯ আগস্ট, ১৯৭১।

৫৪. মণি সিংহ, "মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি" *বেতিয়ারা*, পূর্বোক্ত, পৃ, ১২।

৫৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র:* (ঢাকা: তথ্য

৫. 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা।

সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করতে যেয়ে সমস্যা হয়, জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন ও একটি যৌথ বাহিনী গড়া এবং তার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার করার কাজটি এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে। কারণ এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের কোন আগ্রহ বা উদ্যোগ ছিল না। ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়-এই তিনটি রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু ক্যাম্প স্থাপন করা হয়।[৫৬] প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন ছিল অস্থায়ী সরকারের ব্যবস্থাপনায় প্রদেয় ব্যবস্থা। পাশাপাশি আর্থিক দিক দিয়ে এসময় কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় পার্টি ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের অধিকাংশকেই সরকারি মুক্তিবাহিনীতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের একটি অংশ ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র-যুবকদের সশস্ত্র ট্রেনিং প্রদানের ক্ষেত্রে আপত্তি তোলে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তারা বাধারও সৃষ্টি করে।[৫৭]

প্রথম দিকে প্রশিক্ষণের জন্য রিক্রুটিং কেবলমাত্র আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের যুবকদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ভারতের অন্যতম প্রধান প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই)-এর হস্তক্ষেপে এ অবস্থার সমাধান হয়। সিপিআইয়ের সাথে তখন ইন্দিরা সরকারের সুম্পর্ক থাকায় ভারতের রাজনীতিতে তারা ছিল কিছুটা প্রভাবশালী শক্তি। তাদের সমর্থক ও মতাদর্শীদের প্রশিক্ষণে বাধা প্রদানের বিরুদ্ধে তারা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাশাপাশি ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও মণি সিংহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে তারা যুদ্ধ পরিস্থিতি, মুসলিম বিশ্বসহ গণচীন ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান,

---

মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ, ৬৮৯। (এরপর *স্বাধীনতার দলিলপত্র* বলে উল্লিখিত হবে)

৫৬. "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক মূল্যায়ন (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি)," *সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ*, ১৫ আগস্ট, ১৯৭১।

৫৭. মঈনুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, (ঢাকা: ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫), পৃ, ৮০।

আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমর্থন ও সহায়তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন।[৫৮] আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধে ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত ছাত্র-যুবকদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে চলমান সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও যুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব, গণতান্ত্রিক দেশ ও সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সি.পি.আইয়ের সার্বিক চেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপে ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত কমিউনিস্টদের বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠনের এবং সেজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে মোট ১৭ হাজার যোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে পাঁচ হাজার ছিল ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ গেরিলা বাহিনী আর অবশিষ্ট ১২ হাজার ছিল কমিউনিস্টদের মাধ্যমে যোগ দেওয়া বাংলাদেশ সরকারের মুক্তি বাহিনীর সদস্য।[৫৯] এই সম্মিলিত গেরিলা বাহিনীর পরিচালকের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ।[৬০] ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা বেশ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে সারা দেশের বিভিন্ন শত্রু ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায় এবং সফলতা পায়। এসবের মধ্যে ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলের অ্যাকশনগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর রাত দশটার দিকে ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত গেরিলা বাহিনীর সদস্যরা কুমিল্লার বেতিয়ারা নামক স্থানে পাক বাহিনীর সাথে এক অতর্কিত যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাতে গেরিলা বাহিনীর ৯ জন সদস্য শহীদ হয়। মুক্তিযুদ্ধে ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত গেরিলাদের অনেক বীরত্বগাথার মধ্যে এটি ছিল বেদনা বিধুর একটি ঘটনা। এসময় যারা সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিল, গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করেছিল তাদের মধ্যে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মুনজুরুল আহসান খান, মোর্শেদ আলী, ওসমান গণী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৬১]

---

৫৮. *অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের সাক্ষাৎকার।*

৫৯. মোহাম্মদ শাহ্ আলম (সম্পাদিত), *বেতিয়ারা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৩।

৬০. *স্বাধীনতার দলিলপত্র*, ১৫তম খ-, পৃ, ৩৪৫।

৬১. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, গ্রন্থলোক,১৯৯১), পৃ, ১৮৯।

যুদ্ধ চলাকালে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সকল গেরিলা যোদ্ধা, আপামর জনসাধারণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রচারপত্র বিলি করে। এসকল প্রচার পত্রের মাধ্যমে তারা প্রথমে যুদ্ধে আপামর সকল জনসাধারণকে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মে "হানাদার খতম করুন! বাংলাদেশ স্বাধীন করুন" শিরোনামে একটি প্রচারপত্র বিলি করে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের তরুণ ও যুবকদের সংগঠিত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অন্যদের বিভিন্নভাবে যুদ্ধে সহায়তা ও সহযোগিতা করার আহ্বান জানায়। রাজাকার আল-বদর বাহিনী সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকা এবং তাদেরও শত্রু সেনা হিসেবে গণ্য করার আহ্বান জানানো হয়।[৬২]

৬ আগস্ট দলের পক্ষ থেকে "গেরিলা যোদ্ধাদের অবশ্যই পালনীয় নীতিমালা" শীর্ষক একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্রে যুদ্ধে গেরিলা যোদ্ধাদের কর্তব্য, গেরিলা যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, কমান্ডারের নির্দেশ পালন প্রভৃতি বিষয়ে মোট ২৬টি নির্দেশনা দেওয়া হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তা গেরিলাদের অবশ্যই মেনে চলার কথা বলা হয়। এই নির্দেশনাগুলো কেবলমাত্র ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত গেরিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই প্রচারপত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল যোদ্ধার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। বিভিন্ন সহযোদ্ধা ও ক্যাম্পে বিলি করার জন্য যোদ্ধাদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানানো হয়।[৬৩] ৩১ আগস্ট "মুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্য পালনীয় রাজনৈতিক নীতিমালা" শীর্ষক অপর একটি প্রচারপত্রের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়। প্রচারপত্রটিতে মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান, মুজিবনগর সরকারের সাথে সম্পর্ক, বহির্বিশ্বে শত্রু-মিত্র ও সহযোগী দেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণা এবং কতকগুলো পালনীয় কর্তব্য তুলে ধরা হয়। প্রচারপত্রটি মুক্তিযোদ্ধাসহ সকলের উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয় এবং একের পড়া শেষ হলে তা অপরের হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।[৬৪] যুদ্ধকালে কমিউনিস্ট পার্টি এই ধরনের অনেক প্রচারপত্র বিতরণের মাধ্যমে সকলের কাছে দলের অবস্থান এবং যুদ্ধকালীন দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে জনগণকে

---

৬২. কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত '*হনাদার খতম করুন, বাংলাদেশ স্বাধীন করুন*' শীর্ষক প্রচারপত্র, ২৫ মে, ১৯৭১।

৬৩. কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত 'গেরিলা যোদ্ধাদের অবশ্যই পালনীয় নীতিমালা' শীর্ষক প্রচারপত্র, আগস্ট, ১৯৭১।

৬৪. কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত 'মুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্য পালনীয় রাজনৈতিক নীতিমালা' শীর্ষক প্রচারপত্র, ৩১ আগস্ট ১৯৭১।

অবহিত করেছিল। এছাড়া নিয়মিতভাবে প্রকাশিত পার্টি পত্রিকা *সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ* বিভিন্ন ক্যাম্পে বিতরণ করা হয়।

যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য মণি সিংহের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি মে মাসের মাঝামাঝি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.আই)-এর সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা চালায়। সেপ্টেম্বর মাসে কোচিনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন কামনা করে। এছাড়া পার্টি নিজ উদ্যোগে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে তার সহায়তায় একটি প্রতিনিধি দল ইউরোপের কয়েকটি দেশে পাঠায়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ইউরোপের বিভিন্ন প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে ইয়াহিয়া বাহিনীর ভয়াবহ গণহত্যা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ তুলে ধরেন।[৬৫] উল্লেখ্য যে, এটিই ছিল বিদেশে সফরকারী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কোন প্রতিনিধি দল।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিব নগরে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে অস্থায়ী সরকারের একটি সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে মণি সিংহ ছিলেন অন্যতম। কমিটি গঠনের ফলে সমগ্র বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব কয়েকগুণ বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি তেমন কোন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে না পারলেও এর যে দু-চারটি সভা হয় সেখানে মণি সিংহ সবসময় ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৬৬] ৯ আগস্ট ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে।[৬৭]

৬৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক মূল্যায়ন (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), *সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ*, ২২ আগস্ট ১৯৭১।

৬৬. মোহাম্মদ শাহ আলম (সম্পাদিত), *বেতিয়ারা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭।

৬৭. *বাংলা পিডিয়া (৮ম খ-)*, পৃ, ২০৭, (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪)।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে যুদ্ধে পাকিস্তান ক্রমশ কোণঠাসা হতে শুরু করে। ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে পাকিস্তান কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ ভারতে বিমান হামলা চালায়।[৬৮] মূলত এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে রূপ দেওয়া এবং জাতিসংঘের সহায়তায় যুদ্ধ বিরতি করানো। কিন্তু ভারত পাকিস্তানের এই ষড়যন্ত্রমূলক কৌশলকে সহজেই বুঝতে পেরে পাকিস্তানের নীল নকশায় পা না দিয়ে উল্টো বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ সৈন্য নামিয়ে দেয়। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের তিনদিকে ভারতের অবস্থান থাকায় কৌশলগতভাবে তারা অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। ফলে ১২ শ মাইল দূরের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা সৈন্যদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না এবং ক্রমান্বয়ে তারা কোনঠাসা হতে শুরু করে। এসময় ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গড়া মিত্রবাহিনী স্থল, আকাশ ও সমুদ্রসহ সবদিক দিয়ে সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করে। ৬ ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকৃতি প্রদান যোদ্ধাদের মনোবলকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে সতর্কতামলূক কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই মুক্তিযুদ্ধের মূলশক্তি আওয়ামী লীগের সাথে সহযোগী শক্তি হিসেবে থেকেছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র সংগ্রাম ও পাকিস্তান বাহিনীকে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কমিউনিস্ট পার্টি মুজিবনগর সরকারকে স্বীকার করে তার অধীনে থেকে যুদ্ধকে সংগঠিত করে। কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে তাকে জনযুদ্ধ হিসেবে দেখেছিল এবং দলীয় সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে গিয়ে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল।

---

৬৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক মূল্যায়ন (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), *সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ*, ২২ আগস্ট, ১৯৭১।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ ঘটে একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে। ১৯৬০-এর দশক থেকে আওয়ামী লীগের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির যে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের কমিউনিস্টি পার্টি আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। তবে কমিউনিস্ট পার্টির এ প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশ ঘটে বিরোধী দল হিসেবে নয় বরং সরকারের একটি সহযোগী শক্তি হিসেবে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, দেশের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং শোষণমুক্ত জনকল্যাণকামী এক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করতে কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল। এ দল আওয়ামী লীগকে প্রভাবিত করেছিল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করতে।

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি

হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের প্রাক্কালে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর মণি সিংহ বাংলাদেশের যশোরে প্রবেশ করেন।[১] পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণে পর ১৭ ডিসেম্বর তিনি যশোরে স্বাধীন বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির শাখা অফিস উদ্বোধন করেন। শুরুতেই তিনি যুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তাদের পরিবার পরিজনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। পার্টি অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন,

> আজ আমরা স্বাধীন, মুক্ত। দীর্ঘ ৯ মাস সংগ্রামের মাধ্যমে আজ আমরা হানাদার মুক্ত হয়েছি, পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমপর্ণের মাধ্যমে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য

১. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ.১৪১।

> আমাদেরকে আরো অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের সংগ্রামের শেষ এখনো হয় নি, আমাদের এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এ দেশের প্রতিটি মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তবেই আমরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হব। আমাদের যার যা ছিল তাই নিয়ে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, বর্তমানে আমাদের আরো একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এ দেশের পুনর্গঠন এবং সাথে সাথে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। তবেই আমরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হব।[২]

২১ ডিসেম্বর তিনি বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার কমোডর এ.কে খোন্দকারের সাথে একই বিমানে ঢাকায় আসেন। মোহাম্মদ ফরহাদ, মনজুরুল আহসান খান, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য প্রায় সকল নেতা ঢাকায় থাকার কারণে তিনি ঢাকায় এসে তাদের সাথে মিলিত হন এবং যুদ্ধ পরবর্তী জয়ের আনন্দ ও স্বজন হারানোর কষ্ট ভাগাভাগি করে নেন। ২২ ডিসেম্বর রাতে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহম্মেদ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে।[৩] সরকার ও আওয়ামী লীগের অন্য নেতৃবৃন্দ ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেছিল।

ডিসেম্বর মাসের এবং ১৯৭১ সালের শেষ দিন, ৩১ ডিসেম্বর বিকেল ৩ টায় ঢাকার ২১/১ পুরানা পল্টনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-র কেন্দ্রীয় অফিস উদ্বোধন করা হয়। ১৯৫৪ সালে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে তার কেন্দ্রীয় অফিস চালু করে। সুযোগ ঘটে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের প্রকাশ্য রাজনীতি করার। আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় অফিসের উদ্বোধন করেন মণি সিংহ। অনুষ্ঠানে তাজউদ্দীন আহমেদসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ।[৪]

---

২. আমজাদ হোসেনের সাক্ষাৎকার, তারিখ: ২৬ জুলাই, ২০০৫।

৩. মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (বঙ্গবন্ধুর সময়কাল)*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী,) পৃ, ৯।

৪. *The Bangladesh Observer*, 01 January 1972.

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে মণি সিংহ বলেন,

> জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে আমরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছি, আমরাও এর পুরোভাগে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হলেও আমাদের সংগ্রাম শেষ হয় নি। দেশের পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য দেশকে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য অবিলম্বে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সমালোচনা করে তিনি আরো বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সবসময় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ক্ষতি সাধন করে থাকে আর চীন আজকে সমাজতন্ত্রের অপব্যাখ্যা প্রদান করে জনগণের ন্যায্য সংগ্রামে বাধার সৃষ্টি করছে। স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। যদি প্রতিক্রিয়াশীলের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা হয়, তবে তার বিরুদ্ধে আমরা উল্কার মত লড়বো। আমরা সমাজতন্ত্রের গোঁজামিলে বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে।"[৫]

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা দেশে ফিরে আসার পর দেশে সরকার ব্যবস্থার প্রকৃতি কি হবে তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহের সমন্বয়ে সর্বদলীয় সরকার গঠনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। কিন্তু আওয়ামী লীগের কে এম ওবাইদুর রহমান কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করে।[৬] তবে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দীন আহম্মেদ এ ব্যাপারে কিছুটা সমঝোতামূলক ও নমনীয় ছিলেন। ২৬ ডিসেম্বর এক বক্তব্যে তিনি বলেন, "মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা সরকারের পরমর্শদাতা ৫ দলীয় উপদেষ্টা কমিটি বহাল থাকবে।"[৭] ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি তাজউদ্দীন আহম্মেদকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মিলিশিয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডের সদস্যরা ছিলেন ১. তাজউদ্দীন আহম্মেদ (সভাপতি); ২. মণি সিংহ; ৩. মওলানা ভাসানী; ৪. এ এইচ এম কামরুজ্জামান; ৫. মনোরঞ্জন ধর; ৬. অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ; ৭. তোফায়েল আহমেদ; ৮. আব্দুর রাজ্জাক; ৯. রফিকউদ্দীন ভূঁইয়া; ১০. গাজী

৫. *The Bangladesh Observer, দৈনিক ইত্তেফাক* ও *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১ জানুয়ারি ১৯৭২.
৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২।
৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭২।

গোলাম মোস্তফা এবং ১১. ক্যাপ্টেন সুজাত আলী।[৮] তবে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এই কমিটি আর কার্যকরী হয় নি এবং সর্বদলীয় সরকার গঠনের বিষয়টিও থেমে যায়।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এখন কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। যদিও ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকেই অর্থাৎ বাংলাদেশে ফিরেই কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্য কার্যকলাপ চালিয়ে আসছিল।"[৯] বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের কর্মসূচিসমূহকে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয় এবং এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত হয়।[১০] সরকারের গৃহীত এই কর্মদ্যোগসমূহের মধ্যে ছিল বিভিন্ন পুনর্গঠন কর্মসূচি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের কৌশল ও দেশের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতিকে গড়ে তোলার উদ্যোগ।

ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অপর এক বৈঠকে জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য প্রকৃত দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আওয়ামী লীগ সম্পর্কে মূল্যায়নে বলা হয়, "আওয়ামী লীগ হচ্ছে প্রধানত মধ্যস্তরের জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ও প্রগতিশীল নীতি অনুসরণকারী একটি রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগে প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি যেমন আছে তেমনি আবার দুর্নীতিপরায়ণ, রক্ষণশীল, বুর্জোয়া এবং জোতদাররাও আছে।"[১১] তারপরও এই দলের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার আরও বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের সাথে একত্রে তথা ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর), আওয়ামী লীগ ও কমিউনস্ট পার্টির সমন্বয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয়।[১২]

---

৮. মোহাম্মদ হান্নান, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১২।

৯. *১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট।*

১০. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, (ঢাকা: পড়ুয়া, ১৯৯৭), পৃ, ৫০।

১১. ভ্লাদিমির পুচকভ, *বাংলাদেশের রাজনীতিক গতিধারা, ১৯৭১-১৯৮৫*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ, ১৫।

১২. আমজাদ হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ৫১।

স্বাধীনতা লাভের পর কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে নিজেদেরকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা এবং অন্যদিকে দেশের পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো সমর্থনের মাধ্যমে সহযোগিতার পথ বেছে নেয়। যার ফলে অতি দ্রুত সমগ্র দেশে ইউনিয়ন, থানা, ও জেলা পর্যায়ে কমিটি পুনর্গঠন ও নতুন নতুন অফিস উদ্বোধনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়। এসময় একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল ১৯৬৮ সালের পার্টির সম্মেলনের সময় মণি সিংহ জেলে থাকায় কমরেড আব্দুস সালামকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে মণি সিংহের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো এবং অধিকাংশ সভায় তিনিই সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন। সুতরাং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পার্টির এসকল সিদ্ধান্তে মণি সিংহের মতামতের প্রতিফলন ঘটেছিল।

গঠনমূলক সমালোচনা ও সহযোগিতার রাজনীতি

স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সরকারকে সহযোগিতা এবং গণ-বিরোধী কিংবা বিভেদমূলক কাজের গঠনমূলক সমালোচনা ও বিরোধিতা করার কৌশল গ্রহণ করে।[১৩] কমিউনিস্ট পার্টি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক সভা-সমাবেশের মাধ্যমে দলের কর্মসূচি, বিভিন্ন ইস্যুতে দলের অবস্থান ও মতামত প্রভৃতি জনগণের সামনে তুলে ধরে। পাশাপাশি পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করে তোলার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে নতুন কমিটি গঠন ও পুরাতন কমিটিগুলোর পুনর্গঠন এবং সেগুলোকে কার্যকর করে তোলা, যে সকল স্থানে পার্টি অফিস নেই সেখানে নতুন অফিস তৈরিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এজন্য মণি সিংহসহ দলের সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক সফর শুরু করে।[১৪]

---

১৩. *কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৭২ সালের রাজনৈতিক রিপোর্ট।*
১৪. ১৯৭২ সালে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে দেশব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টির গণসংযোগ সংক্রান্ত একাধিক খবর বেরিয়েছিল।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় দেশ গড়ার লক্ষ্যে কতকগুলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তগুলো হ'ল ১. দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা; ২. বাস্তুহারা ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন; ৩. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; ৪. বন্ধ শিল্প কারখানাগুলো দ্রুত চালু করা ও অ-পুঁজিবাদী পথে শিল্পায়ন; ৫. ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার; ৬. নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্য কমানোর জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ; ৭. শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রসার ঘটানো; ৮. স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, শান্তিবাদী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ প্রভৃতি।[১৫]

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন না করলেও তাদের সরকার দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকার দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা প্রভৃতি জাতীয়করণ করা শুরু করে। ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র ইউনিয়নের ত্রয়োদশ জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় এবং তার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[১৬] প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> আমি আশা করি দেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ জনগণের মুক্তির পথে সমাজতন্ত্র কায়েম ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী শক্তি ও দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একযোগে লড়াই ও কাজ করে যাবে। তিনি বলেন, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা ঘোষণা করছি। একমাত্র সমাজতন্ত্রই জনগণের মুক্তি আনতে পারে। সমাজতন্ত্র ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সমাজতন্ত্রের জন্য যা যা প্রয়োজন করবো। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সাথে আমাদের মিল ও সদ্ভাব আছে। আমরা উভয়েই জনগণ ও সমাজতন্ত্রের জন্য কাজ করছি।[১৭]

---

১৫. ঐ।
১৬. *The Bangladesh Observer*, *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *সংবাদ*, ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।
১৭. *দৈনিক সংবাদ*, ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।

এ সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নূরুল ইসলাম বলেন,

> ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের মূল উদ্দেশ্য একই, আর তা হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আসুন এই অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমি আমার সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করতেও রাজি আছি। সরকারের জাতীয়করণ নীতির প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি।[১৮]

বঙ্গবন্ধু তথা আওয়ামী লীগ সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক-বীমা প্রভৃতি জাতীয়করণ করা শুরু করে। এসময় মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের চলমান কর্মসূচিগুলোকে সমর্থন ও এসব কর্মসূচিকে পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শন অনুসারে পরিচালনা করে দেশের জনসাধারণের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। ২২ এপ্রিল লেনিনের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে মণি সিংহ বলেন,

> মহান লেনিনের আদর্শ অনুসরণ করেই সরকার আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, কেবলমাত্র জাতীয়করণের মাধ্যমে দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করা যাবে না, সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য কৃষকের হাতে জমি দিতে হবে, কৃষকের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে লেনিনের পথ অনুসরণ করতে হবে। প্রতিটি মানুষের খাদ্য, আশ্রয়, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে না পারলে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লেনিনের আদর্শ অনুসরণ করা প্রয়োজন।[১৯]

লেনিনের জন্মবার্ষিকীতে দেওয়া এই বক্তব্যের মাধ্যমে মণি সিংহ তার এবং কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন অবস্থান পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন। এসময়

---

১৮. *দৈনিক সংবাদ*, ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।
১৯. *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ এপ্রিল, ১৯৭২।

কমিউনিস্ট পার্টির দর্শন ছিল যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তিনি ও তার দল সরকারের প্রতি প্রধানত সমর্থন ও সহযোগিতার পথ অনুসরণ করবে এবং তা যেন সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হয় এজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালাবে।

মণি সিংহ ও তাঁর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন অব্যাহত রাখেন। ২৩ এপ্রিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)-এর একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে এসে এক সপ্তাহ অবস্থান করে। তারা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার পর ২৮ এপ্রিল একটি যুক্ত ইশতেহার ঘোষণা করে।[২০] ইশতেহারে ১৯৬৯ সালের জুন মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত দলিলের প্রতি আনুগত্যের কথা পুনরায় ঘোষণা করা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে বাংলাদেশ, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ও মৈত্রীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তিকে উভয় দল অভিনন্দন জানায় এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ক্রমবর্ধমান ঐক্য লক্ষ্য করে তারা সন্তোষ প্রকাশ করে।[২১]

১৯৭২ সালের প্রথমার্ধে ছাত্রলীগের মধ্যে কোন্দল শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি বিভক্তি ও নতুন সংগঠন সৃষ্টি পর্যন্ত গড়ায়। ছাত্রলীগের কোন্দলের সুযোগে এবং পরবর্তীতে বিভক্ত হয়ে নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সৃষ্টি হওয়ার পর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ, জাসদ ও অন্যান্য দলগুলোর সমন্বয়ে একটি অলিখিত বিরোধী মোর্চা তৈরি হয় এবং তারা দেশে সরকার বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করলে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী ও বিভিন্ন অস্ত্রধারী গোষ্ঠীগুলো দেশে এক অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে মণি সিংহ দেশের চলমান পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে

---

২০. *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ এপ্রিল, ১৯৭২।
২১. ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট।

অব্যাহত রাখার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) ও আওয়ামী লীগের সমন্বয়ে সর্বদলীয় কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে ২৯ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ), মণি সিংহ ও আব্দুস সালাম (কমিউনিস্ট পার্টি), অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমেদ ও পংকজ ভট্টাচার্য (ন্যাপ) একটি বৈঠকে বসেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, রাজধানী থেকে শুরু করে থানা পর্যায় পর্যন্ত এই তিন দলের সদস্যদের নিয়ে ৭ সদস্য বিশিষ্ট (আওয়ামী লীগ ৩ জন, কমিউনিস্ট পার্টি ২ জন এবং ন্যাপ ২ জন) কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি সুষ্ঠুভাবে রিলিফ বিতরণ, দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তার তালিকা তৈরি এবং বিভিন্ন প্রকার সুপারিশ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করবে।[২২]

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে পল্টন মাঠে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় প্রায় লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতি ঘটে। উল্লেখ্য স্বাধীনতার পর আর কোন দলের আহ্বানে অনুষ্ঠিত জনসভায় এত বিপুল লোকের সমাবেশ ঘটেনি। জনসভায় পার্টির নেতৃবৃন্দ সরকার সম্পর্কে তাদের অবস্থান এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি তুলে ধরে। সভাপতির ভাষণে মণি সিংহ বলেন,

> বর্তমানের সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে কাটিয়ে উঠতে হলে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে। আওয়ামী লীগের ভিতর যে প্রতিক্রিয়াশীল দুর্নীতিবাজ শক্তি রয়েছে তার বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে এবং আওয়ামী লীগের ভিতর থেকে এই দুর্নীতিবাজদের সরাতে না পারলে কিছুই বাস্তবায়িত করা যাবে না। বঙ্গবন্ধু যত ভালো নীতিই গ্রহণ করুক না কেন দুর্নীতির ফুটো দিয়ে সব বের হয়ে যাবে। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য কৃষককে জমি দিতে হবে এবং বর্তমান প্রথা বাতিল করে বৈজ্ঞানিক ও সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু করতে হবে। শ্রমিকদেরকে সচেতন করতে না পারলে জাতীয়করণ নীতি বাস্তবায়িত হবে না। আমরা ধনিক ও বুর্জোয়া শ্রেণির গণতন্ত্র চাই না, আমরা শতকরা ৯৫ ভাগ কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের গণতন্ত্র চাই।[২৩]

২২. *দৈনিক সংবাদ*, ৩০ মে, ১৯৭২।
২৩. *Daily People*, 3 July, 1972.

সভায় জনাব আব্দুস ছালাম সরকারের প্রতি জমির সিলিং ১০০ বিঘা কার্যকরী করা ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার প্রদানের দাবি জানায়। সরকারের জাতীয়করণ নীতিকে সঠিক হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি এই নীতির বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। সেইসাথে তিনি ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ থেকে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অভিমত ব্যক্ত করেন।[২৪]

২৬ জুলাই মণি সিংহের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রতিনিধি দল সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-এর সোসালিস্ট ইউনিটি পার্টির আমন্ত্রণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির উদ্দেশে যাত্রা করে। মণি সিংহ ছাড়াও এ সফরে দলের অন্য সদস্যরা ছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম ও মোহাম্মদ ফরহাদ। তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা ও কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখা এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।[২৫]

১৯৭২ সালের শেষ দিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দুর্নীতি ও অরাজকতা মারাত্মক আকার ধারণ করে। দেশের এই সঙ্কটময় অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের প্রতি নিম্নলিখিত দাবিগুলো উত্থাপন করে :

১. অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে সকল দেশপ্রেমিক দলের সমন্বয়ে বৈঠক আহ্বান করে তার মাধ্যমে খাদ্য ও অর্থনৈকিত সঙ্কট সমাধানের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করা;
২. অবিলম্বে প্রতিটি শহর ও শিল্পাঞ্চলে রেশনিং ও গ্রামাঞ্চলে সংশোধিত রেশনিং নিয়মিত চালু করার পাশাপাশি দুস্থদের জন্য খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করা;

২৪. দৈনিক সংবাদ, ৩ জুলাই, ১৯৭২।
২৫. বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত কমরেড আব্দুস সালামের সাক্ষাৎকার, ১৮ আগস্ট, ১৯৭২।

৩. কালবিলম্ব না করে সরকারের প্রতিশ্রুত ন্যায্যমূল্যের দোকন খোলার পাশাপাশি বাজারে সকল দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া। প্রকৃত, সৎ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পারমিট প্রদানের পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্য সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা;

৪. সকল দেশপ্রেমিক দলগুলোকে নিয়ে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে দুর্নীতি, চোরাকারবারি, চোরাচালান, মজুতদারি প্রভৃতি বন্ধ করা এবং এসকল অভিযোগে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।[২৬]

স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলাদেশে প্রধানত যে সমস্যাগুলোর উদ্ভব হয় তার মধ্যে খাদ্য সঙ্কট, অর্থনৈতিক সঙ্কট, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি, ছাত্রলীগের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ কোন্দল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এরূপ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশল ছিল একদিকে নব গঠিত এই দেশের সার্বিক উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও পুনর্গঠমূলক কাজগুলোর ক্ষেত্রে সরকারকে সার্বিভাবে সহায়তা এবং এর পাশাপাশি সরকারের মধ্যকার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য জন-বিচ্ছিন্ন কাজের ক্ষেত্রে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা, বৈঠকের মাধ্যমে সরকারকে সচেতন করা, আলটিমেটাম এবং প্রয়োজনে আন্দোলন গড়ে তোলা।[২৭] কমিউনিস্ট পার্টি ও মণি সিংহ এই রণনীতিকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একাধিকবার বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠক করে রিলিফ বিতরণসহ সকল কার্যক্রমে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের সমন্বয়ে সর্বদলীয় কমিটি গঠনসহ কল কারখানা, ব্যাংক-বীমা প্রভৃতি জাতীয়করণের পরামর্শ প্রদান করে। বঙ্গবন্ধুর সরকার কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রস্তাবগুলোর কিছু কিছু বাস্তবায়নও করে, যার মধ্যে শিল্প কারখানা, ব্যাঙ্ক-বীমা জাতীয়করণ অন্যতম।[২৮] কিন্তু সর্বদলীয় কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অনীহা এবং কোন কোন স্থানে কমিটি গঠিত হলেও কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সদস্যদের মূল্যায়ন না করার প্রবণতা ছিল লক্ষণীয়। ২৫ আগস্ট বায়তুল মোকররমের দক্ষিণ গেটে কমিউনিস্ট পার্টির

---

২৬. ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের রিপোর্ট।

২৭. কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৭২ সালের রাজনৈতিক রিপোর্ট।

২৮. *দৈনিক সংবাদ*, ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।

গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। জমায়েতে মণি সিংহ সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্যে রাখতে গিয়ে বলেন,

> খাদ্য সমস্যা সমাধানে সরকার পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর চারটি নীতিকে সমর্থন করেছি, ব্যর্থতাকে নয়। লাখ লাখ মণ চাল বিদেশ থেকে আসছে কিন্তু দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারি ও মজুতদারদের জন্য সঙ্কট আরো প্রকট আকার ধারণ করছে। দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি ও সরকারের স্বজনপ্রীতির জন্য সরকার সঙ্কট মোকাবিলায় ব্যর্থ হচ্ছে।[২৯]

এসময় খাদ্য সঙ্কট ক্রমান্বয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। খাদ্য সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে সরকার খাদ্য-শস্য সংগ্রহ শুরু করলে মণি সিংহ এ বিষয়ে সরকারের নিকট সাত দফা সুপারিশ করেন। সুপারিশগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. দেশব্যাপী বাধ্যতামূলকভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা;
২. খাদ্যশস্য সংগ্রহে শুধুমাত্র সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের উপর নির্ভর না করে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও গণ-সংগঠনের সহযোগিতা গ্রহণ করা;
৩. জোতদার, বিত্তশালী কৃষক, চালকল মালিক ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করতে হবে। এলাকভিত্তিক উৎপাদিত ফসলের সাথে সামজস্য রেখে খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ নির্ধারণ করা;[৩০]
৪. সেচের আওতাভুক্ত এলাকা থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া;
৫. যাদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হবে তাদেরকে ন্যায্য ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান;
৬. যে সকল এলাকা থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হবে তা নিকটতম কোন গুদামে ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য গুদামজাত করা;
৭. খাদ্যশস্য সংগ্রহের সময় জনগণের সহযোগিতায় সীমান্তে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা।[৩১]

---

২৯. দৈনিক সংবাদ, ২৩ আগস্ট, ১৯৭২।
৩০. দৈনিক সংবাদ, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭২।
৩১. দৈনিক সংবাদ, ১৭ নভেম্বর, ১৯৭২।

১০ ডিসেম্বর মণি সিংহের নেতৃত্বে ঢাকায় স্বাধীনতাত্তোরকালের সবচাইতে বৃহৎ গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি এত বড় ছিল যে, এর যে কোন একটি স্থান অতিক্রম করতে এর প্রায় ৫৫ মিনিট সময় লেগেছিল।[৩২] এভাবে মণি সিংহ অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে স্বাধীনতার পরবর্তী এক বছরের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বাংলাদেশের একটি বৃহৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন

১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গণপরিষদ আদেশ জারির মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে গণপরিষদ গঠন করা হয়। ১০ এপ্রিল গণপরিষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শাহ আব্দুল হামিদকে স্পীকার ও মোহাম্মদ উল্লাহকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা হয়।[৩৩] ১১ এপ্রিল খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির ৩৪ জন সদসস্যের মধ্যে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছিলেন বিরোধী দলীয় একমাত্র সদস্য (ন্যাপ, মোজাফফর দলীয় সদস্য)। বাকি ৩৩ জন ছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য।[৩৪] কমিটি দীর্ঘ পরিশ্রমের পর ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করে। পরবর্তীতে এই খসড়া সংবিধানের উপর আলোচনা শুরু হয়। পাকিস্তান আমলে নিষিদ্ধ থাকার কারণে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ করতে না পারার কারণে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে গঠিত গণপরিষদে কমিউনিস্ট পার্টির কোন সদস্য ছিল না। গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের উপর আলোচনা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি সেই আলোচনায় অংশগ্রহণের কোন সুযোগ পায় নি। তাই কমিটি গঠনের পর থেকেই দেশে যাতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রতিফলন ঘটে এরূপ একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য মণি সিংহ ও কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন সময় সভা সমাবেশ, পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের মতামত তুলে ধরেন, যার অনেক কিছু সংবিধানে অন্তর্ভুক্তও হয়।

---

৩২. *দৈনিক সংবাদ*, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭২।

৩৩. হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, ১৭৫৭-২০০০*, (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স,২০০১), পৃ, ৩০৩।

৩৪. *The Bangladesh Observer* and *Daily People*, 12 April, 1972.

২৯ আগস্ট সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মণি সিংহ সংবিধান সম্পর্কে বলেন, "শাসনতন্ত্রে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে চাষযোগ্য জমি প্রদানের সুনির্দিষ্ট ধারা সন্নিবেশিত থাকতে হবে, তা না হলে সরকারের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেশ বর্তমানে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, কাজেই দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি থাকতে হবে।"[৩৫] ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান গণপরিষদের উত্থাপনের পর ১৮ অক্টোবর মণি সিংহ সম্পাদকমণ্ডলীকে নিয়ে খসড়া সংবিধানের উপর ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কতকগুলো প্রস্তাব প্রস্তুত করে তার কপি গণপরিষদ ও বঙ্গবন্ধুর নিকট পাঠানো হয়।[৩৬] সভা শেষে মণি সিংহ উপস্থিত সাংবাদিকদের এ বিষয়ে বলেন,

> গণপরিষদে যে খসড়া সংবিধান উত্থাপন করা হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি তাকে কোনভাবেই সমাজতান্ত্রিক সংবিধান হিসেবে মনে করে না। সমাজতন্ত্রের মর্মকথা হচ্ছে জমি, কলকারখানাসহ সমুদয় উৎপাদনের উপাদানগুলোর উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের উপর সমাজের শোষণ চিরতরে দূর করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় জাতীয় সম্পদের মালিক হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক তথা রাষ্ট্রের মেহনতি জনগণ। কিন্তু খসড়া সংবিধানে এসবের কোন বিধান নেই। কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমান গণপরিষদের কাছ থেকে এরূপ সংবিধান আশাও করে না। সংবিধানে যে চারটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে সেগুলো পূরণের ক্ষেত্রে সংবিধানে প্রদত্ত ধারাগুলো সহায়ক হবে কিনা তাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়।
>
> গণপরিষদে উত্থাপিত সংবিধানকে কমিউনিস্ট পার্টি একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান বলে বিবেচনা করে। কিন্তু খসড়া সংবিধানে এমন কতকগুলো ধারা-উপধারা রয়েছে যেগুলো অগণতান্ত্রিক, তাছাড়া এই বিলে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ নেই, যা জনকল্যাণের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। সার্বিক পরিস্থিতি

---

৩৫. *দৈনিক সংবাদ*, ৩০ আগস্ট, ১৯৭২।
৩৬. ১৯৭৩ *সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের রিপোর্ট* ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের সাক্ষাৎকার।

> বিবেচনা করে খসড়া সংবিধানকে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকর সংবিধানে পরিণত করার জন্য সংবিধান বিলটি সংশোধন করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ন্যূনতম কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করছে।[৩৭]

খসড়া সংবিধানের সমালোচনা করে কমিউনিস্ট পার্টি তাতে নিম্নোক্ত সংশোধনী দাবি করে এবং তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট প্রেরণ করে :

১. সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং অবাধ ধনতান্ত্রিক শোষণ উচ্ছেদের জন্য ১৪ নং ধারাটি সংশোধন করা অথবা নতুন একটি ধারা সংযোজন করা প্রয়োজন;
২. ১৩ নং ধারায় মালিকানা সম্পর্কে যে সকল কথা বলা হয়েছে তার সাথে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফা বণ্টনের বিষয়গুলো সংযোজন কিংবা নতুন ধারার মাধ্যমে প্রণয়নের ব্যবস্থা করা;
৩. সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে মূলনীতির মধ্যে 'সমাজ হতে দুর্নীতি দমনকে' মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা দরকার। পাশাপাশি সমাজ থেকে ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাকারবারি, মজুতদারি প্রভৃতি সমূলে বন্ধ করার জন্য সুস্পষ্ট বিধানের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
৪. সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী কোন জোট বা শিবিরের সাথে যোগ না দেওয়া, সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জোটগুলোর সাথে একত্রে কাজ করার বিষয়টিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা;
৫. প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, বিনামূল্যে ৭ বছর হতে ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ, বিনামূল্যে চিকিৎসা লাভ, কাজের জন্য যুক্তিসঙ্গত মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম ও অবকাশের অধিকার সম্বলিত বিষয়গুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা;
৬. জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়া, জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করা, ধর্মঘট করা প্রভৃতির অধিকার সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে সংযুক্ত করতে হবে;

---

৩৭. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭২।

৭. রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বিনা ক্ষতিপূরণে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, সাময়িকভাবে কিংবা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা বিষয়ের জন্য ৪৭ নং ধারাটি সংশোধন করা প্রয়োজন;

৮. প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার ক্ষমতা সংক্রান্ত বর্তমান বিল অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্ব লোপ পাবে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যকলাপ তার রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে তিনিই হবেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাই এই বিষয় সংক্রান্ত ৫৬ (৩), ৫৭ (২) ধারাটি সংশোধন করা প্রয়োজন। খসড়া সংবিধানের বিধান সংশোধন করে সংরক্ষিত ১৫ মহিলা সংসদ সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে সরাসরি জনগণের ভোটে। এজন্য প্রয়োজনে দেশকে মোট ১৫টি ভাগে ভাগ করে মহিলা সদস্যদের এলাকা নির্ধারণ করার জন্য ৬৫ নং ধারাটি সংশোধন প্রয়োজন;

৯. কোন রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার পর উক্ত সদস্য যদি পদত্যাগ করেন অথবা দলের আদেশ অমান্য করে আইনসভায় ভোট দেন তা হলে ৭০ (২) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে ৭০ (১) ধারাটি সংশোধন প্রয়োজন;

১০. ৭৬ (১) ধারায় সংসদ সদস্যদের নিয়ে কয়েকটি স্থায়ী কমিটি গঠনের যে বিধান রয়েছে এ গুলোর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাতের জন্য একটি স্থায়ী কমিটির উল্লেখ করতে হবে। এই কমিটি রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্প প্রভৃতির তদারক ও পরিচালনার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বৎসরে অন্তত একবার সংসদে রিপোর্ট প্রদান করবে;

১১. পরিশেষে কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, দেশের সংবিধানকে একটি যথার্থ, গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকর সংবিধানে পরিণত করার জন্য পার্টি যে সকল সংশোধনী ও সংযোজনী প্রস্তাব এনেছে গণপরিষদ তা গ্রহণ করলে এই গণতান্ত্রিক সংবিধান দেশের শ্রমিক, কৃষক তথা মেহনতি মানুষের মনে দৃঢ় আস্থা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি তথা সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর করে নেওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে।[৩৮]

---

৩৮. *দৈনিক সংবাদ*, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭২।

কমিউনিস্ট পার্টি মণি সিংহের নেতৃত্বে উল্লিখিত সংশোধনী ও সংযোজনী সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২৫ অক্টোবর দাবি দিবস পালন করে। ঐ দিন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ফার্মগেটের আনোয়ারা উদ্যান থেকে একটি মিছিল বের হয় এবং তা গণপরিষদের সামনে গিয়ে শেষ হয়। দাবি দিবসে মণি সিংহ পার্টি কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী ও সংযোজনী সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানায়।[৩৯] ২৭ অক্টোবর মণি সিংহ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেন এবং বঙ্গবন্ধুও এই বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন এবং যথাসম্ভব তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।[৪০]

মণি সিংহের মাধ্যমে উত্থাপিত কমিউনিস্ট পার্টির এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর গুরুত্ব স্বীকার করে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ২০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

> সংবিধান বিলের ওপর বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃত উত্থাপিত ১১টি সুপারিশের মধ্যে অন্তত ৬টি সুপারিশ সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগামীকাল আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বৈঠকে সংশোধনীগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং সম্ভব হলে সংশোধনীগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। কারণ এগুলো যুক্তিযুক্ত এবং বিবেচনাপ্রসূত।[৪১]

৪ নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান গৃহীত হয়। গৃহীত এই সংবিধানে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু আশ্বাস দেওয়ার পরও কমিউনিস্ট পার্টির উত্থাপিত সংশোধনী ও সংযোজনী সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলোর খুব কম সংখ্যকই গ্রহণ করা হয়েছে এবং যে দু-একটি গ্রহণ করা হয়েছিল তারও অনেক কাটছাঁট করা হয়। ফলে আওয়ামী লীগের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির যে অগাধ আস্থা ছিল স্বাভাবিকভাবেই তাতে কিছুটা হলেও ঘাটতির সৃষ্টি হয়। ৬ নভেম্বর কমিউনিস্ট

---

৩৯. *The Bangladesh Observer*, 26 October, 1972.
৪০. *দৈনিক সংবাদ*, ২৮ অক্টোবর, ১৯৭২।
৪১. *দৈনিক সংবাদ*, ২২ অক্টোবর, ১৯৭২।

পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর এক বৈঠকে সংবিধানে কমিউনিস্ট পার্টির মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়ার সমালোচনা করা হয়।[৪২] তারপরও নতুন এই সংবিধানকে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করে এবং এর যাতে অপপ্রয়োগ না হয় তার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৪৩] বৈঠকে সদ্য স্বাধীন এই দেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের স্বার্থে সংবিধানকে সমর্থন জানানো এবং সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়।

১৯৭৩ সালের নির্বাচন

বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে কমিউনিস্ট পার্টি তাকে স্বাগত জানায় এবং খুবই স্বল্প পরিসরে প্রতীকীভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এসময় মণি সিংহসহ সম্পাদকমণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ সমগ্র দেশব্যাপী রাজনৈতিক সফর শুরু করে এবং সফরকালে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যের মাধ্যমে দেশের খাদ্য পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনা ও সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য পরামর্শও প্রদান করে।

কমিউনিস্ট পার্টি এক ঘোষণায় জানায় যে, নির্বাচনে তাদের মোট ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। অন্য আসনগুলোতে তারা ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও আওয়ামী লীগের সৎ ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীদের ভোটদানের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানায়।[৪৪] নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থীরা ছিল (১) প্রসূনকান্তি রায় (বরুণ রায়), সিলেট-৯; (২) আব্দুস সাত্তার, চট্টগ্রাম-৪; (৩) শামছুদ্দোহা, রংপুর-২; এবং (৪) কামরুল হোসেন, দিনাজপুর-১।[৪৫] পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয় "স্বাধীনতার স্বল্প কালের মধ্যে দেশে নির্বাচন এসে পড়ায় পার্টি নির্বাচনে প্রতীকী অংশগ্রহণের অংশ হিসেবে এই চারটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" নির্বাচনে মণি সিংহ কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা

---

৪২. *সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিকের সাক্ষাৎকার*, তারিখঃ ১০ ডিসেম্বর ২০০৫।
৪৩. *দৈনিক সংবাদ*, ৭ নভেম্বর, ১৯৭২।
৪৪. আমজাদ হোসেন,*পূর্বোক্ত*, পৃ, ৫১।
৪৫. *দৈনিক সংবাদ*, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৩।

চালায়। তিনি পর্যায়ক্রমে চারজন প্রার্থীর এলাকায় গিয়ে সরকারের ব্যর্থতাগুলো তুলে ধরেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের ভোট প্রদানের জন্য বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরে তাদেরকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।[৪৬]

১৯৭৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টি ৪৮ দফা বিশিষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। ইশতেহারে ক্রমান্বয়ে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দেশের সকল দেশপ্রেমিক শক্তির ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা, সমাজ থেকে বৈষম্য দূরীকরণ, সমাজতান্ত্রিক দেশ ও জোটগুলোর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং গণপরিষদ প্রবর্তিত সংবিধানের মূলনীতিগুলোর সঠিক ও যথার্থ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।[৪৭] নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির মূল আওয়াজ ছিল, "দেশের শত্রুদের সমস্ত চক্রান্ত নির্মূল করে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বর্তমান সরকারের গণ ও কল্যাণকর কর্মসূচিকে সফলের মাধ্যমে দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর করা এবং স্বাধীনতাকে সংহত করার জন্য দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করা।[৪৮]

নেতৃত্ব পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ক ভালো হলেও ১৯৭২ সালের শেষ দিক থেকে মাঠ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ-সংগঠনগুলোর সাথে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটে। আওয়ামী যুবলীগ ও মুজিববাদী ছাত্রলীগের কর্মীরা কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ কর্মীদের উপর নির্যাতন চালায়। তারা দেশের বিভিন্ন জেলার ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ভস্মীভূত করে। কমিউনিস্ট পার্টি বিষয়গুলো নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে একাধিকবার আলাপ করলেও কোন লাভ হয়নি।

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থীরা বেশ বড় ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়। ৭ মার্চের এই নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:[৪৯]

---

৪৬. *দৈনিক সংবাদ*, ১৯, ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।
৪৭. *কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের নির্বাচনী ইশতেহার*।
৪৮. দৈনিক সংবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।
৪৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ মার্চ, ১৯৭৩।

১৯৭৩ সালের নির্বাচন চিত্র

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন
আওয়ামী লীগ	৩০০	২৯২
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	২৪৪	১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	২৩৬	১
ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	০
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৪	০
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১৩	১
স্বতন্ত্র	-------------	৪
মোট	৯৬৬	২৯৯

নির্বাচনের ফলাফলে কমিউনিস্ট পার্টি খুব বেশি অবাক হয়নি। কারণ খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরের সদস্যদের দুর্নীতি প্রভৃতির কড়া সমালোচনা করলেও তারা মনে প্রাণে চেয়েছিল নির্বাচনে যাতে আওয়ামী লীগ জেতে। ১০ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি এক বিবৃতির মাধ্যমে জনতার রায়কে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানায়। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মণি সিংহের নেতৃত্বে একটি দল বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানায়।[৫০]

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস

১৯৭৩ সালের ৪-৯ ডিসেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় ও স্বাধীনতার পর প্রথম কংগ্রেস ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০ টায় জাতীয় পতাকা ও পার্টির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কংগ্রেসের উদ্বোধন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পার্টির

---

* একজন প্রার্থী মারা যাওয়ায় ঐ আসনে নির্বাচন স্থগিত থাকে। পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হন।

৫০. দৈনিক পূর্বদেশ, ১১ মার্চ, ১৯৭৩ এবং দৈনিক সংবাদ, ২২ মার্চ, ১৯৭৩।

পতাকা উত্তোলন করেন মণি সিংহ।[৫১] সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়াসহ মোট ৭টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ এবং ন্যাপ (মোজাফ্ফর), আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ যোগদান করে। মোট ২৮টি দেশের বন্ধু প্রতিম কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠায়। কংগ্রেসে প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে যে প্রতিবন্ধকতাই আসুক না কেন বাংলাদেশের জনগণ সে বাধাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। যারা প্রগতির নামে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের অপব্যাখ্যা দিয়ে দেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলছে তাদের সম্পর্কে জনগণকে সচেতন থাকতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ও এই সকল ধ্বজাধারীরা শত্রুদের সাথে হাতে হাত মিলিয়েছিল। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এই চারটি মূল নীতির ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কারো নেই। এর ভিত্তিতেই দেশের পুনর্গঠন করা হবে। বাংলাদেশের জনগণ সর্বদাই বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের পাশে থাকবে।[৫২]

এছাড়াও বঙ্গবন্ধু ভিয়েতনাম ও গিনি বিসাউয়ের সংগ্রামী জনতার প্রতি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের নৈতিক সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন। বৈদেশিক নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির পাশাপাশি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী গড়ে তোলাই হচ্ছে বর্তমান সরকারের প্রধান নীতি।

সভাপতির ভাষণে মণি সিংহ বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা ও প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত রোধে বলশেভিক পার্টি ও মহান লেনিনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যা মোকাবিলার জন্য কর্মীদের আহ্বান জানায়। তিনি বলেন, আমাদের পার্টি যত ছোটই হোক না কেন,

---

৫১. *The Bangladesh Observer*, 5 December, 1973.
৫২. *দৈনিক বাংলা*, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

জনতার মধ্যে এর শিকড় রয়েছে। তাই মুসলিম লীগ, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া প্রমুখ অনেক চেষ্টা করেও একে ধ্বংস করতে পারে নি, বরং তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে।[৫৩] পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম তার রাজনৈতিক রিপোর্টে বলেন,

> যখন দেশের ৮৫ শতাংশ শিল্প, সমস্ত দেশীয় ব্যাঙ্ক ও ইন্স্যুরেন্স জাতীয়করণ করা হয়েছে, যখন পুঁজিবাদের অবাধ পথ রুদ্ধ করার জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশিরভাগ অংশ মুনাফালোভী বড় ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সরকারের হাতে নিয়ে আসা হয়েছে, যখন প্রগতিশীল ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ভূস্বামীদের জমির পরিমাণ সীমিত করে দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি এগুলো আমাদের দেশের জনগণের স্বার্থের অনুকূলে এবং বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ পদক্ষেপ।
>
> সরকার যে বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছে তা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি মহান সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশসমূহের সাথে বন্ধুত্ব, মহান প্রতিবেশী ভারতের সাথে মৈত্রী ও সহযোগিতার নীতি, দুনিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তিকামী শক্তিসমূহের সাথে সংহতির নীতি বাংলাদেশকে এক নতুন মর্যাদা দান করেছে।
>
> সরকারের উপরোক্ত নীতিসমূহকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি শুধু সমর্থনই করে না, এগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সরকারের এই নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে অপুঁজিবাদী বিকাশের পথে এ দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর করে নিতে সক্ষম হবে বলে কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।[৫৪]

পাঁচ দিনব্যাপী এই কংগ্রেসের তৃতীয় দিনে কমিউনিস্ট পার্টি তার রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে পার্টি পূর্বের মতই সরকারের গণমুখী কাজে

---

৫৩. *দৈনিক পূর্বদেশ* এবং *দৈনিক সংবাদ*, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।
৫৪. ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট।

সহযোগিতা ও জনবিরোধী কাজগুলোর বিরুদ্ধে গঠনমূলক সমালোচনা, মাওবাদীদের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্টের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন, প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের সমন্বয়ে গড়ে তোলা 'গণ ঐক্যজোটের' মাধ্যমে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, প্রশাসন থেকে দুর্নীতিবাজদের অপসারণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।[৫৫] প্রস্তাবে একটি মানবিক ও প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের জন্য সরকারকে আহ্বান জানানো হয়।[৫৬] কংগ্রেসে মণি সিংহকে সভাপতি এবং মোহাম্মদ ফরহাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির এই কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের অভ্যন্তরীণ রণকৌশল, বৈদেশিক নীতিসহ কোন ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আনে নি। এই সম্মেলন ছিল ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত কৌশল বা সিদ্ধান্তসমূহের একটি আনুষ্ঠানিক অনুমোদন, কেবলমাত্র পূর্বের কমিটির বদলে একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (মোজাফ্ফর) সরকারকে সহযোগিতার যে নীতি গ্রহণ করেছিল ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের মাধ্যমে ন্যাপ তার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন নেওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টি এই কংগ্রেসের মাধ্যমে তাদের পূর্বের নীতিকেই অনুসরণ করেছিল মাত্র।

১৯৭৪ সালের জাতীয় সঙ্কট

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার দেশীয় ব্যাংক, বীমা, পাট ও বস্ত্র, চিনি শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশিরভাগ অংশ, শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বিমান ইত্যাদি জাতীয়করণের ঘোষণা করলে কমিউনিস্ট পার্টি একে স্বাগত জানায়। সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী এক বিবৃতিতে বলেন, "সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা রাজনৈতিক জাতীয় স্বাধীনতা পেয়েছি। রাজনৈতিক এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে প্রয়োজন অর্থনৈতিক মুক্তি। বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক মুক্তি

---

৫৫. ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব পৃ, ৫২।
৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

তথা জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। ফলে সামাজিক বিপ্লবের উপাদানসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারকে সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ বিপ্লবের এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের সমাজ বিপ্লবের এই প্রগতিশীল কর্মসূচি ও পদক্ষেপকে সমর্থন করে এবং এর বাস্তবায়নের সকল সহযোগিতা দিতেও প্রস্তুত।"[৫৭] সরকারের জাতীয়করণ কর্মসূচিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (মোজাফ্ফর) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ বিশ্বের পঞ্চদশতম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে।[৫৮]

এসময় খাদ্য সঙ্কট, দুর্নীতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটতে থাকলে ১৯৭৩ সালের ৭ জুন বঙ্গবন্ধু দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায় এবং ১৪ অক্টোবর আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে ত্রি-দলীয় জোট বা গণ ঐক্য জোট গঠিত হয়।[৫৯] এই জোটের সদস্য ছিল ১৯ জন, যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি ছিল ৩ জন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা হলেন আব্দুস সালাম, মোহাম্মদ ফরহাদ ও সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিক। গণ ঐক্যজোটের ঘোষণায় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয় এবং জোটের মূল লক্ষ্য ছিল দেশে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সঙ্কট মোকাবলা করা।[৬০]

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর গণ ঐক্যজোটের ব্যানারে কমিউনিস্ট পার্টি নতুন উদ্যোমে কাজ শুরু করে। এ সময় গণ ঐক্যজোট বিরোধী দল ও ভিন্ন মতাবলম্বী কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, বিদেশী অনুচর ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়। এ বিষয়ে ১৯৭৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটের এক

৫৭. *কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৭২ সালের রাজনৈতিক রিপোর্ট।*

৫৮. বঙ্গবন্ধুর ৫৩ তম জন্মদিবস উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি অফিসের অনুষ্ঠানে মণি সিংহ এই বক্তব্য প্রদান করেন, যা ১৭ মার্চ, ১৯৭৩ সালের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৫৯. *The Bangladesh Observer*, 15 October, 1973.

৬০. আমজাদ হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ, ৫২।

গণজমায়েতে মণি সিংহ বলেন,

> বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য মওলানা ভাসানীর সমর্থক চীনের মাওবাদী এবং রববাদীরা বর্তমানে বেশ তৎপর। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যেসব রাষ্ট্র বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন যুগিয়েছিল সে সকল রাষ্ট্র বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের বিরুদ্ধে এরা কুৎসা প্রচার করছে। ভাসানী ও রবরা যদি তাদের বর্তমান কার্যক্রম থেকে সরে না আসেন এবং তাদের এই অপপ্রচার বন্ধ না করেন তবে তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে।[৬১]

গণ ঐক্যজোটের পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নিজস্ব প্লাটফরমের মাধ্যমেও বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে। যার মধ্যে সরকারকে উন্নয়নমূলক পরামর্শ প্রদান, দেশের চলমান খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দেশের চলমান খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলা এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ১ জানুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি যৌথভাবে সরকারকে ৫ দফা সুপারিশ প্রদান করেন। সুপারিশের মাধ্যমে তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ, কৃষকদের পর্যাপ্ত কৃষি বীজ সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিদেশ থেকে সেচ পাম্প আমদানি, প্রতি থানায় মেরামতি কারখানা স্থাপন এবং বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়।[৬২]

১৯৭৪ সালের শুরু থেকেই দেশে একের পর এক সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। মে মাসের দিকে সমস্যাগুলো আরো প্রকটাকার ধারণ করলে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি ও খাদ্য সঙ্কটের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। এসময় কমিউনিস্ট পার্টি দেশে সম্ভব্য দুর্ভিক্ষেরও আশঙ্কা করে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এক সভার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় সরকারকে পূর্বের সহায়তা প্রদানের নীতিতে অনড় থাকে। যদিও তাদের কোনো পরামর্শই বঙ্গবন্ধুর সরকার

৬১. *দৈনিক সংবাদ*, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ এবং *গণকণ্ঠ*, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।
৬২. *দৈনিক জনপদ* এবং *The Daily Morning news*, 2 January, 1974.

তেমন একটা গুরুত্বের সাথে নিত না। সভায় আওয়ামী লীগের একাংশের দুর্নীতির সমালোচনা করে তদন্তের মাধ্যমে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান জানান এবং গণ ঐক্যজোটকে কার্যকরী না করার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করে দেশের স্বার্থে গণ ঐক্যজোটকে কার্যকরী করার কথা বলা হয়।[৬৩]

৮ জুন কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণি সিংহ দেশের বাজেট সংক্রান্ত এক বক্তব্যে দেশের সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে উত্তরণ ও অর্থনীতিকে সচল করার জন্য জোতদার মহাজন তথা ধনিক শ্রেণির উপর বাজেটের মাধ্যমে উচ্চহারে কর আরোপের সুপারিশ করেন। গণ ঐক্যজোটকে কার্যকরী না করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সরকার ব্যর্থ হচ্ছে, গণ ঐক্যজোটকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। সরকার নিজ দলীয় সদস্যদের একাংশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনই ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।"[৬৪] ১৯৭৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল একদিকে পার্টির সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি ও সার্বিক সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

জুলাই মাসে দেশে বন্যা শুরু হলে খাদ্য সঙ্কট আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং দেশ নিশ্চিতভাবে এক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে যায়। কিন্তু এরপরও সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চোখে পড়েনি। কমিউনিস্ট পার্টিও মৃদু সমালোচনার বাইরে সরকারের উপর আশু সঙ্কট মোকাবিলায় তেমন কোন চাপ প্রদান করেনি। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি খাদ্যাভাবের কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটতে শুরু করে।[৬৫] কমিউনিস্ট পার্টি এসময় বন্যার্ত এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের সঙ্কট মোকাবিলায় এককভাবে কাজ শুরু করে। তাদের কাজ মূলত দুর্ভিক্ষ পীড়ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অর্থাৎ নগদ অর্থ, রুটি ও অন্যান্য খাদ্য, বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র, ধানের বীজ, চারা প্রভৃতি সংগ্রহ ও তা দুর্গত এলাকায় বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।[৬৬] কিন্তু কার্যকর কোন

৬৩. *কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৭৪ সালের রিপোর্ট।*

৬৪. *দৈনিক সংবাদ*, ৯ জুন, ১৯৭৪।

৬৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ জুলাই, ১৯৭৩।

৬৬. কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত '*বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সহায়তায় এগিয়ে আসুন*' শীর্ষক লিফলেট।

বিরোধী দলের অনুপস্থিতে এরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির যে ভূমিকা প্রত্যাশা করেছিল পার্টি তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়।

দেশের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ১৯৭৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পাঁচ দিনব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টির এক কর্মী সমাবেশ শুরু হয়। কর্মী সমাবেশের উদ্বোধন করেন পার্টির সভাপতি মণি সিংহ। সভাপতির ভাষণে মণি সিংহ বলেন,

> দেশে আজ এক গভীর সঙ্কট চলছে। কোন উপায়ে এই সঙ্কট নিরসন করা যাবে? কোন উপায়ে দেশ গড়া যাবে, তা প্রতিটি কমিউনিস্ট কর্মীকে জেনে নিয়ে কল-কারখানা, গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে হবে। সবখানে পার্টির ঝাণ্ডা তুলে ধরতে হবে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপসহ সকল সৎ ও দেশপ্রেমিক শক্তি এবং কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, যুবক সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব পার্টি কর্মীদের গ্রহণ করতে হবে। যত কঠিন ত্যাগই স্বীকার করতে হোক না কেন, পার্টিকে এই দায়িত্ব পালন করে দেশকে গড়ে তুলে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে।[৬৭]

কর্মী সমাবেশের শেষ দিনে দেশের চলমান দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করার এবং সরকারকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৬৮] কর্মী সমাবেশের পর ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর তিন দিনব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার রাজনৈতিক রিপোর্টে বলা হয়, "দেশের চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কট, সরকারের নানারূপ দুর্বলতা ও ব্যর্থতা, প্রগতিবিরোধী ও গণবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর চক্রান্তমূলক কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে দেশে আজ গভীর সঙ্কট বিরাজ করছে। সরকার কেবলমাত্র শাসক দল আওয়ামী লীগ ও প্রশাসন যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল থেকে প্রচলিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মাধ্যমে সঙ্কট মোকাবিলা করে দেশকে অগ্রগতির পথে নিতে পারছে না। তাই অনতিবিলম্বে দেশের রাজনৈতিক প্রশাসন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা একান্ত জরুরি।"[৬৯] অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় দেশের জনগণকে এগিয়ে

---

৬৭. *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।

৬৮. কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত '*বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সহায়তায় এগিয়ে আসুন*' শীর্ষক লিফলেট।

৬৯. *কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৭৪ সালের রাজনৈতিক প্রস্তাব।*

আসার আহ্বান জানিয়ে সরকারের প্রতি কতকগুলো দাবি জানিয়ে তা জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর করার আহ্বান জানানো হয়। দাবিগুলো ছিল:

১. পুরো নভেম্বর মাস লঙ্গরখানা চালু রাখা। সিলেট ও ময়মনসিংসহ কৃষি এলাকাগুলোতে তা ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা;
২. অবিলম্বে টেস্ট রিলিফের কাজ ব্যাপকভাবে চালু করা;
৩. কল-কারখানা, রেলসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিম্ন বেতনভুক্তদের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু করা;
৪. দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকার যে সকল কৃষক স্বল্পমূল্যে জমি বিক্রয় করেছে তার হস্তান্তরকে অবৈধ ঘোষণা করে বিক্রয়কারী কৃষকরা যাতে ধীরে ধীরে টাকা পরিশোধ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা;
৫. যে সকল গরিব কৃষক কম দামে জমির অকাটা ফসল অগ্রিম বিক্রয় করেছে সেক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৭০]

এছাড়া খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের অভ্যন্তর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে পর্যাপ্ত মজুদ গড়ে তোলা, খোলা বাজারে চাল বিক্রয়ে ক্ষেত্রে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, জোতদার ও ধনী কৃষকদের উপর বাধ্যতামূলক লেভী ধার্য এবং তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা এবং ফসল কাটার সময় প্রান্তিক কৃষকদের নিকট থেকে সরকারিভাবে উপযুক্ত মূল্যে ধান-চাল ক্রয়ের মাধ্যমে দেশের চলমান খাদ্য সঙ্কটের একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য সুপারিশ করা হয়।[৭১]

বাকশাল গঠন ও কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৭৪ সালের শেষের দিকে থেকে কমিউনিস্ট পার্টি খাদ্য সঙ্কট, দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে কিছুটা সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে। দেশের বিভিন্ন সভা সমাবেশে তারা সরকারের কঠোর সমালোচনা করা শুরু করে এবং সরকারের কাঠামো পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধুর নের্তৃত্বে সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানায়।[৭২] ১৯৭৪ সালের ১৭ নভেম্বর বায়তুল মোকাররম সংলগ্ন এক গণজমায়েতে মণি

৭০. দৈনিক সংবাদ, ২৮ অক্টোবর, ১৯৭৪।
৭১. *কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৭৪ সালের রাজনৈতিক প্রস্তাব।*
৭২. ১৯৭৪ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত পত্রিকাগুলিতে 'চলমান সরকার ভেঙ্গে দিয়ে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলির সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান' সংক্রান্ত একাধিক খবর বেরিয়েছিল।

সিংহ বলেন, দেশে বর্তমানে যে সংসদীয় গণতন্ত্র চলছে তা হচ্ছে চোরাকারবারি, মজুতদার, মুনাফাখোর, কালোবাজারি আর কালো টাকার গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকে ভেঙ্গে চুরমার করে কৃষক, শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের সাচ্চা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেন, "আপনি কৃষক, শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের স্বার্থে যে পরিবর্তন আনবেন আমরা তাকে সমর্থন করব। কিন্তু জোতাদার, মজুতদার, কালো টাকার মালিকদের গণতন্ত্র আমরা কোনক্রমেই সমর্থন মানব না।"[৭৩]

প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারের রূপরেখা প্রদান করতে গিয়ে ১৯৭৪ সালের ২২ ডিসেম্বর পল্টনের এক জনসভায় মণি সিংহ বলেন, "জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভা থাকবে এবং সরকারও থাকবে। আইসভা চাইলেই সরকার পরিবর্তন করতে পারবে না, তারা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ করবেন মাত্র। আর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সরকার দেশ পরিচালনা করবে।"[৭৪] কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা এসময় বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক সফরে গিয়ে প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারের পক্ষে তাদের মতামত তুলে ধরে এই দাবির পক্ষে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা চালায়।

ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার জাতীয় সরকারের অনুরূপ বাকশাল গঠনের রূপরেখা প্রদান করলে মণি সিংহ তার বিরোধিতা করে এবং কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাবিত বাকশালে যোগদান করবে না বলে জানিয়ে দেয়। তবে পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রস্তাবিত বাকশালে যোগদানের পক্ষে ছিল।[৭৫]

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল গঠনের পর তাতে যোগদান প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টিতে স্পষ্টত দুটি মতের উদ্ভব হয়। একটি ছিল বঙ্গবন্ধু বাকশালের মাধ্যমে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, সুতরাং বাকশালে

---

৭৩. *দৈনিক সংবাদ*, নভেম্বর ১৮, ১৯৭৪।

৭৪. *The Bangladesh Observer*, 23 December, 1974

৭৫. মনজুরুল আহসান খান, "মণি সিংহ কালের বিবেক, আমাদের অহংকার" কমরেড মণি *সিংহ স্মারকগ্রন্থ*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ, ৪৬।

যোগদানের মাধ্যমে সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব।' তারা এটিকে 'শোষিতের গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করে। মোহাম্মদ ফরহাদসহ এই মতের অনুসারী পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলুপ্ত করে নবগঠিত বাকশালে যোগদানের পক্ষে ছিল। অন্য দিকে মণি সিংহসহ কয়েকজন প্রবীণ নেতা বাকশালের বাইরে থাকা, অতি গোপনে পার্টির একটি গোপন কেন্দ্র খোলা রাখা এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গোপনে পার্টির কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত প্রদান করে।[৭৬] বিষয়টি নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় ব্যাপক আলোচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিষয়টি ভোটে দেওয়া হয়। ভোটে মণি সিংহের মতাদর্শানুসারীরা হেরে যায়। ফলে সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় মোহাম্মদ ফরহাদ, আব্দুস সালামসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা বাকশালে যোগদানের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মণি সিংহ তাতে সম্মতি দেয়। তবে বাকশালে যোগদান করে প্রকাশ্যভাবে পার্টির বিলুপ্তি ঘোষণা করার পর অতি গোপনে পার্টির একটি সংকুচিত কাঠামো বহাল রাখার বিষয়ে সকলে একমত হয়।[৭৭]

সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বাকশাল গঠনের পর কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে তাদের সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে বাকশালে যোগদান করে। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে পার্টির পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ফরহাদকে বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মনোনীত করা হয় এবং তিনি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত বাকশালে যোগদান করেন।[৭৮] বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গঠিত একটি মাত্র জাতীয় দলের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনাকে কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখেছিল। ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে আয়োজিত এক সভায় মোহাম্মদ ফরহাদ বলেন,

> জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটি মাত্র জাতীয় দলের মধ্যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে একত্রিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তোলার মাধ্যমেই দেশের সার্বিক সঙ্কট দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে

---

৭৬. হায়দার আকবর খান রনো, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩৪-৩৫।
৭৭. সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিকের সাক্ষাৎকার, তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০০৫।
৭৮. *কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৮০ সালের রাজনৈতিক রিপোর্ট।*

> প্রগতির ধারাকে এগিয়ে নেওয়া ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব।... বাংলাদেশে বর্তমানে যে বিপ্লবী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা সূচনা মাত্র, একে সকল শক্তি দিয়ে সফল পরিণতিতে পৌঁছাতে হবে।[৭৯]

সম্পাদকমণ্ডলীর সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির বিলুপ্তি ঘটিয়ে বাকশালে যোগদান করা হলেও অতি গোপনে কিছুটা সংকুচিত আকারে পার্টির একটি সাংগঠনিক কাঠামো বজায় রাখা হয়।[৮০] কিছু সংখ্যক ক্ষমতালোভী উচ্চাভিলাষী সেনা কর্মকর্তা ও সেনা সদস্য কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বাকশাল কার্যকরী ছিল এবং মোহাম্মদ ফরহাদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে বহাল ছিলেন। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটিয়ে বাকশালে যোগদানের ফলে পার্টির প্রকাশ্য কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং পার্টির নেতা-কর্মী, সভ্যদের অনেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

৭৯. দৈনিক সংবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫।
৮০. *কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৮০ সালের রাজনৈতিক রিপোর্ট*।

সপ্তম অধ্যায়

একদল ক্ষমতালোভী উচ্চাভিলাসী সেনা কর্মকর্তার হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নিহত হন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই সাথে নব্য স্বাধীন এই বাংলাদেশের গণতন্ত্রেরও মৃত্যু ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অভ্যুত্থানকারী ক্ষমতাসীন সেনা সদস্যরা তাদের ক্ষমতাকে বেশিদিন দীর্ঘায়িত করতে পারেনি। অভ্যুত্থান আর পাল্টা অভ্যুত্থানের একপর্যায়ে ক্ষমতায় আসেন জেনালের জিয়াউর রহমান। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সেনাবাহিনীর একাংশের হাতে জেনারেল জিয়ারও মৃত্যু ঘটে। আবারও শুরু হয় অস্থিরতা। আবারও মৃত্যু ঘটে তথাকথিত গণতন্ত্রের। ক্ষমতায় আসে সেনা প্রধান জেনারেল এরশাদ। অনেক আন্দোলন, অনেক রক্ত, অনেক তাজা প্রাণের বিনিময়ে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। এরপর একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক সরকার।

১৯৭৫-৯০'-এই দীর্ঘ ১৫ বছর বাংলাদেশ কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে সেনা শাসনের অধীন ছিল। এসময় সেনা শাসকগণ ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ও মূল্যবোধগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র থেকে রক্ষণশীল তথাকথিত মডারেট মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয় বাংলাদেশ। জেনারেল জিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা থেকে বাংলাদেশকে নিয়ে আসেন ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পথে। সেই সাথে ব্যবস্থা করে দেন রাষ্ট্রীয় সম্পদের অবাধ লুণ্ঠনের। রাতারাতি গড়ে উঠে লুটেরা ধনিক শ্রেণি, যাদের সম্পদ অর্জিত হয়েছিল অবৈধ ও অনৈতিক পথে। জেনারেল এরশাদের শাসনামলও ছিল জেনারেল জিয়ার অনুসৃত একই পথ। তিনি আরো একধাপ এগিয়ে দেশকে সাংবিধানিকভাবে একটি রক্ষণশীল ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালান।

সামরিক শাসন ও কমিউনিস্ট পার্টি

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হতে থাকে। সেনা অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, রাজনীতিতে হত্যা, গুপ্ত হত্যা ও ষড়যন্ত্র প্রাধান্য পায়। সেনাবাহিনীর পদচ্যুত ও লোভী কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার চক্রান্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অবসান ঘটে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাজনীতির। আওয়ামী লীগ শাসনের অবসান ঘটার কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হয়। নিজ পরিকল্পনায় জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় আসেন নি। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের একাংশের সেনা-অভ্যুত্থান ঘটানোর এক ব্যর্থ চেষ্টার ফলে তিনি ক্ষমতাসীন হন। তাঁর ক্ষমতায় আসার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছিল সেনা-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নায়ক জাসদ নেতা কর্নেল তাহের। প্রথম পর্যায়ে জেনারেল জিয়া নিজেকে সামরিক আইন প্রশাসক ও বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।

জেনারেল জিয়া ১৯৭৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করে।[১] এই ঘোষণার পরপরই কমিউনিস্ট পার্টি ঘরোয়াভাবে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে। এসময় সিপিবি জিয়া সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপের স্বপক্ষে ইতিবাচক এবং সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৭ সালের ৪ জানুয়ারি ময়মনসিংহ শহরে কমিউনিস্ট পার্টির এক আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিষ বসু 'সরকারের পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের খাল খনন কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়ে এই প্রকল্পে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানায়। পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সদস্যরা এই প্রকল্পের কার্যক্রমে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করবে বলে তিনি ঘোষণা দেন।'[২]

---

১. *দৈনিক সংবাদ*, ২ জানুয়ারি, ১৯৭৭।
২. *The Daily Observer*, 12 January, 1977.

ঘরোয়া রাজনীতির সময় কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনকে পূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করে পুনরায় কার্যক্রম শুরু করে। এসময় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন জেলাগুলোতে রাজনৈতিক সফর শুরু করে এবং বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বেকার কমিটিগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনে সেগুলোকে সুসংগঠিত করার চেষ্টা চালায়। ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেনারেল জিয়ার মূল্যায়ন করে বলা হয়, 'জিয়া সামরিক শাসকের পদ গ্রহণ করায় স্বাধীনতা নস্যাৎ হওয়ার তথা চরম প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার বিপদ হ্রাস পেয়েছে।"[৩] সভায় জিয়া সরকারের সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপর নির্ভরশীলতা বিবেচনায় নেওয়া হলেও এই সরকারের সম্ভাবনার দিকগুলো বাড়তিভাবে সামনে নিয়ে আসা হয়। এ বিষয়ে পরে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা নূরুল ইসলাম মন্তব্য করেন, "জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পার্টিকে জটিল পরিস্থিতিতে আইনি-বেআইনি কাজের সমন্বয় সাধন ও এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রশ্নে কৌশল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে অগ্রসর হতে হয়েছে। কোন কোন সময় তাৎক্ষণিক ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সঠিক কৌশল গ্রহণে দুর্বলতা রয়ে গেছে।"[৪] কমিউনিস্ট পার্টি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করে। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমানের আস্থাবাচক হ্যাঁ, না ভোটের সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (মোজাফ্ফর) হ্যাঁ বাচক ভোট দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়।[৫]

এতকিছুর পরও জেনারেল জিয়াউর রহমান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বিন্দুমাত্র সদয় ছিল না। ১৯৭৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বগুড়া এবং ২ অক্টোবর ঢাকা সেনানিবাসে দুটি সেনা বিদ্রোহ ঘটে। এই সেনা বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জিয়া সরকার ১৪ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি ৭৬ বছর বয়স্ক মণি সিংহ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের আটকাদেশ দেয়।[৬]

---

৩. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির *রাজনৈতিক প্রস্তাব* ১৯৭৭।

৪. নূরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০ বছর*, (ঢাকা :জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ, ৬৬।

৫. হায়দার আকবর খান রনো, *শতাব্দী পেরিয়ে*, (ঢাকা: তরফদার প্রকাশন, ২০০৫), পৃ, ৩৬২।

৬. কমরেড মঞ্জুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার, তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

সাত মাস আটক রাখার পর বার্ধ্যকের বিষয় বিবেচনা করে মণি সিংহকে মুক্তি দেওয়া হলেও মোহাম্মদ ফরহাদের আটকাদেশ বহাল থাকে। পরবর্তীতে হাইকোর্ট এই আটকাদেশকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলে মোহাম্মদ ফরহাদও মুক্তি পায়। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং মণি সিংহ ও মোহাম্মদ ফরহাদের গ্রেফতারের ফলে জেনারেল জিয়াউর রহমান সম্পর্কে সরকারের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৮ সালের ৩ জুনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ, জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও গণআজাদী লীগকে নিয়ে যে 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট' গঠন হয় নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি উক্ত জোটের মনোনীত প্রার্থী জেনারেল ওসমানীকে সমর্থন প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, এই জোট গঠন থেকে শুরু করে জোটের প্রার্থী মনোনয়নসহ সকল ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি ও মণি সিংহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও শুধুমাত্র নিষিদ্ধ থাকার কারণে তারা পার্টির নিজস্ব নামে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। নির্বাচনে জিয়াউর রহমান মোট ১,৫৮,১৪,০৭২ ভোট শতকরা হিসাবে ৭৬.৬৭ শতাংশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট প্রার্থী কর্নেল এ জি এম ওসমানী পান ৪৪,৭৭,৬৭০ ভোট শতকরা হিসাবে ২১.৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।[৭]

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছুটা ইতিবাচক উন্নতি ঘটে। এসময় বিভিন্ন মহল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য গণ-স্বাক্ষর অভিযান পরিচালিত হয় এবং ১,৩০,১৩২ জন পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য স্বাক্ষর প্রদান করে। পাশাপাশি দেশের ৩৪টি অ্যাডভোকেট বার থেকে ১,৫৮৯ জন অ্যাডভোকেট কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানায়।[৮] অবশেষে ১৯৭৮ সালের ১৮ নভেম্বর সরকার কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।[৯]

---

৭. হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, ১৭৫৭-২০০০*, (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স ২০০১), পৃ, ১২১।

৮. "জনগণের দাবি: কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর," অক্টোবর ১৪, ১৯৭৮ তারিখে কমিউনিস্ট পার্টির সাংবাদিক সম্মেলনে মোহাম্মদ ফরহাদ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ ও পরে তা দলকর্তৃক প্রকাশিত।

৯. *The Daily Observer, Daily Morning News, Daily People* এবং *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ অক্টোবর, ১৯৭৮।

১৯৭৮ সালের ৩০ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে জিয়াউর রহমান পরবর্তী বছরের ২৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।[১০] পরবর্তীতে দুই দফা পিছিয়ে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে দেশে চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দিদের মুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, একতাসহ বিভিন্ন পত্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, কমিউনিস্ট পার্টির সভা-সমাবেশগুলোতে পুলিশি হামলা বন্ধসহ কতিপয় দাবি উত্থাপন করে এবং এই দাবিসমূহ মেনে নেওয়া না হলে কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা দেয়। পরবর্তীতে সরকার কিছু কিছু দাবি মেনে নিলে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নির্বাচনে প্রতীকী অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১১ জন প্রার্থী দাঁড় করায়। নির্বাচনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে মণি সিংহ বলেন, "গণ আন্দোলন ব্যতীত দেশের জনগণের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে না। সে কারণে দেশে বড় রকমের একটি গণ আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। এ জন্য তিনি পার্টি কর্মীদের প্রস্তুত থাকার জন্য আহ্বান জানান।"[১১] তিনি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর দেশ পশ্চাৎপসরণ করেছে। আমাদের এই পশ্চাৎপসরণ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে।"

নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির যে সকল সদস্য অংশগ্রহণ করেছিল তারা হলেন (১) কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ, দিনাজপুর-২; (২) সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিক, ঢাকা-১৫ (রমনা ও মতিঝিল); (৩) মোঃ দবিরুল ইসলাম, দিনাজপুর-৪; (৪) আব্দুস সাত্তার, বগুড়া-৭; (৫) জিতেন দত্ত, রংপুর-৮; (৬) শেখ মুনিরুজ্জামান, খুলনা-৭; (৭) মৃণাল বাড়ুরী, ফরিদপুর-১১; (৮) প্রসূন কান্তি রায়, সিলেট-২; (৯) শেখ মোঃ আব্দুল হাই, নোয়াখালী-৬; (১০) আব্দুস সাত্তার, চট্টগ্রাম-৬ এবং (১১) মোহাম্মদ মুছা, চট্টগ্রাম-১৩।[১২]

---

১০. *The Daily Observer, Daily Morning News, Daily People, দৈনিক সংবাদ* এবং *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

১১. *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ জানুয়ারি, ১৯৭৯।

১২. *দৈনিক সংবাদ*, ৯ জানুয়ারি, ১৯৭৯ এবং *সাপ্তাহিক একতা*, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।

কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়,

> নির্বাচনে পার্টির লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের ভিতর ও বাইরে স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, উগ্র হটকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ সকল শক্তিকে পরাজিত করা। .....পার্টির অবিরাম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বর্তমান দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ নয়। আওয়ামী লীগ এক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারেনি।..... কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় গেলে প্রতিটি নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করা এবং ধর্ম পালনে রাষ্ট্র হতে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে এখনোই দেশবাসীর জরুরি দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। .....১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং জেল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার করার ব্যবস্থা করবে।[১৩]

দেশের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল অনেকটা মিত্রহীন। ১৫ আগস্টের পর থেকে আওয়ামী লীগের ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দেশের চলমান রাজনীতি ও জোট গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক সভা হলেও তা কার্যকর কোন রূপ লাভ করেনি। নির্বাচনের পূর্বে মণি সিংহ ও কমিউনিস্ট পার্টি জিয়াউর রহমান ও তার সরকারের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। এমনকি খোদ জিয়াউর রহমান নির্বাচনী প্রচারাভিযানকালে কুষ্টিয়ার এক জনসভায় মণি সিংহ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে ব্যাপক কটূক্তি করলে পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রতিবাদ জানায়।[১৪] মূলত ১৯৭৭ সালের শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা, খাল খননসহ বিভিন্ন কার্যক্রমকে সমর্থন করার পরও জিয়া সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং মণি সিংহ ও মোহাম্মদ ফরহাদকে গ্রেফতার করলে জিয়া সম্পর্কে মণি সিংহ ও কমিউনিস্ট পার্টি আশাহত হয়। তারা জিয়া সরকারের সমালোচনা শুরু করে, যা জিয়াউর রহমান মেনে

---

১৩. "দেশবাসী ও ভোটারদের প্রতি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন", শীর্ষক প্রচারপত্র, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৯ এবং *দৈনিক সংবাদ*, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৭৯।
১৪. *দৈনিক সংবাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।

নিতে পারেনি। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে পার্টির সভাপতি মণি সিংহের তৎপরতা খুব একটা বেশি ছিল না। বয়সের কারণেই এটি ঘটেছিল, তাছাড়া এসময় তিনি ছিলেন ডায়াবেটিকসের রোগী। তারপরও ১১ জন প্রার্থীর সকলের এলাকাতেই অনুষ্ঠিত জনসভাগুলোতে পার্টির প্রার্থীদের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করে বক্তব্য রেখেছিলেন। ৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে এক নির্বাচনী জনসভায় মণি সিংহ বলেন,

> জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান জেনালের জিয়া কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত স্বাধীনতাকামী দলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক কুৎসা চালাচ্ছেন। কমিউনিস্ট পার্টি এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, কমিউনিস্টরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে বরাবরই আপসহীন সংগ্রাম করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। সংসদের মধ্যেও কমিউনিস্ট প্রার্থীরা মেহনতি জনগণের দাবিই তুলে ধরবে।"[১৫]

নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির কোন প্রার্থী জয়লাভ করতে পারেনি। তারা প্রদত্ত ভোটের শতকরা ০.৩৯ ভাগ ভোট লাভ করে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট লাভ করে প্রসূন কান্তি রায়। তার প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল প্রায় ২০ হাজার আর কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ লাভ করে ১০ হাজারের উপরে কিছু ভোট।[১৬] ১৯৭৩ সালের ন্যায় এবার কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনের ফলাফলকে মাথা পেতে নেয়নি। তারা এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্য জিয়াউর রহমান সরকারের ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপিকে দায়ী করে বলে, "সরকার তার নীল নকশা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে নির্বাচনের নাটক মঞ্চস্থ করেছে।"[১৭] মণি সিংহ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সরকারের বিভিন্ন গণবিরোধী কার্যক্রম ও রাজনীতিবিদদের ওপর সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানায়।[১৮]

---

১৫. দৈনিক সংবাদ, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।
১৬. দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯।
১৭. দৈনিক সংবাদ, ১০ এপ্রিল, ১৯৭৯।
১৮. *The Daily Observer, Daily Morning News, Daily People* এবং দৈনিক সংবাদ, ১০ এপ্রিল, ১৯৭৯।

কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস

১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফলকে কমিউনিস্ট পার্টি মেনে নেয়নি এবং নির্বাচনের পরপরই কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে। ৯ এপ্রিল বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় পার্টির সভাপতি মণি সিংহ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি 'জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আজ হতে কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রাম শুরু করলাম' বলে ঘোষণা দেন। তিনি আরো বলেন,

> সরকার জনতার দাবির মুখে আন্দোলনের চাপে পড়ে সামরিক আইন তুলে নিয়েছে বটে কিন্তু মার্শাললর'র ভেতরে যে সকল বে-আইনি বিধি ছিল তা তোলা হয়নি। ইতিপূর্বে সামরিক আইন বলে একজনকে ৭ দিনের মধ্যেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, সেই আইন এখনো রয়ে গেছে। তিনি সরকারের কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, আপনার যদি সততা থাকে তাহলে এগুলো রাখবেন কেন? রাজবন্দিদের মুক্তি দিচ্ছেন না কেন? আইয়ুব সরকারও ৬২ সালে সামরিক আইন তুলে নিয়েছিল কিন্তু বাস্তবে স্বৈরতন্ত্র রয়েই গেছিল। বর্তমানেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।[১৯]

সরকারের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমালোচনার পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টি এসময় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে ঐক্যজোট গড়ে তোলার আহ্বান জানায় এবং আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার উদ্যোগ নেয়। ১১ জুন এক জনসভায় এ বিষয়ে মণি সিংহ বলেন,

> বর্তমান সরকার বড়লোকদের জন্য বিদেশ হতে বিলাস সামগ্রী ও গাড়ী আমদানি করছে, অথচ বঙ্গবন্ধুর সরকার এই আমদানি বন্ধ করেছিল। আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন, এবার সময় এসেছে লড়াই করার, অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যতিত কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি জনতার রাজত্ব কায়েম হবে না। আমরা ৭১ সনের ন্যায় বিপ্লব শুরু করব। আসুন আমরা

---

১৯. *দৈনিক বাংলা*, ১০ এপ্রিল, ১৯৭৯।

> ঐক্যবদ্ধভাবে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হই।[২০] দেশের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, দেশে আজ দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান, এই অবস্থা থেকে জনগণকে বাঁচাতে হলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।[২১]

কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন সমাবেশ থেকে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যের জন্য আবেদন জানালেও তারা কেবলমাত্র ন্যাপের (মোজাফফর) সাথে সমঝোতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে অনেকটাই নীরব ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সংসদ অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিলসহ বিভিন্ন ধরনের সরকারবিরোধী গণতান্ত্রিক কর্মসূচি ঘোষণা করলে সরকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি রূঢ় আচরণ করে। রাজপথে পুলিশি নির্যাতনের পাশাপাশি গণহারে কমিউনিস্ট নেত-কর্মীদের গ্রেফতার করে। কমিউনিস্ট পার্টির অফিসগুলোতে অগ্নিসংযোগ, মিছিলে হামলা ইত্যাদি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়। ১৯৮০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় অফিসে একদল যুবক আগুন লাগিয়ে দেয়, ফলে অফিসের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।[২২]

১৯৮০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে পাঁচদিনব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস শুরু হয়। কংগ্রেসে ৩৯টি দেশের কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি বার্তা প্রেরণ করে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত অংশগ্রহণ করে। কংগ্রেসের লক্ষণীয় বিষয় ছিল, রাশেদ খান মেননসহ চীনপন্থী বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতার আমন্ত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।[২৩] কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি তার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক লাইন অনুসরণের ধারা অব্যাহত রাখবে বলে ঘোষণা করে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক রিপোর্টে বলা হয়,

> বর্তমান পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা আমাদের পার্টির রণনীতি। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে জাতীয় স্বাধীনতা সংহত করা, জাতীয়

---

২০. দৈনিক সংবাদ, ১২ জুন, ১৯৭৯।
২১. দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ জুন, ১৯৭৯।
২২. দৈনিক সংবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।
২৩. দৈনিক সংবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।

> মুক্তি, গণ জীবনের জরুরি সমস্যাগুলির সমাধান, স্বাধীন আত্মনির্ভরশীল জাতির বিকাশ সাধন এবং সেই সঙ্গে বর্বর শ্রেণি শোষণ ও শ্রেণি বৈষম্য দূর করা ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।[২৪]

কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার কথা বলা হয় এবং এই বিপ্লব সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ফ্রন্ট গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কংগ্রেসে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে বৃহৎ মোর্চা গড়ে তোলার পাশাপাশি দলকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হয়।[২৫]

কংগ্রেসে মণি সিংহকে সভাপতি এবং মোহাম্মদ ফরহাদকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত করে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্পাদকমণ্ডলী ও ২৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।[২৬]

কংগ্রেস শেষ হওয়ার পরপরই কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপকভাবে সরকারি নির্যাতনের শিকার হয়। মার্চ মাসের মধ্যে পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদসহ মনজুরুল আহসান খান, ওসমান গনি, আব্দুল কাইউম মুকুল, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বরুণ রায়, রতন সেন, নুহ-উল আলম লেনিন, বেলানবী, দবিরুল ইসলাম, মন্মথ দে, উৎপল কান্তি ধর, কাজী আকরাম হোসেন, রফিকুর রহমান, আব্দুল মালিকসহ বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে।[২৭] গ্রেফতার

২৪. *কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃ, ১৫।

২৫. *কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃ, ৯০।

২৬. সম্পাদকমণ্ডলীর নির্বাচিত সদস্যরা হলেন, (১) আব্দুস সালাম, (২) অনিল মুখার্জী; (৩) সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিক; (৪) মুনজুরুল আহসান খান; (৫) অজয় রায়; (৬) নূরুল ইসলাম এবং (৭) মতিউর রহমান। ২৩ জন সদস্য ছিলেন,(১) ওসমান গনি; (২) শামছুদ্দোহা; (৩) রতন সেন; (৪) বরুণ রায়; (৫)নূরুল ইসলাম; (৬) পূর্ণেন্দু কানুনগো; (৭) খোরশেদুল ইসলাম; (৮) শহিদুল্লাহ চৌধুরী; (৯) শামছুল হক; (১০) মোর্শেদ আলী; (১১) মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম; (১২) অপূর্বকান্তি ধর; (১৩) আলী আকসাদ; (১৪) কাজী রবিউল হক; (১৫) শেখর দত্ত; (১৬) মুনিরুজ্জামান; (১৭) মকবুল হোসেন; (১৮) শংকর বসু; (১৯) আহসানউল্লাহ চৌধুরী; (২০) ওয়াহেদুল ইসলাম; (২১) আব্দুল কাইউম মুকুল; (২২) হামিদুল চৌধুরী এবং (২৩) মাইনুদ্দীন আহম্মেদ। (সূত্র দৈনিক সংবাদ ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।)

২৭. *দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ এপ্রিল, ১৯৮০।

এড়াতে পার্টির অধিকাংশ নেতা-কর্মী আত্মগোপনে চলে যান ফলে পার্টির কার্যক্রম অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়ে।

সরকারবিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের মিত্রতায় শিথিলতা দেখা দেয়। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে জোট গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি তাতে যোগদান করে জেনারেল ওসমানীকে সমর্থন করলেও পরবর্তীতে সে জোট ভেঙ্গে যায়। এ জোট ভাঙ্গার কারণ হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগকে দায়ী করে বলা হয়, "আওয়ামী লীগ, জাসদ প্রভৃতির দ্বন্দ্ব ঐক্যজোটিকে অচল করে তুলেছিল।"[২৮]

তৃতীয় কংগ্রেসের পর সরকারি নির্যাতনের কারণে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম পরিচালনা অনেকটাই দুরূহ হয়ে পড়ে। এসময় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে পুনরায় আওয়ামী লীগের অনানুষ্ঠানিক মিত্রতা গড়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত তা কোন স্থায়ী রূপ লাভ করেনি। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের আন্তরিকতার অভাবে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে তেমন কোন শক্তিশালী জোট গড়ে ওঠেনি এবং বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে একক কোন প্রার্থীও দাঁড় করানো যায়নি। নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. কামাল হোসেনকে সমর্থন না দিয়ে ন্যাপের (মোজাফ্ফর) সাথে সম্মিলিতভাবে মোজাফ্ফর আহমেদকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়। নির্বাচনে ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত প্রার্থী ২ লাখ ২৪ হাজার ৭৬৬টি ভোট পেয়ে ষষ্ঠ স্থান লাভ করে। জোট গড়ে না উঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নির্বাচন পরবর্তী কমিউনিস্ট পার্টির এক মূল্যায়নে বলা হয়,

> আওয়ামী লীগ বৃহত্তর ঐক্যের তাৎপর্য বুঝতে চায় নাই, দলীয় অহমিকা এবং সংকীর্ণতায় চলে যায়, কর্মসূচিতেও পিছনে চলে যায়...এমতবস্থায় আমরা স্বাধীন স্বতন্ত্র নির্বাচনী নীতি নিয়ে

---

২৮. "রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৮১ পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট", বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ২৩ নভেম্বর, ১৯৮১, পৃ, ১৭।

> দাঁড়িয়েছি। এতে করে আওয়ামী লীগ আমাদের উপর বিরূপ হতে পারে। কিন্তু সে কারণেই আমাদের আওয়ামী লীগকে সমর্থন করতে হবে...এটা ঠিক নয়।[২৯]

জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনা প্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর ন্যায় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে কমিউনিস্ট পার্টি জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বামপন্থী দলগুলোর ঐক্য এবং সেই ঐক্যের উপর দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ব্যাপক ঐক্য এবং ঐকবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলাকে তাদের রাজনৈতিক লাইন হিসেবে গ্রহণ করে।[৩০] কিন্তু বামপন্থীদের সমন্বয়ে কমিউনিস্ট পার্টির এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কৌশল পরিবর্তন করে সামরিক শাসন বিরোধী ঐক্যের বিষয়ে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যোগাযোগ শুরু করে এবং গড়ে ওঠে পনের দলীয় জোট। পরবর্তীতে সাত দলীয় জোট গঠিত হলে পনের দলীয় জোট তার সাথে যুগপৎ আন্দোলন শুরু করে। পনের দলীয় জোট গঠনকে কেন্দ্র করে ১৯৮৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টি একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে বলা হয়,

> বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তথা সর্বক্ষেত্রে সঙ্কট ক্রমেই গভীর হচ্ছে। জাতীয় স্বাধীনতার মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যগুলো বিগত কয়েক বছর ধরে অব্যাহতভাবে নস্যাৎ করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয়করণ নীতি বস্তুত সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে এবং খোলাখুলিভাবে সাম্রাজ্যবাদী

---

২৯. "রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৮১ পর্যালোচনামূলক রিপোর্ট", *পূর্বোক্ত*, পৃ, ২৪।

৩০. ড. মর্তুজা খালেদ, *বাংলাদেশের বাম রাজনীতি: রাজশাহী জেলা ভিত্তিক একটি সমীক্ষা*, (অপ্রকাশিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ, অক্টোবর, ২০০৫), পৃ, ১৬৭।

> লগ্নিপুঁজির উপর নির্ভরশীল অবাধ ধনবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। পাকিস্তানি আমলের মতো ধর্মকে ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং অবাধে চলতে দেয়া হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণা।[৩১]

জোট গঠনের পর কমিউনিস্ট পার্টি মণি সিংহের নেতৃত্বে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সামনের দিকে এগোতে থাকে। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বার্ধক্যজনিত কারণে মণি সিংহ শারীরিকভাবে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েন। ফলে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকেন। কেবলমাত্র দলীয়সভা, ও বড় বড় জনসভায় অংশগ্রহণের মধ্যেই তার কার্যক্রম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দলীয় কর্মকাণ্ড ও মাঠ পর্যায়ের নেতৃত্বে থাকেন মোহাম্মদ ফরহাদ। তবে সার্বিক বিষয়গুলো মণি সিংহকে অবগত করা হত এবং পার্টি অফিসে বসেই তিনি সকল কাজ তদারকি করতেন।[৩২]

১৯৮৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে মণি সিংহের সভাপতিত্বে দিনব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মণি সিংহ আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করলেও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে একদিকে সচেতন থাকা এবং অপরদিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটানোর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। এই বৈঠকেও মণি সিংহ বাংলাদেশ বিশ্বের পনেরতম সমাজতান্ত্রিক দেশ হবে বলে দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সকল পরিস্থিতিই সমাজতন্ত্রের অনুকূলে, কমিউনিস্ট কর্মীদের কাজ হচ্ছে এগুলোকে গুছিয়ে বিপ্লবের পথকে সুগম করা।[৩৩]

---

৩১. *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব*, ১৯৮৩, পৃ, ৭।
৩২. অসিত বরণ রায়ের সাক্ষাৎকার।
৩৩. কমরেড সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিকের সাক্ষাৎকার, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৪।

১০ ফেব্রুয়ারির সভা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মণি সিংহের আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ সভা। পরবর্তীতে তিনি শারীরিকভাবে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই পরবর্তী এক মাসের মধ্যে তার শরীরের ডান অংশ অকেজো হয়ে যায় এবং তিনি বাকশক্তি হরিয়ে ফেলেন। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টি মণি সিংহ-এর লাইন অনুসরণ করেই জোটগতভাবে সামনের দিকে এগোতে থাকে। এসময় পার্টির সভাপতির দায়িত্ব মণি সিংহের উপর থাকলেও সার্বিক দায়িত্ব পালন করতেন কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ। তবে কমিউনিস্ট পার্টির যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মণি সিংহের বাসায় গিয়ে ইশারার মাধ্যমে তার সাথে মত বিনিময় করা হতো।[৩৪]

১৯৮৪ সালে ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকদের নিজস্ব দাবি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের লক্ষ্যে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠে স্কপ। ২৮ এপ্রিল স্কপের ব্যানারে দেশব্যাপী হরতাল ডাকা হয় এবং এই হরতাল অভূতপূর্বভাবে সফল হয়। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯০ সালে কমিউনিস্ট পার্টি একক ও জোটবদ্ধভাবে মোট ৬৩টি হরতাল পালন করে।[৩৫]

বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের মুখে এরশাদ ১৯৮৫ সালের ৬ এপ্রিল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে ১৬ জানুয়ারি মোহাম্মদ ফরহাদের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৫ দলীয় জোট পাঁচ দফা দাবি প্রণয়ন করে এবং ঘোষণা করে, সরকার যদি এই দাবিগুলো মেনে নেয় তবেই তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে এই পাঁচ দফা দাবির উপর ভিত্তি করেই ১৫ দল তাদের আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিল। দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. সামরিক আইন ও সামরিক শাসন প্রত্যাহার;
২. নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানের কার্যকর নিরপেক্ষতা

---

৩৪. অসিত বরণ রায়ের সাক্ষাৎকার।
৩৫. ড. মর্তুজা খালেদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৬৮।

নিশ্চিত করা। ইউনিয়ন থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং প্রশাসনে উপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা;

৩. জনগণের আস্থাভাজন নির্বাচন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা চেয়ারম্যান মনোনয়ন বন্ধ রাখা;
৪. সকল রাজবন্দির মুক্তি এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার;
৫. শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন করা;[৩৬]

সভা শেষে মোহাম্মদ ফরহাদ উল্লিখিত দাবিগুলোর কথা সাংবাদিকদের কাছে বলেন, সাথে সাথে তিনি আরো বলেন, "এই দাবিগুলো মেনে নিলে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে বলে আমরা মনে করি এবং সেই নির্বচনে অংশগ্রহণের বিষয়টি আমরা বিবেচনা করব। দাবিসমূহ মানা না হলে ২০ জানুয়ারি উপজেলা ও জেলা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হবে এবং পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।"[৩৭]

সরকার ১৫ দলীয় জোটের এই দাবিগুলো মেনে না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টিসহ ১৫ দলীয় জোট ২০ জানুয়ারি সারাদেশে ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে এবং দাবি না মানলে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দেয়।[৩৮] সরকার ১৫ দলীয় জোটের দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে নির্বাচন স্থগিতসহ ১ মার্চ থেকে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষধাজ্ঞা আরোপ করে। পাশাপাশি ১৫ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা, সাত দলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন সংগঠনের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গৃহবন্দি ও গ্রেপ্তার করে।[৩৯]

১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে সরকার পুনরায় ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করলে কমিউনিস্ট পার্টিসহ ১৫ দলীয় জোট পুনরায় তাদের কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৮৫ সালের ১৬ জানুয়ারি ঘোষিত ৫ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে

---

৩৬. *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস*, *রাজনৈতিক রিপোর্ট*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ, ৬১।
৩৭. *দৈনিক সংবাদ*, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৮৫।
৩৮. *The Daily Observer*, 21 January 1985.
৩৯. কমিউনিস্ট পার্টির *চতুর্থ কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ৬৫, ১৯৮৭।

আন্দোলন শুরু করে। ইতোমধ্যে ১৫ দলীয় জোটের সাথে বিএনপি-র নেতৃত্বে গঠিত ৭ দলীয় জোটের একটি সমঝোতা হয় এবং তারাও যুগপৎভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের আহ্বানে ১৯৮৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালিত হয়।[৪০] ২ মার্চ সরকারি এক ঘোষণার মাধ্যমে ২৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। ঘোষণাকৃত দাবিসমূহ মেনে নেওয়া এবং গ্রেপ্তারকৃত সকল রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে মুক্তি দেওয়া না হলে ২২ দল (১৫ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোট) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা দেয়।[৪১]

পরবর্তীতে সরকার এককভাবে হলেও নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ১৯ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে পার্টি অফিসের সামনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ বলেন, "বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনের বাইরে রেখে সরকার নির্বাচনের ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরোধী দলবিহীন একটি রাবার ষ্টাম্প সংসদ তৈরি করে সকল অপকীর্তি জায়েজ করা।"[৪২] তিনি আরও বলেন, "স্বৈরশাসন পাকাপোক্ত করার চক্রান্ত বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৫ দল ও ৭ দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রয়োজন।" তিনি বলেন, "কমিউনিস্ট পার্টি এই দুই বিরোধী জোটের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে, ৩০০ আসনেই ১৫ দল ও ৭ দল থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচনকে গণভোটে পরিণত করা হোক।"[৪৩]

কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং ১৫ দল ৭ দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করে। ৭ দল এই প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। ১৫ দলের মধ্যে এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং ৫টি দল ১৫ দলীয় জোট থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। পরবর্তীতে আসন বণ্টনকে কেন্দ্র করে বাকশাল এবং

---

৪০. *ঐ*, পৃ,৬৭।
৪১. *দৈনিক সংবাদ*, ১৮ মার্চ, ১৯৮৫।
৪২. *দৈনিক সংবাদ*, ১৯ মার্চ, ১৯৮৫।
৪৩. *ঐ*।

জাসদ (শাজাহান-রাজা) ১৫ দল থেকে বের হয়ে যায় এবং ১৫ দলীয় জোট মূলত ৮ দলীয় জোটে পরিণত হয়।[৪৪] ১৫ দলীয় জোট থেকে দুই দফায় ৭টি দল বের হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট ৮টি দল নির্বাচনে প্রার্থী মনোয়ন দেন এবং একটি ৮ দলীয় নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে। মোর্চার ৮টি দলই নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মোর্চার পক্ষ থেকে মোট ৯টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা ছিলেন, ১. মোহাম্মদ ফরহাদ; ২. দবিরুল ইসলাম; ৩. আমজাদ হোসেন; ৪. শামছুদ্দোহা; ৫. হারুনুর রশীদ লাল; ৬. শাহ নেওয়াজ; ৭. শহীদুল্লাহ; ৮. বরুণ রায় এবং ৯. মোহাম্মদ ইউসুফ। নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি ৯টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনে জয়লাভ করে।[৪৫]

১৯৮৬ সালের এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত এরশাদ সরকারের জন্য আশীর্বাদে পরিণত হয়। ফলে একদিকে ১৫ দলীয় জোট ভেঙ্গে যায় এবং একটি ৮ দলীয় মোর্চা গঠিত হয়। অপরদিকে ৭ দলীয় জোটের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনও বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে এরশাদ সরকারের দালাল হিসেবে প্রচার করতে শুরু করে যা কিছুটা হলেও পার্টির অবস্থানকে জনসম্মুখে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। পাশাপাশি নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ সরকার কিছুটা হলেও বৈধতা লাভ করে এবং তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সাময়িকভাবে তা ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু এ নির্বাচনের সাফল্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টির অর্জিত সবচাইতে বড় নির্বাচনী সাফল্য। পরবর্তীতে এ নির্বাচন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মূল্যায়নে বলা হয়, এই নির্বাচন ও সমসাময়িক ঘটনাবলীতে কমিউনিস্ট পার্টির সামগ্রিক ভূমিকা, তৎপরতা, আন্দোলনে বাস্তব অবদান প্রভৃতি পার্টির দলীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং পার্টি রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হয়েছে।[৪৬]

---

৪৪. *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস, রাজনৈতিক রিপোর্ট*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ, ৬৬।
৪৫. *দৈনিক সংবাদ*, ৯ মে, ১৯৮৬।
৪৬. "*জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৮৬, সাধারণ সম্পাদকের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন (গোপনীয়)*", বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, আগস্ট, ১৯৮৬।

কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস

সংসদ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি ৮ দলীয় মোর্চার পতাকায় ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিলেও নির্বাচনের ফলাফলকে তারা মেনে নেয়নি। নির্বাচনের অব্যবহিত পরপরই কমিউনিস্ট পার্টি পুনরায় সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলে কমিউনিস্ট পার্টিসহ ৮ দলীয় মোর্চা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়।[৪৭] ইতোমধ্যে ৮ দলীয় জোটের সাথে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সমঝোতা হয়। ফলে পরিচিত সকল রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করে রাজপথে আন্দোলন শুরু করে। সরকার বিরোধী এই আন্দোলনে পূর্বের ন্যায় এবারও কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপকভাবে সরকারি নির্যাতনের শিকার হয় এবং ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে হামলা চালিয়ে অফিস ভাঙচুর ও দলিলপত্রগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।[৪৮]

রাজনৈতিক এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৮৭ সালের ৭-১১ এপ্রিল ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে ভারত, হাঙ্গেরি, জার্মানি, প্যালেস্টাইন, চেকোশ্লোভাকিয়া, সাইপ্রাস, ভিয়েতনাম, মঙ্গোলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে জোটের অন্তর্ভুক্ত সকল দলের প্রতিনিধিরা এই কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।[৪৯] কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৮৮৯ জন এবং বিশ্বের প্রায় সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বাণী পাঠায়। কংগ্রেসের শুরুতেই পার্টির সভাপতি অসুস্থ মণি সিংহের প্রতি একটি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মোহাম্মদ ফরহাদ এই প্রস্তাবটি পাঠ করেন। প্রস্তাবে বলা হয়,

> এই মহতী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল আমাদের পার্টির সভাপতি বিপ্লবী জননেতা মণি সিংহের। কিন্তু তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, শয্যাশায়ী। এ কারণে আমাদের সকলের হৃদয় আজ বেদনায় আপ্লুত। তাঁর অনুপস্থিতি আমরা সকলেই গভীরভাবে অনুভব করছি। কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে মণি সিংহের

---

৪৭. *দৈনিক সংবাদ*, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬।
৪৮. *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস, রাজনৈতিক রিপোর্ট*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ, ৬৪।
৪৯. ড. মর্তুজা খালেদ, পূর্বোক্ত, পৃ, ১৬৯।

> প্রতি উষ্ণ ও রক্তিম অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা মণি সিংহের আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।"[৫০]

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মোহাম্মদ ফরহাদের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মণি সিংহের নিকট শ্রদ্ধাঞ্জলি পৌঁছে দেয়। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা ছিলেন আব্দুস সালাম, আহসানউল্লাহ চৌধুরী, হারুন-অর-রশীদ, রিজিয়া বেগম, মৌলানা হোসেন আলী, হেলেকেতু সিং, হেদায়েত উল্লাহ ও মমতাজ উদ্দীন।[৫১]

কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ কংগ্রেসে পার্টির পক্ষে রাজনৈতিক প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ নয়া-উপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়। কংগ্রেসে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব'কে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামরিকতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্র-একনায়কতন্ত্র প্রভৃতির চির উচ্ছেদ করে স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে ফলপ্রসূ করার কথা বলা হয়।[৫২]

কংগ্রেসের শেষ দিনে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন ও কন্টোল কমিশনের ঘোষণা দেওয়া হয়। মণি সিংহকে সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে মোহাম্মদ ফরহাদ এবং সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিক। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন যথাক্রমে আব্দুস সালাম, মনজুরুল আহসান খান, অজয় রায়, নূরুল ইসলাম, মতিউর রহমান, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ওসমান গনি, সামছুদ্দোহা, শহীদুল্লাহ চৌধুরী এবং শঙ্কর বোস।[৫৩] কন্ট্রোল কমিশনের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন (১) আব্দুস সালাম (২) মণিকৃষ্ণ সেন (৩) পূর্ণেন্দু কানুনগো (৪) নূরুল ইসলাম মুন্সী এবং (৫) অ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক।[৫৪]

১৯৮৭ সালের কমিউনিস্ট পার্টির এই কংগ্রেস ছিল অনেকটাই পুরাতন ব্যবস্থাপনার নতুন সংস্করণ। এই কংগ্রেসের মাধ্যমে নতুন কোন দিক নির্দেশনা

---

৫০. চতুর্থ কংগ্রেসে গৃহীত '*পার্টির সভাপতি মণি সিংহের উদ্দেশ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রস্তাব*' ৭ এপ্রিল, ১৯৮৭।
৫১. *কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের রিপোর্ট*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ, ৪।
৫২. ড. মর্তুজা খালেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ, ১৭০।
৫৩. *কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের রিপোর্ট*, ঢাকা, ১৯৮৮।
৫৪. *কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের রিপোর্ট*, ঢাকা, ১৯৮৮।

কিংবা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। কেবলমাত্র সম্পাদকমণ্ডলী এবং সদস্যদের মধ্যে স্বল্প পরিসরের একটি পরিবর্তন এসেছিল। রাজনৈতিক লাইনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং চলমান ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রশংসা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

পাকিস্তান আমল ও স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের যে নীতি গ্রহণ করেছিল, ১৯৮৪ সালের পর পুনরায় সেই নীতিতে ফিরে যায়। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে তারা ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের পাশাপাশি নৌকা প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কংগ্রেসের মাধ্যমে পার্টির চলমান কর্মকাণ্ডগুলোকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশ উল্লেখ করে এই ধারা অব্যবহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রতি বেশি নির্ভরশীলতার কারণে কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমান্বয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে ক্রমেই আওয়ামী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে পার্টির নৌকা প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে জনগণ এমনকি পার্টির সমর্থকদের একটি অংশ ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা ভেবেছিল কংগ্রেসের মাধ্যমে পার্টি আওয়ামী নির্ভরশীলতা কিছুটা কমিয়ে আনবে। কিন্তু তাদের সেই আশা পূরণ হয়নি।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন

চতুর্থ কংগ্রেসের মাধ্যমে গণ বিপ্লবের লাইনকে অক্ষুণ্ণ রাখার সিদ্ধান্ত হলে কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। জুন মাসে সরকার বাজেট ঘোষণা করলে কমিউনিস্ট পার্টি এই বাজেটকে 'গরীব মারার বাজেট' হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা ৮ দলীয় জোটের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে বাজেট প্রত্যাহারের দাবিতে ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট এবং অর্ধ-দিবস হরতাল পালন করে।[৫৫] পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টি ৮ দলীয় জোটবদ্ধ থেকে ৭ দলীয় জোট ৫ দলীয় জোটের সাথে উপজেলা ও জেলা পরিষদ বিল বাতিল এবং সরকার পতনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯৮৭ সালের ২৫ জুলাই থেকে একটানা ৫৪ ঘণ্টার হরতাল পালন করে। হরতালে পুলিশের গুলিতে বিভিন্ন দলের মোট ১০ জন কর্মী নিহত হয়।[৫৬]

৫৫. *দৈনিক সংবাদ ও ইত্তেফাক*, ২৮ জুন, ১৯৮৭।
৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ জুলাই, ১৯৮৭।

১২ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ মস্কোর একটি হোটেলে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। একদিকে পার্টির সভাপতির অসুস্থতা এবং অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদকের মৃত্যুর ফলে কমিউনিস্ট পার্টি অনেকটাই নেতৃত্ব সঙ্কটে পড়ে। এ সময় সরকার অন্য বিরোধী দলগুলোর পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির উপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু করে। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর সচিবালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুলিশ পার্টির প্রায় ৬০০ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস লুটপাট করার পর পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।[৫৭] সরকারের এসকল নির্যাতনের কারণে বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে একের পর এক কর্মসূচি ঘোষণা ও পালন করতে থাকে। বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনে ভীত হয়ে সরকার দেশে জরুরি অবস্থা জারি এবং জাতীয় সংসদকে বাতিলসহ সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।[৫৮]

ডিসেম্বর মাসে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমোদন দেওয়া হলে কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিরোধী দলগুলো ঘরোয়াভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারি একটি ঘোষণার মাধ্যমে ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বিরোধী দলগুলো এই ঘোষণাকে প্রত্যাখান করলেও সরকার নির্বাচন করার বিষয়ে অনড় থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি একটি বিবৃতির মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে পার্টির অবস্থান এবং প্রস্তাব তুলে ধরে। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিক স্বাক্ষরিত এই বিবৃতিতে বলা হয়,

> আমরা (কমিউনিস্ট পার্টি এবং ৮ দলীয় জোট) এই নির্বাচনকে বয়কট করবো এবং সকল রাজনৈতিক দলকে এই নির্বাচন বয়কটের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। দেশের এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে এরশাদ সরকারকে প্রথমেই একজন নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এরশাদ সরকারের পদত্যাগের পর উক্ত নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে দেশের চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তাতে আমরা (কমিউনিস্ট পার্টি এবং ৮ দলীয় জোট) অবশ্যই অংশগ্রহণ করবো।[৫৯]

---

৫৭. *পঞ্চম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ৭২।

৫৮. *দৈনিক সংবাদ ও ইত্তেফাক*, ১ ডিসেম্বর এবং ৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

৫৯. *দৈনিক সংবাদ*, ৬ জানুয়ারি, ১৯৮৮।

মনোয়নপত্র দাখিলের দিন কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। শেষ পর্যন্ত ৮ দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছাড়াই চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৬০]

সংসদ নির্বাচনের পর বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন অনেকটাই ঝিমিয়ে পড়ে। ২২-২৪ মে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকারের সংবিধান সংশোধন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা এবং অনতিবিলম্বে ৮ দলীয় জোট ও অন্যান্য বিরোধী জোট ও দলগুলোকে সাথে নিয়ে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৬১]

আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ভয়াবহ বন্যা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি বন্যার্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে অপর্যাপ্ত ত্রাণ এবং তা বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের কারণে জনগণ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা এবং বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে সরকারের কাছে ১৪ দফা দাবি পেশ করা হয়। দাবিগুলো নিম্নরূপঃ

১. প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে ত্রাণ শিবিরগুলো পরবর্তী ফসল না উঠা পর্যন্ত চালু রাখা;
২. বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা;
৩. পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য ফিটকিরি ও বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সরবরাহ এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য টিউবওয়েল স্থাপন;
৪. গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
৫. পশুখাদ্য সরবরাহ করা;
৬. ঘর-বাড়ি নিমার্ণের জন্য নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ;
৭. গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ;
৮. ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, স্কুল, মসজিদ ও উপাসনালয়গুলো পুনর্নির্মাণ;

---

৬০. *কমরেড মনজুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার*, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।
৬১. *দৈনিক সংবাদ ও ইত্তেফাক*, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮।

৯. টেস্ট রিলিফ ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
১০. বন্যা কবলিত এলাকায় পুরানো ঋণ ও খাজনা মওকুফ করা;
১১. শর্তমুক্ত পর্যাপ্ত নতুন ঋণ প্রদান;
১২. পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্যবীজ সরবরাহ;
১৩. সহজ শর্তে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা কমদামে সেচযন্ত্র, কীটনাশক সরবরাহ এবং ত্রাণসামগ্রী বিতরণে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করা;
১৪. অনতিবিলম্বে রেশনিং প্রথা চালু করা।[৬২]

বন্যা পরবর্তীকালে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সরকারবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা নিষ্ক্রিয়ভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের পতনের লক্ষ্যে তীব্র সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল ও জোটের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। ১৯৮৯ সালের ৩১ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিক বলেন

> দেশের জনগণ আজ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য প্রস্তুত, কিন্তু সরকার বিরোধী বিভিন্ন জোটের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে অনতিবিলম্বে সরকার বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের জনগণকে মুক্ত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিরোধী জোট ও দলগুলো যদি এরূপ নিষ্ক্রিয় থাকে তবে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের মানুষের ও গণতন্ত্রের স্বার্থে জনগণকে সাথে নিয়ে এককভাবে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করবে।[৬৩]

কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৯০ সালের সূচনা লগ্ন থেকেই সক্রিয়ভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। জানুয়ারি ৫ কমিউনিস্ট পার্টি দেশের চারটি প্রান্ত থেকে ঢাকা অভিমুখে ২৪ দিনব্যাপী এক পদযাত্রার আয়োজন করে। ২৮ জানুয়ারি পদযাত্রা শেষে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের সমাবেশের আয়োজন

৬২. দৈনিক সংবাদ, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮।
৬৩. দৈনিক সংবাদ, ২ নভেম্বর, ১৯৮৯।

করে। সমাবেশ থেকে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন শুরুর জন্য সকল বিরোধী দল ও জোটের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৬৪]

১৯৯০ সালের শুরুতে এই পদযাত্রা ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম সরকারবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। পরবর্তীতে ৮ দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোটসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো সরকার পতনের একদফা দাবি নিয়ে মাঠে নামে।[৬৫] কমিউনিস্ট পার্টি ৮ দলীয় জোটের ব্যানারে এবং ৮ দলীয় জোটসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দলের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে গড়ে ওঠা সরকার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পার্টির সদস্যরা সামনের কাতারে থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। সকল দল ও মতের সমন্বয়ে গড়া ওঠা এই তীব্র আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় স্বৈরশাসক এরশাদ। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জনতার চাপে বাধ্য হয়ে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।[৬৬] ক্ষমতা হস্তান্তরের মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই জনতার দাবির প্রেক্ষিতে জেনারেল এরশাদকে গ্রেফতার করা হয়।

এরশাদ সরকারের পতনের পর অন্য দলগুলোর মত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে বিজয়ের আনন্দ শুরু হয়। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির এই আনন্দ খুব দ্রুত মিলিয়ে যায়। ১৯৯০ সালের শেষদিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা এবং পার্টির সভাপতি মণি সিংহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে নেতা-কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। কমিউনিস্ট পার্টি ৭ দিনের শোক কর্মসূচি ঘোষণা করে। মণি সিংহের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আলোচনা সভা, শোকসভা, স্মরণসভা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসটি কেটে যায়। ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশীল ঘোষণা করলে কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

৬৪. *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ জানুয়ারি, ১৯৯০, *সাপ্তাহিক একতা*, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।
৬৫. *পঞ্চম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ২৫ এবং *দৈনিক সংবাদ*, ৩০ মার্চ , ১৯৯০।
৬৬. *দৈনিক সংবাদ* ও *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশীল ঘোষণার পর কমিউনিস্ট পার্টি ৮ দলীয় মোর্চার মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এ লক্ষ্যে তারা আওয়ামী লীগসহ জোটভুক্ত দলগুলোর সাথে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিকবার আলোচনা করে। কিন্তু নির্বাচনের মনোনয়ন জমাদানের সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনের সম্ভাবনা ততই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। মূলত জোটভুক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অনীহা এবং জোটের শরিক দলগুলোর জন্য আসন সংক্রান্ত বিষয়ে ছাড় না দেওয়া ছিল এর অন্যতম প্রধান কারণ।[৬৭] শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি এককভাবে মনোনয়ন জমা দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতা হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি ৮টি আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই ৮টি আসনের বাইরে অন্য আসনগুলোতে যেসব স্থানে কমিউনিস্ট পার্টি পূর্বেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিল তাদের কেউ কেউ পত্রিকায় বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পার্টি মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এ লক্ষ্যে তারা নির্বাচনী এলাকায় পোস্টার তৈরি করে নির্বাচনী প্রচারণাও চালাতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির আসন সমঝোতা পার্টির অধিকাংশ প্রার্থী ও নেতা-কর্মীর পক্ষে মেনে নেওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। ফলে দলের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে এবং নৌকা প্রতীক নিয়ে জোটগতভাবে ৮টি আসনের বাইরে আরো অনেক আসনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা কাস্তে ও তারা প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।[৬৮]

পার্টির নেতৃস্থানীয় বেশ কিছু নেতার মধ্যে বিষয়টি প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা তারা কার্যত কাস্তের স্বপক্ষে কেন্দ্র স্থাপন, অর্থ সংগ্রহ, এবং কাস্তের পক্ষে বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনী সফর শুরু করে। ফলে পার্টির সমর্থক গোষ্ঠী ও মাঠ

৬৭. *জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯১-এর পর্যালোচনা রিপোর্ট*, পৃ, ১৭।
৬৮. *পঞ্চম কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ, ৪১।

পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয় গ্রাম থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত সর্বস্তরে এর প্রভাব পড়ে। পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে পার্টির শৃঙ্খলা ও পার্টি জীবনের রীতি-নীতি গভীরভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।[৬৯]

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, নৌকা প্রতীকে অংশ নেওয়া ৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫ জন নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। নির্বাচিতরা হলেন (১) মোঃ সামছুদ্দোহা (নিলফামারী-২); (২) মোজাহার হোসেন (পঞ্চগড়-২); (৩) নজির হোসেন (সুনামগঞ্জ-১); (৪) দবিরুল ইসলাম (ঠাকুরগাঁও-২); এবং (৫) মোঃ ইউসুফ (চট্টগ্রাম-৭)। অপরদিকে কাস্তে কিংবা তারা প্রতীকে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের কেউই জয়লাভ করতে পারেনি এবং অধিকাংশ প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ এত কম ছিল যে তাদের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়। [৭০]

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি আপাতদৃষ্টিতে ৫টি আসনে জয়লাভ করলেও এই নির্বাচনের মাধ্যমে পার্টি দীর্ঘদিনের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অর্জনগুলো হারিয়ে ফেলে। নির্বাচনের মাধ্যমে একদিকে কমিউনিস্ট পার্টির উপর জনগণ আস্থা হারাতে শুরু করে অন্যদিকে পরপর দুটি সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে অংশ নেওয়ায় অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টিকে আওয়ামী লীগের বি টিম ভাবতে শুরু করে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে পার্টির মধ্যে যে ঐক্য বিরাজ করছিল তা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে, যা আর ঠিক করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের সময় পার্টি অফিস মূলত কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়, যার একটি অংশ ছিল নৌকা এবং অপর দু'টি অংশ ছিল কাস্তে ও তারা প্রতীকের অংশ। এছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ওহিদুর রহমানসহ পার্টির অনেক নেতা-কর্মী সরাসরি আওয়ামী লীগে যোগদান করলে পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ে।[৭১]

মূলত মণি সিংহের অসুস্থ হয়ে পড়া ও মৃত্যু এবং মোহাম্মদ ফরহাদের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টিতে মাঠ পর্যায়ে আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার মত

৬৯. *জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯১-এর পর্যালোচনা রিপোর্ট*, পৃ, ২২।
৭০. *দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ও ২ মার্চ, ১৯৯১।
৭১. জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯১-এর পর্যালোচনা রিপোর্ট, পৃ, ১৮।

একাধিক নেতা থাকলেও দলের কঠিন ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মত নেতা কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিল না বললেই চলে। পাশাপাশি এই প্রজন্মের নেতাদের অধিকাংশই সমসাময়িক হওয়াতে তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কাজ করতে শুরু করে। মূলকথা হচ্ছে ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পার্টির মধ্যে যে বিভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয় তা ছিল তাদের প্রাপ্ত ৫টি আসন লাভের চাইতে অনেক অনেক বেশি ক্ষতিকর। যে ক্ষতি পার্টির পক্ষে কাটিয়ে ওঠা আর কখনোই সম্ভব হয়নি।

মণি সিংহের জীবনের শেষ দিনগুলো

১৯৮৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠেয় বৈঠকের সময় মণি সিংহ মাঝে মাঝেই হাঁপিয়ে উঠছিলেন এবং বিশ্রাম নিয়ে থেমে থেমে কথা বলছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী মণি সিংহের শারীরিক অবস্থা অবলোকন করে বৈঠক স্থগিত অথবা সংক্ষিপ্ত করার অনুরোধ জানালেও তিনি তা করেন নি। এদিন তিনি মাঝে মাঝেই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন এবং বৈঠককে দীর্ঘায়িত করছিলেন।[৭২] সন্ধ্যে সাতটায় সভা শেষ হলে দলীয় সদস্য অসিতবরণ রায় তাঁকে মালিবাগের বাসায় পৌঁছে দেন। এ দিন রাতে তিনি স্বাভাবিক খাবারটুকুও খেতে পারেন নি, কেবলমাত্র এক টুকরো মুরগির মাংস এবং এক মুঠোর মত ভাত খেয়েছিলেন। অসিতবরণ রাতে ডাক্তার ডাকতে চাইলে তিনি নিষেধ করেন। স্বাভাবিক সময়ে তিনি রাত এগারটার দিকে ঘুমাতে গেলেও এই দিন একটু আগেই বিছানায় যান এবং ঘুমিয়ে পড়েন।

স্বাধীনতার কিছুদিন পর থেকে মণি সিংহ নিয়মিতভাবে সকালে রমনা পার্ক ও মহল্লার মধ্যে প্রাতঃভ্রমণ করতেন।[৭৩] ১১ ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে তিনি অসিতবরণ রায়কে সাথে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে মোটেও হাঁটতে পারছিলেন না, বারবার হাঁপিয়ে উঠছিলেন। মাত্র ২০ মিনিটের মত প্রাতঃভ্রমণ শেষে বাসার দিকে রওয়ানা দেন। সামনে ছিল অসিতবরণ রায় এবং পিছনে মণি সিংহ। কিছুদূর যাওয়ার পর অসিতবরণ পিছনে তাকিয়ে দেখেন যে, মণি

৭২. *কমরেড মঞ্জুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার*, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫, স্থান: তার নিজস্ব বাসভবন।

৭৩. *অসিতবরণ রায়ের সাক্ষাৎকার*।

সিংহ বয়স ও শরীরের কাছে অনেকটাই পরাজিত হয়ে একটি বাসার দেওয়ালের সাথে শরীরকে কোনরকমে আটকিয়ে রেখে হাঁপাচ্ছে। অসিতবরণ রায় কাছে যাওয়ামাত্র হাতের ইশারায় তাকে বাসায় নিয়ে যেতে বললে অসিতবরণ তাকে বাসায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে দলীয় নেতৃবৃন্দকে তাঁর অসুস্থতার খবর জানানো হয় এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মহান এই নেতার শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। এরই মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে থাকা তার একমাত্র পুত্র দিবালোক সিংহকে বিষয়টি জানানো হয়। দিবালোক সিংহ উন্নত চিকিৎসার জন্য পার্টির সহায়তায় এই নেতাকে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ডাক্তাররা রিপোর্ট দেখে মহান এই নেতাকে সোভিয়েত ইউনিয়নে না নেওয়ার পরামর্শ দেয়। ডাক্তারদের সুপারিশ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়ার দীর্ঘ ভ্রমণ এই নেতার শারীরিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[৭৪] ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলতে থাকে এবং দেড় মাস পর হাসপাতাল থেকে তাকে বাসায় স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে ডান হাতসহ শরীরের ডান অংশটি অনেকটাই অকেজো হয়ে পড়ে এবং কথায় জড়তা দেখা দেয়।

১৯৮৪ সালের শেষদিকে মণি সিংহ পুরোপুরি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। এসময় হাত ও চোখের ইশারার মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারতেন মাত্র। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর থেকে ১৯৯০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মণি সিংহ অসুস্থ অবস্থায় তার নিজ বাসাতেই থাকতেন। এসময় তার দেখাশোনা ও সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পার্টি সদস্য অসিতবরণ রায়ের ওপর। তবে পরবর্তীতে পুত্র দিবালোক সিংহ এবং পুত্রবধূ ডা. সাকী খন্দকার দেশে ফিরে মণি সিংহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় এই তিনজন মিলে তার শুশ্রূষা করতেন।

অসুস্থ অবস্থাতেও পার্টির প্রতি দায়িত্বের কথা মণি সিংহ কখনোই ভুলেন নি। দলের কোন সভা হলেই তার সংবাদ ও সিদ্ধান্ত জানার জন্য ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে

৭৪. *অসিতবরণ রায়ের সাক্ষাৎকার।*

অপেক্ষা করতেন এবং বারবার অসিতবরণকে বিষয়টি সম্পর্কে ইশারায় জিজ্ঞাসা করতেন। অবশ্য দলের যে কোন সভার সিদ্ধান্ত নেতৃবৃন্দ মণি সিংহকে অবহিত করতেন। সিদ্ধান্ত পছন্দ হলে তিনি খুশি হয়ে হাসি দেওয়ার চেষ্টা করতেন আর পছন্দ না হলে ইশারার মাধ্যমে তার মতামত ব্যক্ত করতেন।[৭৫]

বিছানায় শুয়েও মণি সিংহ পার্টির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। এমনকি তার ভাল লাগা না লাগা, চলা ফেরা প্রভৃত পার্টির নিদের্শের মাধ্যমে প্রভাবিত হত। যেমন, একদিন তাকে ডাক্তার ইসফগুলের ভুসি খাওয়ার পরামর্শ দিলেও তিনি প্রথমে তা খেতে মোটেও রাজি ছিলেন না। বিষয়টি নিয়ে অসিতবরণ মনজুরুল আহসান খানের সাথে কথা বলেন এবং তারা সিদ্ধান্ত নেন যে মণি সিংহকে বলতে হবে ইসফগুলের ভুসি খাওয়ার জন্য পার্টির নির্দেশ এসেছে। পরবর্তীতে অসিতবরণ মণি সিংহকে পার্টির নির্দেশের কথা বলামাত্র তিনি ইসফগুলের ভুসি খেতে রাজি হন। এমনিভাবে তিনি না ঘুমালে অসিতবরণ তাকে বলতেন পার্টির নির্দেশ আছে আপনাকে এখন ঘুমোতে হবে। মণি সিংহ তখন সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়তেন।

অসুস্থ অবস্থায় মণি সিংহের সাথে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বাইদাকোভ এসে মণি সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে বাইদাকোভ মণি সিংহের অসুস্থ হয়ে যাওয়াকে কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাংলাদেশের জন্য এক বড় বিপর্যয় উল্লেখ করে বলেন,

> মহান এই নেতার ত্যাগ ও আদর্শ থেকে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা নিতে হবে। মণি সিংহ হচ্ছেন বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণার প্রতীক। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির উচিত মণি সিংহের জীবদ্দশাতেই তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটনোর মাধ্যমে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। [৭৬]

---

৭৫. *কমরেড সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিকের* সাক্ষাৎকার।
৭৬. দৈনিক সংবাদ, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রতিনিধি দল ১৯৮৮ সালে মণি সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এই দলের সদস্যদের মধ্যে অবনী লাহিড়ী, সমর মুখার্জী, দেবকুমার গাঙ্গুলীর নাম উল্লেখযোগ্য। তারা যে কদিন বাংলাদেশে ছিলেন প্রতিদিন বিকেলে একবার করে মণি সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।[৭৭] উল্লিখিত দেশ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দেশের নেতৃবর্গ অসুস্থ মণি সিংহকে দেখতে এসেছিলেন। দেশের ভিতর যখন স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন চলছে তখন মণি সিংহ বিছানায় শুয়ে শুয়ে পত্রিকার পাতার মাধ্যমে তা পড়তেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মণি সিংহের সাথে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছেন এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছিলেন।[৭৮]

প্রতি বছর ২৮ জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মণি সিংহের জন্মদিন পালন করা হত। বিশেষ এই দিনটিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা ফুলের তোড়া, কেকসহ বিভিন্ন উপহার নিয়ে তাঁর বাসায় হাজির হতেন যা অসুস্থ মণি সিংহকে তার অতীত মনে করিয়ে দিত। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ বছর মণি সিংহ তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো অসুস্থতার কারণে বিছানায় কাটিয়েছেন। এসময় মণি সিংহের খেলার সাথী ছিল দিবালোক সিংহের পুত্র অনিক সিংহ। মণি সিংহ কথা বলতে পারতেন না, অন্যদিকে অনিকও ছিল খুবই ছোট, এক নবীন আর এক প্রবীণ সারাদিন বিছানায় খেলা করতে করতে দিন পেরিয়ে যেতো। ১৯৮৯ সাল থেকে মণি সিংহের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যেতে শুরু করে এবং এবং ১৯৯০ সালের অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এসময় তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েন এবং কোন ঔষধ-ই আর কাজ করছিল না।[৭৯]

১৯৯০ সালের শেষ দিনটি ছিল সোমবার। ৩০ ডিসেম্বর রাতে মণি সিংহ একেবারেই ঘুমোতে পারেন নাই। সকালে অসিতবরণ তাঁর শরীরের কাপড় পাল্টিয়ে এবং ব্রাশ করিয়ে দেয়। নাস্তার টেবিলে মণি সিংহ কিছুই খেতে পারেন নি, শোয়ানো অবস্থাতেই অসিত তাঁকে দুধ খাইয়ে দেয়। সকাল ন'টার দিকে তিনি পরনের কাপড় নোংরা করে ফেলেন এবং অসিত তা পাল্টিয়ে দেয়। দশটার

---

৭৭. *অসিতবরণ রায়ের সাক্ষাৎকার।*
৭৮. *মণি সিংহের পুত্রবধূ ডা. সাকী খন্দকারের সাক্ষাৎকার।*
৭৯. *অসিতবরণ রায়ের সাক্ষাৎকার।*

দিকে তিনি একবার কালো বমি করেন এবং এর পরই তার কিছুটা ঘুম ঘুম ভাব আসে। মুখ মুছে দিয়ে অসিতবরণ ডা. প্রভাকর বাবুকে খবর দেয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৫ সাল থেকে ডা. প্রভাকর বাবু মণি সিংহের চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করছিল। সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মোনায়েম সরকার, রহিমা বেগম এবং হেলেনা করিম মণি সিংহকে দেখতে আসে। হেলেনা করিম মণি সিংহের কাছে গিয়ে 'বড় ভাই' করে ডাক দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আবারও কালো বমি করেন। অসিতবরণ মুখ মুছিয়ে দিয়ে হাত পরিষ্কারের জন্য বাথরুমে প্রবেশের পর পরই হেলেনা করিমের কান্না শুনতে পায়, অসিত ফিরে দেখেন, দীর্ঘ ৭ বছর অসুস্থতার পর জীবন থেকে ছুটি নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন মণি সিংহ। শেষ হয় তার দীর্ঘ সাত দশকের রাজনৈতিক জীবনের, শেষ হয় কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের।[৮০]

সকাল ১১ টার দিকে মণি সিংহের পুত্র ডা. দিবালোক সিংহসহ কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে খবর দেওয়া হয়। সকাল সাড়ে এগারটার মধ্যেই আল আমিন রোডের বাসায় প্রচুর শোকাহত লোকের সমাগম ঘটে। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে বিকেল ৫ টায় মণি সিংহের মৃতদেহ পার্টি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। পার্টি অফিসের মাঠে একটি মঞ্চ সাজিয়ে তার উপর মণি সিংহের মরদেহ রাখা হয়। এসময় তার কফিনটি পার্টির লাল পতাকা দিয়ে ঢাকানো ছিল। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা, আব্দুল জলিল, বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, মোস্তাফিজুর রহমান, বদরুদ্দোজা চৌধুরী, আব্দুল মান্নানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সদ্য প্রয়াত এই নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে ছুটে যায়। রাতের মধ্যেই গ্রাম ও বিভিন্ন শহর থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী ছুটে আসে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে এবং সকাল ১০ টার দিকে ফুলে ফুলে মণি সিংহের কফিন এবং মঞ্চটি ভরে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী শোক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে সিপিবির নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এসময় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গান পরিবেশন করে এবং কার্যালয় ও বাইরের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ মুষ্ঠিবদ্ধ ডান হাত তুলে গানে গলা মিলিয়ে এই গণ মানুষের নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।[৮১] বিকেল ৫টায় মণি সিংহের কফিন একটি ট্রাকে করে

---

৮০. ঐ।

৮১. *দৈনিক সংবাদ*, জানুয়ারি ২, ১৯৯১।

নিয়ে এক বিরাট শোক র‍্যালি শুরু হয়। র‍্যালিটি গুলিস্তান, নবাবপুর মোড়, বাহাদুরশাহ পার্ক, লক্ষ্মীপুর বাজার, সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া এবং ফরিদাবাদ হয়ে দীর্ঘ ৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরস্থ শ্যামপুর শ্মশান ঘাটে পৌছায়। শোক র‍্যালির সামনের সারিতে স্বেচ্ছাসেবকরা জাতীয় পতাকা, কালো পতাকা এবং পার্টি পতাকা বহন করে। বহন করা ব্যান্যারগুলোতে লিখা ছিল 'কালজয়ী মহান নেতা-কমরেড মণি সিংহ, লও লও লও সালাম'।[৮২] সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টায় একমাত্র পুত্র দিবালোক সিংহ প্রথমে মণি সিংহের মুখাগ্নি করেন। এরপর পর অসিতবরণ রায় এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবর্গ একে একে তার মুখাগ্নি করেন।[৮৩] রাত ৮ টার মধ্যেই মহান এই নেতার দেহ সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয় এবং মণি সিংহ ছবির ফ্রেমে বাঁধা পড়েন।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতনের আনন্দ মণি সিংহের মৃত্যুতে অনেকটাই থেমে যায়। মণি সিংহের এই মৃত্যু ৬ ডিসেম্বরের স্বৈরাচার পতন এবং ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয়নি। বিজয় দিবসের মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে মণি সিংহের মৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টিসহ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বয়ে আনে শোকের ছায়া। শুরু হয় নাগরিক শোকসভাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম। মণি সিংহের মৃত্যুর পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহম্মেদ এক শোকবাণীতে বলেন,

> কমরেড মণি সিংহ জনগণের প্রতি ভালবাসার এবং আপন আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার মৃত্যুতে দেশ হারিয়েছে এক সংগ্রামী সন্তান, কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন হারিয়েছে এক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও দুর্দিনের কাণ্ডারী এবং বাংলাদেশের জনগণ হারিয়েছে তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলার মত একজন মহামানবকে। মণি সিংহকে এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে অবহিত করে তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি যে অবদান রেখেছেন জাতি চিরদিন তা কৃতজ্ঞতার সাথে তা স্মরণ করবে।[৮৪]

---

৮২. দৈনিক *সংবাদ*, জানুয়ারি ২, ১৯৯১।

৮৩. অসিতবরণ রায়ের সাক্ষাৎকার।

৮৪. কমরেড মণি সিংহের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠান 'আগুনের পরশমনি'।

কেন্দ্রীয় শহীদমিনারে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেন। নাগরিক শোকসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিক, কমরেড মনজুরুল আহসান খান, কবি শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামছুল হক, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহম্মেদ, জিল্লুর রহমান, বজলুর রহমানসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ।[৮৫] অচিরেই মণি সিংহ হয়ে ওঠেন নাটক ও চলচিত্রের প্রধান চরিত্র। তানভীর মোকাম্মেল মণি সিংহের জীবন কাহিনী নিয়ে রচনা করেন 'হুলিয়া' নামক স্বল্প দৈর্ঘ চলচিত্র (Short film) এবং সেলিম আল দ্বীন রচনা করেন 'কেরামত মঙ্গল' নামক একটি নাটক যার প্রধান চরিত্র ছিল মণি সিংহ। ঢাকা থিয়েটারের আয়োজনে 'কেরামত মঙ্গল' নাটকটি বেশ কয়েকবার মঞ্চস্থও করা হয়। ইতোমধ্যেই দেশে নির্বাচনের তফশিল ঘোষিত হয় এবং সকল রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নেমে পড়ে। চারিদিকে বেজে উঠে নির্বাচনী ডামাডোল আর ক্রমান্বয়ে পুরাতন হয়ে যেতে থাকে মণি সিংহের মৃত্যুর বিষয়টি।

৮৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, *সংবাদ* এবং *Bangladesh Observer* জানুয়ারি ৯, ১৯৯১।

শেষ কথা

বিশ শতকের শুরুতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ তাদের এ বিপ্লবকে বিশ্ববিপ্লবে রূপান্তরের জন্য ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা করে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকাসহ আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোতে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাহায্যে সাম্যবাদী দর্শন ও আদর্শ প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করা হয়। এ সকল দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ও বিদ্যমান কমিউনিস্ট পার্টিকে তাত্ত্বিক দিকে সাহায্য করাসহ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকে এই সংস্থা। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাহায্যেই ১৯২০ সালে উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মোটামুটিভাবে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নির্দেশিত পথেই ভারতীয় কমিউনিস্টগণ আন্দোলন গড়তে চেষ্টা করেছিল।

বিশ শতকের প্রথমে উপমহাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। দলটি শিক্ষিত, বিত্তশালী ও সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিদের নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতীয়দের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে দলটি বিভিন্ন সময় আপসমূলক নীতি অনুসরণ করে। কংগ্রেসের এ ধরনের নীতিতে তিক্ত, বিরক্ত হয়েছিল শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়। বিশ শতকে উপমহাদেশের মধ্যে বাংলা ছিল অগ্রসর চিন্তার অধিকারী। এখানকার তরুণদের বড় অংশ কংগ্রেসের নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দ্বারা বিদেশীদের বিতাড়িত করে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এ সকল বিপ্লবীই গড়ে তুলেছিল অনুশীলন ও যুগান্তরের মতো রাজনৈতিক সংগঠন। মণি সিংহ ছিলেন অনুশীলন দলের সদস্য।

১৯২০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবার পর কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসী রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া শুরু করে। মুক্তি পাওয়া বিপ্লবীদের অধিকাংশই জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির দিকে না গিয়ে কমিউনিস্ট

পার্টিতে যোগদান করে। এ সকল প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে তাদের এলাকায় গড়ে তোলেন কমিউনিস্ট পার্টি। এ ভাবে ১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগে সারা বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে।

কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২০-এর দশকে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টির ব্যানারে গড়ে তোলে প্রধানত শ্রমিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মূলত কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন শিল্পাঞ্চল। মণি সিংহের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় কলকাতার মেটিয়াবুরুজ শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দেবার মাধ্যমে। ১৯২০-এর দশকে শুরু হওয়া শ্রমিক আন্দোলন ব্রিটিশ সরকার দমন করে ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এ মামলায় অধিকাংশ কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯২০-এর দশকের শ্রমিক আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় দুর্বল হয়ে যায়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতাগণ বন্দি হওয়ায় ১৯৩০-এর দশকের শুরুতে দ্বিতীয় প্রজন্মের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সমগ্র বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসার লাভ করে শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ সময় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ কৃষক সভা গঠন করে তার মাধ্যমে বাংলাসহ ভারতবর্ষের কৃষকদের মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিস্তার ঘটাতে উদ্যোগী হয়। এ পর্যায়ে কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহ তার নিজ এলাকা নেত্রোকোণার কৃষকদের সংগঠিত করে গড়ে তোলেন টঙ্ক আন্দোলন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গ্রহণ করে যুক্তফ্রন্ট নীতি। এ নীতির ফলে কমিউনিস্টগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকারকে উত্ত্যক্ত না করে বরং কলকারখানায় উৎপাদন বাড়ানোর রাজনীতি পরিচালনা করে। সরকার সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় এ দল দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। যুদ্ধ শেষে ১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা প্রচণ্ডভাবে বিস্তার লাভ করে। সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার মত শক্তি ও দৃঢ়তা ছিল না কমিউনিস্ট পার্টির। এছাড়া ১৯৪৬ সালের নির্বাচন সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হয় নি। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি কোন দৃশ্যমান

সাফল্য অর্জনেও সমর্থ হয়নি। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করে। ফলে পুলিশি নির্যাতনের মুখে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। ১৯৫০ সালের পর কমিউনিস্ট পার্টি ফিরে আসে সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ধারায়।

১৯৪৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে যোগ দিতে আসা মূলত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টগণ গঠন করে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতো একইভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করে এবং বিপ্লব ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৫১ সালে ফিরে আসে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে। কিন্তু ১৯৫০-এর দশকের পর থেকে পাকিস্তান ও ভারতের রাজনীতির ভিন্নতার প্রেক্ষাপটে উভয় দেশে ও বিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারায় ভিন্নতা আসে।

১৯৫০-এর দশক থেকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে থাকে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুরু করে। পাশাপাশি তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করে। বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া শুরু করে ধর্মের নামে ভিন্ন সংস্কৃতি। অভিন্ন পাকিস্তানের নামে চলে সীমাহীন অর্থনৈতিক শোষণ। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ও তা রক্ষার জন্য সংগ্রাম শুরু করতে হয়। সমগ্র পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি সকল অগ্রসর আন্দোলন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে দলের পক্ষে প্রকাশ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা পুরোপুরি অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলে সে দলের মাধ্যমে কমিউনিস্টদের একটি বড় অংশ কাজ করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করে ধর্মনিরপেক্ষ এক রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হলে এ দলকে সামনে রেখে আন্দোলন করে কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৬০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করে ছাত্রদের দ্বারা। ক্রমান্বয়ে তা তীব্রতা লাভ করে। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবিতে

স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন শুরু করলে কমিউনিস্ট পার্টি ছয় দফাকে মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি না হলেও এ আন্দোলনের সাথে থাকে আওয়ামী লীগের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে মণি সিংহের। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় অধিকাংশ সময় আত্মগোপন করেই মণি সিংহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় আকস্মিকভাবে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। পরে ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের সাথে মুক্ত হলেও একই বছরের (১৯৬৯) মাঝামাঝির দিকে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৮, ৬৯' এর উত্তাল দিনগুলোতে তিনি কারাগারের অভ্যন্তরে থেকে পরামর্শ দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে মণি সিংহ রাজশাহী কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে ৭ এপ্রিল রাজশাহী কারাগারে অন্তরীণ কয়েদিরা মণি সিংহের নেতৃত্বে জেলখানা ভেঙ্গে ফেলে এবং মণি সিংহসহ সকলেই মুক্ত হন। এরপর তিনি ভারতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মণি সিংহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে প্রভাবিত করেছেন গভীরভাবে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নির্দেশনায় ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা গেরিলা বাহিনী সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি মণি সিংহ বহির্বিশ্বের সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মূলত তার পরামর্শ ও পরিকল্পনায় ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ নিয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। মণি সিংহ ভারতের কোচিনে অনুষ্ঠিত সিপিআই-এর কংগ্রেসে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে এবং সে প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন ও সহযোগিতা আদায়ের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তার এ সকল পদক্ষেপ যে সফল হয়েছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো প্রদান এবং সপ্তম নৌবহরের বিপরীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অষ্টম নৌবহর প্রেরণের হুমকি। এভাবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গঠনমূলক

ভূমিকা রাখেন মণি সিংহ। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি মণি সিংহের নেতৃত্বে এগিয়ে যায় দেশের পুনর্গঠন ও সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার দিকে। এ ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদানের নীতি অনুসরণ করে মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে ক্ষমতার পট পরিবর্তনের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক শাসকদের নির্যাতনের শিকার হয়। পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং মণি সিংহসহ পার্টির শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি তাতে অংশগ্রহণ করে। এ দেশ থেকে সেনা শাসন অবসানের ক্ষেত্রে সফল গণ-অভ্যুত্থানে কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

মণি সিংহ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন। ১৯২০-এর দশক থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত থেকেছেন। কমিউনিস্ট আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯২০-এর দশকে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে কৃষক নেতা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতা হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

মণি সিংহ মূলত একজন বিপ্লবী নেতা ছিলেন। তবে তিনি কমিউনিস্ট তত্ত্বকে অনুসরণ করেই বিপ্লবের পথে ধাবিত হয়েছিলেন। অনেকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, মণি সিংহ কেবলমাত্র একজন বিপ্লবী ছিলেন, তাত্ত্বিক ছিলেন না। এই ধারণাটি প্রকৃত অর্থে যথাযথ নয়। তবে তাত্ত্বিকতার চাইতে বিপ্লবের প্রভাব তার মধ্যে বেশি ছিল এবং এটি হয়েছিল সমসাময়িক পরিস্থিতির বিবেচনায়। নেতৃত্ব দানের সকল গুণাবলীই মণি সিংহের মধ্যে উপস্থিত ছিল এবং তার নেতৃত্বের প্রতি পার্টির সকলেই ছিল আস্থাশীল। ১৯৬০-এর দশকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে মতাদর্শগত বিভেদকে কেন্দ্র করে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং কমিউনিস্ট পার্টি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পার্শ্ববর্তী ভারতও এর বাইরে ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের বিভক্তি ছিল সেই তুলনায় নগণ্য। পার্টির একটি ক্ষুদ্র অংশ বের হয়ে আলাদা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করলেও বৃহৎ অংশটি মণি সিংহের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল থাকে। ১৯৬০-এর দশকের পর মণি সিংহের জীবদ্দশাতে পার্টির মধ্যে নতুন করে কোন ভাঙ্গন বা

বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি, যা মহান এই নেতার কৃতিত্বের সাক্ষর বহন করে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর পার্টির সেই ঐক্যকে ধরে আর রাখা সম্ভব হয় নি।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের অভাব। দীর্ঘ সময় পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় এবং পার্টির নেতারা আত্মগোপনে থাকায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং এর নেতৃবৃন্দের সংগ্রামের তথ্য একেবারেই অপ্রতুল। কিন্তু এক্ষেত্রেও মণি সিংহের অবদান অনন্য। তিনি তার সংগ্রাম মুখর জীবন নিয়ে দুই খণ্ডের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবন সংগ্রাম' রচনা করেছেন, যা তার জীবন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বাংলাদেশে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকসহ নিম্ন শ্রেণির মানুষকে সংগঠিত করে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছে কমিউনিস্ট পার্টি। ব্রিটিশ আধিপত্যের ঔপনিবেশিক যুগে উপমহাদেশের প্রতিটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। পাকিস্তান শাসনামলে ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও জাতিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপক্ষের আন্দোলন, গণতান্ত্রিক শাসন বজায় রাখার প্রয়াস, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থেকেছে এ দল। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও যুদ্ধোত্তোর বাংলাদেশে গঠনমূলক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৭০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টি সরকারি দলের সাথে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তবে এসময় কমিউনিস্ট পার্টির উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্দেশের কারণে পার্টিকে অনেক সময়স অনিচ্ছাকৃতভাবে আওয়ামী লীগের সাথে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে হয়। ১৯৮০-এর দশকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এ দল। কমিউনিস্ট পার্টির এসকল কৃতিত্বের অনেকখানিই প্রাপ্য দলের শীর্ষ নেতা মণি সিংহের। কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এ দল বাংলাদেশে সে লক্ষ্য অর্জনে এখনো সক্ষম হয় নি, কিন্তু দেশের সকল প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে, এটিই এ দলের মহান এক কৃতিত্ব।

পরিশিষ্ট

সংযোজনী-১

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের আহ্বান সম্বলিত প্রচারপত্র

সার্কুলার নম্বর ৬ । ১৯৪৯
[বিশেষভাবে কৃষক আন্দোলনের জন্য]
ই. বি. সেন্ট, ১লা মে ১৯৪৯

গত ডিসেম্বর হইতে মার্চ পর্যন্ত ময়মনসিংহ, রংপুর, খুলনা, যশোর, সিলেট, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় গৌরবময় সংগ্রাম হইয়াছে। তাহার পর আসিয়াছে এই মার্চ। পার্টির সভ্যদের অনেকেই ভাবিতেছেন সংগ্রামের প্রথম ঢেউ এইবার শেষ হইল। এইবার আমাদের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সংগ্রামের দ্বিতীয় ঢেউ এর জন্য নতুন নির্দেশ পাঠান দরকার। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ভালভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পর্যালোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। যাহাতে এই সব আন্দোলনের ভুলত্রুটি আর না ঘটে এবং সংগ্রামী জনতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়। কিন্তু এই কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে বিশেষ সময়ে বা বছরের বিশেষ কোন ঋতুতে অথবা শুধু আমাদের দ্বারা সংগঠিতভাবে আন্দোলনের এক একটা ঢেউ আসিতেছে। এ বিষয়ে পার্টি দলিলে সঠিক ভাবেই বলা হইয়াছে, "অর্থনৈতিক সঙ্কট দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্কটের ফলে জনতার যে দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে জনতা মরিয়া হইয়া এখনই সংগ্রাম শুরু করিয়া দিয়াছে" (২. পৃঃ)। ভারতের কৃষি অঞ্চল এক বিরাট আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হইয়াছে এবং ঘন ঘন অগ্নুৎপাত হইতেছে (৬১ পৃঃ)। বর্তমানের সংগ্রামগুলোর অভিজ্ঞতা হইতে কর্মকৌশল সম্বন্ধে দলিলে বলা হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলেও প্রতিরোধ সংগ্রাম দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। কৃষক এবং ক্ষেতমজুরেরা জঙ্গি ও সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন। সরকারের প্রত্যেকটি নীতি, খাদ্য সংগ্রহ, জিনিসের দাম, জমি ও মজুরি নীতির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অসন্তোষই প্রকাশ পাইয়াছে বর্তমানের সংগ্রামগুলির মধ্যে। ইহা সবে শুরু। আগামী মাসগুলিতে সরকারি খাদ্য সংগ্রহ শুরু হইবে। ইহার ফলে ক্ষুদ্র কৃষকদের কষ্ট আরও বাড়িবে। ফলে সরকারকে শস্য না দেওয়ার আন্দোলন শুরু হইবে। ইহারই সাথে খাজনা বন্ধও খোদ চাষীর হাতে জমি দিবার আন্দোলনও দানা বাঁধিয়া উঠিবে।

গত ৮ মাসে সঙ্কটও বাড়িয়াছে, দমননীতিও বাড়িয়াছে। আর ইহারই সাথে দমননীতির বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ ও দানা বাঁধিয়াছে। ফলে জনতার স্বার্থ বলি দিয়া সঙ্কট সমাধান করাও সরকারের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

পার্টি কংগ্রেসর গত এক বছরে পূর্ব বঙ্গে বারবার শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, গরীব কৃষক, শোষিত কর্মচারী, ছাত্র ও মেয়েদের গৌরবময় সংগ্রাম হইয়াছে। এই সব সংগ্রামের নতুন বৈশিষ্ট্য কি? (১) মেহনতকারী জনতার অবিরাম সংগ্রাম হইয়াছে এবং হইবে। এই সংগ্রাম অভাবনীয় অঞ্চল হইতে শুরু হইয়াছে এবং সমস্ত ফ্রন্টেই শুরু হইয়াছে। (২) গ্রামের এই সব সংগ্রামে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকরাই সব চাইতে দৃঢ়তার সাথে লড়িয়াছে ও সংগ্রামের নেতৃত্ব করিয়াছে। (৩) সংগ্রামী জনতা মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া শয়তান জোতদার, দালাল ও পুলিশের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। বর্বর দমননীতি তাহাদের দমাইতে পারে নাই। (৪) আংশিক সংগ্রাম আজ শুধু আংশিক সংগ্রাম নয়। আংশিক সংগ্রাম দ্রুত সশস্ত্র প্রতিরোধের পর্যায়ে উন্নীত হয়। সংগ্রামী জনতা যে প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে, আমরা আসলে তাহাকে ছোট করিয়া দেখিয়াছি।

জনতা আর সেই আগের সন্ত্রাসে ভীত, নিরাপদ জীবনের মোহে পশ্চাৎপদ জনতা নাই। জনতা আজ বিপ্লবী সংগ্রামের সম্মুখীন নতুন জনতা। জনতা আজ ক্রমশ বুঝিতেছে পিছু হটা অসম্ভব। জনতা আজ নিজের প্রকৃত ক্ষমতা দেখিতে পাইতেছে। তাই সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী সাফল্যে জনতার সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

বর্তমান সময়ের আংশিক সংগ্রাম তাই ব্যাপক গণযুদ্ধে পরিণত হয়। সশস্ত্র সংঘর্ষ, ক্ষুদ্র গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। ইহা বৃহদাকারে সুসংগঠিত হইলে সহজেই রাজনীতিক যুদ্ধ ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের অঙ্কুরে পরিণত হয় (তেলেঙ্গানা)। বর্তমান পরিস্থিতির ইহাই বিশেষত্ব। স্থায়িত্বের যুগের মত এই দুই এর ভিতর কোন চীনের দেওয়াল টানা যায় না।" পি-বি ডকুমেন্ট সুতরাং দেশব্যাপী এই নতুন ধরণের আংশিক সংগ্রাম অনবরতই ঘটিতে থাকিবে।

১৯৪৬-৪৭ সালে যেমন বহু জেলা জুড়িয়া ব্যাপক তেভাগা সংগ্রাম হইয়াছিল, এবার সেইরূপ দ্রুত ও ব্যাপক সংগ্রাম না হওয়াতে অনেক কমরেড নিরাশ হইয়াছেন। অনেক বড় বড় জিলার নেতৃস্থানীয় কমরেডরা মনে করিয়াছেন যে, ১৯৪৬-৪৭ সালের মত শ্রমিক আন্দোলনের জোন না থাকার জন্যই বোধ হয় এইরূপ হইয়াছে। ইহা সত্য যে, এই বছরের কৃষক আন্দোলন আমাদের এলাকাতে ১৯৪৬-৪৭ সালের মত ব্যাপক হয় নাই। কিন্তু ইহার কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। যেহেতু নেতৃস্থানীয় কমরেডদের মনেই প্রশ্ন উঠিয়াছে, সেই জন্য উপরোক্ত বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমেই বলা দরকার একথা সত্য নয় যে আগের চেয়ে এখন শ্রমিক আন্দোলনের জোর কম। ধর্মঘটের নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতেই ইহা বুঝা যাইবে:

গড়ে প্রতি বছরে ৬ লাখ ৪০ হাজার ৩৯ জন।
১৯৪৬ সালে ১৯,৪১,৯৪৮ --------১,২৭,১৭,৭৬২
১৯৪৭ ---২২,১৫,৩১৭--------- ১,৫৯,৮৩,৪৬৪
পিপলস এজ, ৭ম খণ্ড ৭নং

১৯৪৮ সালের প্রথম ৪ মাসে ধর্মঘটের জোর বেশ না হইলেও অন্তত একইভাবে চলিয়াছে। (ঐ) ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি হইতে জুনে মোট ধর্মঘটকারী রেল শ্রমিকের সংখ্যা ৩,১০,০০০। ১৯৪৬-৪৭ সালের এই সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা অনেক বেশি। অন্যান্য বড় শিল্পেও একই অবস্থা। ১৯৪৮ সালের পরবর্তী ৬ মাসে ধর্মঘটের সংখ্যা অনেক বেশি। পুঁজিপতিদের এবং সরকারের ক্রমবর্দ্ধমান আক্রমণ সত্ত্বেও শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রাম ও জঙ্গি মনোভাব অভূতপূর্বভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু পূর্ববঙ্গের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে ১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের মত ধর্মঘট সংগ্রাম হইয়াছে এমন আর কোন দিনই হয় নাই।

দ্বিতীয় শ্রমিক অভ্যুত্থানের অগ্রগতি শুধু ধর্মঘটকারী শ্রমিকের সংখ্যা বা দিনের সংখ্যা দিয়া বিচার করিলে চলিবে না। সংগ্রামের দৃঢ়তা ও উন্নত পর্যায়ের সংগ্রামের চেহারাও বিচার করিতে হইবে। এই বছরে প্রায়ই শ্রমিকরা লড়াইয়ের নতুন কায়দা গ্রহণ করিতেছে। প্রায়ই সংগ্রাম সরকারের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষে ও কারখানা দখলের পর্যায়ে গিয়াছে। যেমন আলমবাজারে ট্রাম ধর্মঘটে, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে লালমনিরহাটের রেল শ্রমিকদের সংগ্রামে, প্রভৃতিতে।

তৃতীয়ত মনে রাখা দরকার যে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্রতার ফলেই শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রাম দানা বাঁধে। আজিকার সঙ্কট ১৯৪৬ বা ১৯৪৭ সালের চেয়ে অনেক বেশি। পি-বি ডকুমেন্ট বলা হইয়াছে। "ধনবাদী সঙ্কটের মূল কারণ পাকিয়াই যায়, ইহার সমাধানও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। ফলে নতুন সংঘর্ষ বাধে। তাই প্রতি পদে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মূল কারণ বাড়িয়াই চলে। ইহার ফলে গত ৮ মাসে বিপুল সংগ্রাম দেখা দিয়াছে। শ্রমিক ও কৃষকের বিরাট সংগ্রামের বিরুদ্ধে বর্বর দমননীতি চালান হইয়াছে। ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসন চলিয়াছে।"

পরিশেষে মনে রাখা দরকার যে, এই চরম দমননীতির সামনে এই নতুন অধ্যায়ে যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি ধাপ বুর্জোয়াদের সরাসরি বিরুদ্ধে তখন ক্ষেত মজুর ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সংগ্রাম অভূতপূর্ব স্তরে উন্নীত হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের তুলনায় এবারকার কৃষক সংগ্রাম বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, এবার মেহনতি কৃষক জনতা ও কৃষক দালালের বিরুদ্ধে বারবার সংগ্রাম চালাইয়াছে, যেমন যশোর, খুলনা, রংপুর প্রভৃতি স্থানে। তাহারা সরকারের পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণজয়ী সংগ্রাম চালাইয়াছে, যেমন ময়মনসিংহ ও রংপুরে। বিশেষ করিয়া ক্ষেতমজুররা নিজেদের বাঁচিবার মত মজুরির দাবিতে সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছে এবং সমগ্র কৃষকের নেতৃত্ব করিয়াছে। ক্ষেতমজুর ও মেহনতকারী কৃষকরা বুর্জোয়াদের প্রভাব দ্রুত কাটাইয়া উঠিতেছে এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে যে জমি মজুরি ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে অগ্রসর হইতে হইবে (৯ই মার্চ রেল শ্রমিকদের সমর্থনে দিনাজপুরের ঝরিয়া, ডোমরাদাহ প্রভৃতি অঞ্চলে মেহনতি কৃষকদের শোভাযাত্রা)।

সুতরাং এ বছরের কৃষক সংগ্রামের গুরুত্ব ছোট করিয়া দেখিলে খুবই ভুল হইবে। শুধু আমাদের ঘাঁটি করিয়া যদি গোটা দেশ হিসাবে দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে আগের তুলনায় এবার সংগ্রাম অনেক বেশি হইয়াছে। গ্রামের দিকে সংগ্রাম আরও বেশি, আরও ব্যাপক ও আরও উচ্চতর পর্যায়ে অবিরাম ঘটিবে না বলার অর্থ নিছক পরাজয়ের মনোভাব ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রামের দিকের আন্দোলনের গতিও আগের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে আরও ব্যাপক উচ্চতর পর্যায়ে সংগ্রাম হইল না কেন? ইহার কারণ খুঁজিতে হইবে অন্যত্র পার্টির ভিতর।

১. পার্টির ভিতর সংগ্রাম বিরোধ মনোভাব ব্যাপক দ্রুত বর্তমান কৃষক সংগ্রামের পথ রোধ করিয়াছে। সংগ্রাম সম্পর্কে পার্টির ভিতর প্রবল দোলায়মান মনোভাব থাকার জন্য পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারিয়েট হইতে গত অক্টোবর মাসে সংগ্রাম প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় (৪নং সংগঠন)। ফসল কাটার সময়কার সংগ্রামের ব্যাপারে অক্টোবর মাসও অনেক দেরী হইয়া গিয়াছিল। ইহার চেয়েও গুরুতর বিষয় হইতেছে যে, ইহার পরও ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রাদেশিক নেতৃত্বের ভিতর দোলায়মান মনোভাব চলিতে থাকে। জিলার অবস্থা ছিল আরও গুরুতর। নভেম্বরের মধ্যভাগেও দক্ষিণের দুইটি জিলার কমিটি সংগ্রামের বিষয়ে দোলায়মানতার পরিচয় দেয়। তাহারা সংগ্রাম বনাম আয়োজন হিসেবে বিষয়টি উপস্থিত করে। জানুয়ারিতে ময়মনসিংহ জিলা কমিটি সংগ্রামের ব্যাপারে একমত হয়। অক্টোবরের শেষ ভাগেই রংপুর জিলা কমিটি সংগ্রাম প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী স্লোগান দিতে থাকে ও সংগ্রামের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে থাকে। তবু নানারূপ ভ্রান্তি থাকিয়া যায়। দিনাজপুর সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেয় বটে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে। অন্যান্য জিলায়ও প্রায় একই অবস্থা। এই সমস্ত হইতে একটি সিদ্ধান্তই করা যায়, তা হচ্ছে পার্টির ভিতর অনেক ভাল কমরেড আছেন যাহারা গণসংগ্রামকে পরিচালিত করিতে চান এবং শ্রেণী সংগ্রামকে অগ্রসর করাইতে যাইয়া বীরের মত বুলেটের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং মৃত্যুকে

তুচ্ছ করিয়াছেন। আবার পার্টির ভিতর এমন কমরেড আছেন যাহারা চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদে আচ্ছন্ন।

২. বহু দিনকার সংস্কার বাদ নীতির ফলে পার্টি যে শুধু ভুল নীতিই চালাইয়া আসিতেছে তাহাই নয়, পার্টি ভুল শ্রেণীর উপর ভিত্তি করিয়াছেন। শ্রমিক, ক্ষেত মজুর ও গরীব কৃষককে প্রধানত উপেক্ষাই করা হইয়াছে। গ্রামের দিকে পার্টিতে ও কৃষক সমিতিতে ভিত্তি ছিল মাঝারি কৃষকের নেতৃত্বে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধনী কৃষকের পর্যাপ্ত নেতৃত্ব ছিল। আমাদের পার্টি সংগঠনের কর্মীরা প্রধানত ছিল পেটিবুর্জোয়া। ইহার ফল হইল মারাত্মক। এইসব দুর্বলচেতারা সংখ্যায় বেশি না হইলেও সব ইউনিটের ভিতরই ছিল। সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিবার সময়ে ইউনিটে ইহারা দোলায়মান অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। চরম দমননীতির সামনে ইহারা পিছু হটিয়াছে। ইহারা সংগ্রামী শ্রমিক ও গরীব কৃষকের মাঝে ভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। সংগ্রামের নেতৃত্বের জন্য ইহারা মাঝারি কৃষকের উপর নির্ভর করিয়াছে। ইহারা ক্ষেত মজুরের সংগ্রাম ও সংগঠনকে বানচাল করিয়া দিয়াছে এবং ক্রমবর্দ্ধমান সংগ্রামের পিঠে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। গ্রাম্য বুর্জোয়া গণ কৃষকের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামকে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। ক্ষেতমজুরদের মজুরির জন্য ধর্মঘট সংগ্রামের উপর আদৌ জোর দেওয়া হয় নাই।

৩. মার্কসবাদ লেনিনবাদের অভাব আমাদের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পক্ষে টানিয়া নামাইয়াছে। ইহারই ফলে একদিকে স্থানীয় মনোভাব এবং অপর দিকে হীন জাতীয়তাবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রমিক আন্তর্জাতিকতাবাদ আমাদের পার্টির ভিতর খুবই দুর্বল ছিল। বুর্জোয়ারা যখন পাকিস্তান রক্ষার আওয়াজ তুলিল আমরা তখন আক্রমণমূলক নীতি গ্রহণ করিয়া ঐ আওয়াজের মুখোশ খুলিয়া ধরিলাম না। বুর্জোয়াদের 'মুসলিম রাজের' প্রচারের প্রভাব হইতে আমাদের ঘাঁটির মেহনতি কৃষকরাও রেহাই পাইল না। মুসলিম কৃষকরা সংগ্রামী হিন্দু কৃষকের আগে যোগ দিতে ভয় পাইল। হিন্দু কৃষকরা ও মুসলিম কৃষকদের নিকট সংগ্রামের প্রচারে আগাইল না। সংকীর্ণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ আমাদের ভিতর পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মাউন্টব্যাটেন বিভাগের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে দুর্বল করিয়াছে।

৪. ক্রমবর্দ্ধমান গণসংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের মনোভাব আমলাতান্ত্রিক মনোভাব হইতে কিছুমাত্র কম নয়। ইহা ঘোর সংস্কারবাদেরই পরিচায়ক। আমরা ভাবিয়া ছিলাম আমরা ডাক দিলেই সংগ্রাম শুরু হইবে। তাই আমরা ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের দিয়া সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তুলি নাই। এই সব সংগ্রাম কমিটিই যে সংগ্রামের হাতিয়ার হইবে ইহার পরম তাৎপর্য আমরা বুঝি নাই। সংগ্রাম কমিটি গ্রাম্য মোড়লদের কমিটি হইবে না। এই কমিটি হইবে সংগ্রামী মজুর ও গরীব কৃষকের কমিটি। এই কমিটি জনতার বিপ্লবী উদ্যোগ ছড়াইয়া দিবে।

৫. এই সব দক্ষিণপন্থী মূল বিচ্যুতি সংগ্রামকে বাধা দিয়াছে বা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং যে সব স্থানে সংগ্রাম হইয়াছে তাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। এই সব বিচ্যুতি সংগ্রামের আয়োজনকেও বিলম্ব করিয়াছে। সংগ্রামের সময় বান চাল করিয়া দিয়াছে। সাংগঠনিক আয়োজনে বাধা দিয়াছে। মেহনতি জনতার সংগ্রামকে পরিচালনা করার ব্যাপারে সমগ্র পার্টি যদি দ্বিধাহীনভাবে ঐক্যবদ্ধ হইত তাহা হইলে আয়োজনও হইত, সংগ্রামও হইত। শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী হিসেবে কাজ না করিয়া পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড় হইয়া চলিয়াছে। ইহারই জন্য সংগ্রামকে উচ্চতর স্তরে উঠান যায় নাই। প্রদেশের সর্বত্র ছড়ান যায় নাই। (সমগ্র অবস্থা বর্ণনা করিয়া পি, সির আত্মসমালোচনা মূলক রির্পোট প্রস্তুত করা হইতেছে)।

এখন বোঝা যাইবে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ পার্টির ভিতর কি সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। এই সম্পর্কে দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবেঃ (১) দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ বারবার মাথা চাড়া দিয়া সংগ্রামে বাধা দেয় এবং (২) এই সব সত্বেও পার্টির ভিতর দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সংগ্রাম করা হইতেছে না। দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীদের সম্বন্ধে আপোষী মনোভাব হিসেবে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ পার্টির ভিতর বেশ ব্যাপকভাবেই আছে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, এই আপোষী মনোভাব বিপ্লবে ও শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং গ্রামে এখনই পার্টির সামনে তিনটি কাজ রহিয়াছেঃ

১. আরো দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম পরিচালিত ও গংগঠিত করা : মেহনতি জনতার যে সংগ্রাম ফাটিয়া পড়িতেছে এবং অবিরত ফাটিয়া পড়িবে সেই সংগ্রামে অবিরাম নেতৃত্ব দিতে হইবে।

(ক) ক্ষেতমজুরদের মজুরের দাবিতে ধর্মঘট সংগ্রাম চালাও।

(খ) খাদ্য দখলের জন্য মেহনতি জনতার সংগ্রাম চালাও। ১০ একরের কম জমিগুলো কৃষকের খাদ্য লিজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন চালাও।

(গ) জমিদারের জমি দখল কর এবং উচ্ছেদ প্রতিরোধ কর।

(ঘ) পাটের ট্যাক্স, তামাকের ট্যাক্স, চৌকিদারী ট্যাক্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর।

(ঙ) খাজনা বন্ধ আন্দোলন সংগঠিত কর।

(চ) দমননীতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ কর।

এই সব করিতে যাইয়া প্রয়োজন হিসেবে সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত আন্দোলন চালাইতে হইবে। সশস্ত্র গণ-প্রতিরোধ সম্পর্কে খুব ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে হইবে। পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আবার বলা দরকার যে, সরকারের বর্বর দমন নীতি তাহাদের দুর্বলতা ও জনতা হইতে বিচ্ছিন্নতারই পরিচায়ক। শক্তির পরিচয় নয়।

২. **ব্যাপক রাজনীতির প্রচার চালাও :** সমগ্র প্রদেশব্যাপী ও জিলার সর্বত্র ব্যাপক ও নিয়মিত রাজনৈতিক প্রচার চালাইতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে, আজ ধনী কৃষক শাসকশ্রেণীর শিবিরে রহিয়াছে। ইহার ফলে প্রতিটি গ্রাম যেমন আমাদের ঘাঁটি তেমনই যতক্ষণ পর্যন্ত ধনি কৃষকদের বিরুদ্ধে লড়াই না করা হইতেছে এবং তাহাদের প্রতিরোধ নির্মূল না করা হইতেছে, দালালদের দমন না করা হইতেছে, ততক্ষণ প্রতিটি গ্রামে শাসক শ্রেণীরও ঘাঁটি থাকিয়া যাইতেছে। একথা মনে রাখিতে হইবে প্রতিটি গ্রামই গভীরতম সঙ্কটের আবদ্ধে পড়িয়াছে এবং বুর্জোয়া ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিবার জন্য প্রতি গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই মুহূর্তের প্রয়োজন হইতেছে:

(ক) জিলাব্যাপী মুখোশ খোলার কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে।

(খ) জিলাব্যাপী সংগ্রামী ইস্তাহার ছড়াইতে হইবে।

(গ) উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থা করিয়া গেরিলা কায়দায় সভা ও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মার্চ।

(ঘ) পুস্তিকা বিক্রয় ও ব্যাপক পোস্টার লাগানো।

(ঙ) হাটে জঙ্গি স্কোয়াড প্রেরণ ও তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা।

(চ) দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের খবর সর্বত্র ব্যাপক প্রচার করা।

(ছ) কৃষকদের দাবি ও তাহাদের সংগ্রাম শ্রমিক, ছাত্র ও অন্যান্য মেহনতি জনতার ভিতর প্রচার করা।

(জ) শ্রমিক আন্তর্জাতিকতা প্রচার কর এবং উভয় ডোমিনিয়নের শ্রমিক ও মেহনতি জনতার সংগ্রামী ঐক্য প্রচার কর।

(ঝ) অগ্রণীরা এক একটি সংগ্রাম এলাকার সংগ্রামী জনতার সাথেই থাকবে। গোপনে থাকিবার নাম করিয়া অন্য এলাকায় চলিয়া যাইবে না। অবশ্য দুই এক জন বিশিষ্ট নেতা সংগ্রামী কৃষকের অনুমতি পাইলে কাছাকাছি থাকিয়া যোগাযোগ রক্ষার কাজ প্রভৃতি চালাইতে পারে।

৩. **পার্টি পুনর্গঠিত কর ও দোলায়মানদের দূর কর :** সংস্কারবাদ ঝাটাইয়া দূর করিয়া পার্টি পুনর্গঠিত করিলেই এই সব কাজ চালু করা সম্ভব।

(ক) দোলায়মানদের দূর করিয়া দিতে হইবে। দোলায়মানদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দোলায়মানতার প্রশ্রয় দিলে চলিবে না।

(খ) সংগ্রামস্থানে দাঁড়াইয়া সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে হইবে। সুতরাং সমস্ত জঙ্গি ও সংগঠকদের মার্কসবাদ লেনিনবাদ পড়িতে হইবে এবং নিজেদের নতুন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। জনতার উদ্যোগে বিশ্বাসী হইতে হইবে। সঠিক পথে দৈনন্দিন নেতৃত্ব দিবার উপযোগী হইতে হইবে।

(গ) সাফল্যের জন্য কৃষকের উপর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব উপযুক্তভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৪. **নিম্নলিখিত সাংগঠনিক আওয়াজ কাজে পরিণত কর:**

(ক) ক্ষেতমজুর সমিতি গঠন কর।

(খ) গরীব কৃষকের নেতৃত্বে কৃষক সমিতি পুনর্গঠিত কর।

(গ) সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তোলা।

(ঘ) জঙ্গি ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন কর।

(ঙ) পুস্তিকা, ইস্তাহার প্রভৃতি বিলির জন্য উপযুক্ত কুরিয়ার ব্যবস্থা ও সংগঠন গড়িয়া তোল।

(চ) বে-আইনি পার্টি গঠন কর এবং জঙ্গি কর্মীদের পার্টিতে সংগঠিত কর। এইসব সংগঠনিক কাজ এখনই করিতে হইবে।

কমরেডস, বিপ্লবের শক্তিকে ছোট করিয়া দেখা আত্মহত্যারই শামিল। সোভিয়েতের দুর্ভেদ্য শক্তি জনতার গণতন্ত্রের ও দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি, নানকিং এর পতন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চূড়ান্ত সাফল্য, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়ও ভিয়েতনামের ক্রমবর্দ্ধমান মুক্তিসংগ্রাম এই সমস্তই আমাদের আসন্ন সংগ্রামের সূচনা করিতেছে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মরিয়া হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিয়া নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী শান্তির জন্য বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তুলিতেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, সাম্রাজ্যবাদীদের এই যুদ্ধপ্রচেষ্টা তাহাদেরই মাথায় বাজ হানিবে এবং তাহাদের চূর্ণ করিয়া দিবে। এই মুহূর্তে আমাদেরই দেশে শ্রমিক শ্রেণীর অস্পষ্ট জাগরণ উচ্চতর পর্যায়ে উঠিতেছে শোষিত জনতার বিক্ষোভ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সব সময় পড়িতেছে।

আসুন, আমরা নিজেদের নতুন করিয়া শিক্ষিত করিয়া তুলি, যে নতুন জনতা আমরা দেখিতেছি তাহাদের উপযুক্ত হই।

(এই সার্কুলার পাওয়ার ১০ দিনের ভিতর প্রত্যেক জিলা কমিটি কৃষক রক্ষণের কমিটি তৈরি করিয়া পাঠাইবেন।)

সংযোজনী-২

১৯৫০ সালে নাচোল কৃষক বিদ্রোহের নেত্রী ইলামিত্র পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত হবার পর প্রদত্ত জবানবন্দি যা সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি লিফলেট আকারে প্রচার করেছিল:

কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।
বিগত ৭-১-৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেপ্তার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সব কিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস আই আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দি করে রাখে। আমাকে কোন খাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতে এস আই-এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময় আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর আমার কাপড়-চোপড় আমাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবত এস আই-এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না।

যে কামরাটিতে আমায় নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল এবং সে সময়ে চারিধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিলা তারা বলেছিল যে আমাকে "পাকিস্তানী ইনজেকশন" দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময়ে তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিল। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলেছিল। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেল 'কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিল না।'

সেলের মধ্যে আবার এস আই সিপাইদেরকে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিল এবং বললো "এবার সে কথা বলবে।" তারপর চার-পাঁচ জন সিপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিৎ করে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌন অঙ্গের মধ্যে একটা গরম সেদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিল। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

৯-১-৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এস আই এবং সিপাই আমার সেলে এসে তাদের বুটে করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো। এরপর আমার ডান পায়ের গোঁড়ালিতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময়ে আধা অচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস আইকে বিড় বিড় করে বলতে শুনলাম, আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস আই এবং সিপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিল। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজি হলাম না তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সিপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

পরদিন ১০-১-৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে, আর আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জ জেল গেটের সিপাইরা জোর ঘুষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো।

সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম। কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন সিপাই একটি সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেল। তখনো রক্তপাত হচ্ছিল এবং খুব বেশি জ্বর ছিল। সম্ভবত নবাবগঞ্জ সরকারি হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিল ১০৫ ডিগ্রি। যখন তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনলেন তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ঔষধ এবং কয়েক টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো। ১১-১-৫০ তারিখে সরকারি হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার

অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেটি জানি না। তিনি আসার পর আমার পরনে যে রক্তমাখা কাপড় ছিল সেটি পরিবর্তন করে একটা পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হলো। এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব বেশি জ্বর ছিল, তখন আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

১৬-১-৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসা হলো এবং আমাকে বলা হলো যে, পরীক্ষার জন্য আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশি শরীর খারাপ থাকার জন্যে আমার নড়াচড়া সম্ভব নয়, এ কথা বলায় লাঠি দিয়ে আমাকে একটা বাড়ি মারা হলো এবং স্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এরপর আমাকে অন্য এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি সেখানে কিছুই বলিনি, কিন্তু সিপাইরা জোর করে একটা সাদা কাগজে সই আদায় করল। তখন আমি আধা অচেতন অবস্থায় খুব বেশি জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিল সে জন্যে আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হলো। এরপর আমার শরীরের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হলো তখন আমাকে ২১-১-৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানে জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো। কোন অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলিনি এবং উপরে যা বলেছি তার বেশি আমার আর বলার কিছু নেই।

তথ্যসূত্র :

(ক) বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, জানুয়ারি, ১৯৯৬), পৃ.২১৩-১৪;

(খ) মালেকা বেগম, *ইলা মিত্র*, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৯৭-৯৮।

(গ) মেসবাহ কামাল ও ঈশানী চক্রবর্তী, *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ: সমকালীন রাজনীতি ও ইলা মিত্র* (ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি, ২০০১) পৃ.১৪০-৪২;

(ঘ) সুস্নাত দাশ, *অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম: তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার*, (কলিকাতা: নক্ষত্র প্রকাশন,২০০২), পৃ.২০১-২;

(ঙ) ধনঞ্জয় দাশ, *আমার জন্মভূমি স্মৃতিময় বাঙলাদেশ*, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭১) পরিশিষ্ট-২ এবং

সংযোজনী-৩

(ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত দলিলপত্র)

বাংলা ভাষার অধিকার ও সকল ভাষার সমান মর্য্যাদা কায়েম করুন

পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজিমউদ্দীন গত ২৭শে জানুয়ারি ঢাকায় বক্তৃতা দানকালে "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে" বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন আমরা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছি।

১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন জনাব নাজিমউদ্দীন প্রবল গণ-আন্দোলনের চাপে বাংলা ভাষা সম্পর্কে যে ওয়াদা করিয়াছিলেন, এই ঘোষণা জাতির জন্মগত অধিকার ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার কাড়িয়া নিতে উদ্যত হইয়াছেন। নিজের শোষণের সুবিধার জন্য জনগণকে পশ্চাৎপদ রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজ আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করিয়া জনগণের শিক্ষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির পথরুদ্ধ করিয়াছিল। পাকিস্তানের বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ও জনগণকে নিরক্ষর ও পশ্চাৎপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য বাংলার উপর আরবী হরফ চাপানো ও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিয়া জনগণের শিক্ষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছে।

ভাষার ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য লীগ নেতারা বলিয়া থাকেন যে, "ইসলামী তমদ্দুন" ও 'জাতীয় সংহতির' জন্য একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা দরকার।

কিন্তু এই যুক্তি অসার। যেখানে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির বাস, যেখানে পাকিস্তানের অর্ধেকের বেশি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন, যেখানে সমস্ত দেশ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে, সেখানে "ইসলামী তমদ্দুনের" নামে কেবল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপাইয়া দিলে সমস্ত জনগণের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

যদি প্রত্যেকের ভাষাকে সম মর্য্যাদা দেওয়া না হয়, যদি বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণকে নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্রের কাজ চালাইবার অধিকার দেওয়া না হয় তাহা হইলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ভিতর সংহতির পরিবর্তে আসিবে জাতিগত প্রদেশগত রেশারেশি ও বিভেদ।

পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ভাষা ও কৃষ্টিগত উন্নতির উপরই পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতি ও সংহতি নির্ভর করে। পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি যেমন-বাঙালি, পাঞ্জাবি, পাঠান, সিন্ধি বেলুচি-প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী উন্নতি লাভ করুক, সমস্ত ভাষা যেমন-উর্দু, বাংলা, পুস্ত, পাঞ্জাবি, সিন্ধি সমস্ত ভাষাকেই রাষ্ট্রে সমান অধিকার দেওয়া হোক-ইহাই পাকিস্তানবাসী সকল জাতির কাম্য। কিন্তু লীগ সরকার উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করার চেষ্টা করিয়া শুধু বাঙ্গালির অধিকার ও কৃষ্টির উপরই আক্রমণ করিতেছেন। ইহাতে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হইবে। তাই 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা ও সকল ভাষার সম মর্য্যাদা দান'-পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী ব্যক্তির দাবি। এই দাবির পিছনে বাঙালি-অবাঙালি সকল জনসাধারণকে সমবেত হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি অতীতের ন্যায় এবারও বাঙালি-অবাঙালি বিরোধ উস্কাইয়া ভাষা আন্দোলনকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করিবে। এই বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে সজাগ থাকিয়া বাঙালি-অবাঙালি সকলকেই আজ বুঝিতে হইবে যে, ভাষার অধিকারের জন্য এই আন্দোলন উর্দু বিরোধী বা অবাঙালি বিরোধী আন্দোলন নহে। ইহা সরকারের বিরুদ্ধে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন। ভাষার ক্ষেত্রে লীগ সরকারের স্বেচ্ছাচারী নীতিকে ব্যর্থ করার জন্য বাঙালি-অবাঙালি সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই আজ প্রয়োজন।

ঢাকার ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকগণ ৩০শে জানুয়ারি ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা করিয়া প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধত ঘোষণার সমুচিত জবাব দিয়াছেন ও বাংলা ভাষার ন্যায় অধিকার কায়েম করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ৩১শে জানুয়ারি বিভিন্ন দলের মিলিত সভায় বাংলাভাষার অধিকারের দাবি ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালন করিয়া ভাষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার

জন্য সকল দল ও প্রতিষ্ঠান আহ্বান জানাইয়াছেন। আমরা জনসাধারণের এই সংগ্রামকে মোবারকবাদ জানাইতেছি।

আমরা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণী, দল, প্রতিষ্ঠান বাঙালি-অবাঙালি সমস্ত জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে বিরাট ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দ্বারা বাংলার উপর আরবী হরফ চাপানোর চক্রান্তকে ব্যর্থ করুন এবং বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা ও উর্দু ভাষার সমান মর্য্যাদা দানের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে প্রতিষ্ঠা করুন। এই আন্দোলনকে সফলভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রদেশের সর্বত্র শহরে ও গ্রামে সর্বদলীয় শহর কমিটি ও মহল্লা কমিটি গঠন করুন।

২ শরা ফেব্রুয়ারী

পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

পি ও সি
সার্কুলার নং ১০

রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন

প্রিয় কমরেডস,

২৭শে জানুয়ারী ঢাকার সভায় বক্তৃতা দানকালে প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দীন সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে–"উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে।" এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে আবার রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত উক্তির প্রতিবাদে ও 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার' দাবিতে ৩০শে জানুয়ারি ইউনিভারসিটি ছাত্রদের নেতৃত্বে প্রথম প্রতীক ধর্মঘট, সভা শোভাযাত্রা হয় এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। ৩১শে জানুয়ারি 'রাষ্টভাষা আন্দোলন' পরিচালনার জন্য একটি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' গঠিত হয়।

'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্তের প্রতি বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি, পরিপূর্ণ সমর্থন জানান। সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের যুক্ত প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট দারুণভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে–সমস্ত স্কুল কলেজে পরিপূর্ণ হরতাল পালিত হইয়াছে। ইউনিভারসিটি প্রাঙ্গণে বিরাট সভা হইয়াছে এবং সভার পর প্রায় $\frac{১}{২}$/২ মাইল লম্বা বিরাট এক শোভাযাত্রা সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। ঢাকা শহরে এত বড় শোভাযাত্রা পূর্বে আর কখনও হয় নাই। এই শোভাযাত্রার প্রধান আওয়াজ ছিল বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই, সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি চাই।

বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি ও ইউনিভারসিটি রাষ্ট্রভাষা কমিটি ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালন করার আহবান জানাইয়াছেন। সারা প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত করার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা খুবই জরুরি।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন পূর্ববঙ্গে একটি শক্তিশালী গণ আন্দোলন হিসেবে গড়িয়া ওঠে। সেই সময়ের শক্তিশালী ভাষা আন্দোলনের চাপে পড়িয়া স্বয়ং

নাজিমউদ্দীন সাহেবই ওয়াদা করিয়াছিলেন যে বাংলা ভাষাও যাহাতে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য হয়, তাহারই ব্যবস্থা তিনি করিবেন। কিন্তু নাজিমুদ্দীন সাহেবই সেই ওয়াদা খেলাপ করায় রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন আবার শুরু হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের আন্দোলন হইতেও এবারের আন্দোলন অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকারের স্বরূপ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। এই সময়ে রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালিত হইলে পূর্ববঙ্গের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং বাঙালি ও অন্যান্য জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া আগাইয়া যাইবে।

অতএব রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এবং একটি শক্তিশালী ও ব্যাপক গণ আন্দোলনে পরিণত করার জন্য পার্টিকে আজ সঠিক কর্মপন্থা লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

'বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কর' এই দাবি বাঙালি জাতির জাতীয় অধিকারের দাবি, এই দাবি বাঙালি জাতির জন্মগত অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি। অতএব রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন বাঙালি জাতির জাতীয় অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন কেবল বাঙালি জাতিরই আন্দোলন নয়, রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতি যেমন বাঙালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পাঠান, বেলুচি প্রভৃতি সকল জাতির ভাষা ও কৃষ্টিকে সম মর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন, এই আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতির সমগ্র জনসাধারণের আন্দোলন।

রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন ১৯৪৮ সালেই পূর্ববঙ্গে একটি শক্তিশালী আন্দোলন হিসেবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবারও সেই আন্দোলন যে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আন্দোলনের দুর্বলতাগুলি লক্ষ্য করিয়া তাহা দূর করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার।

আন্দোলনের দুর্বলতা: রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন এখনও বাঙালি জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ! অবাঙালি ছাত্র ও জনসাধারণ এখনও এই আন্দোলনে তাহাদের যোগ্য

অংশগ্রহণ করে নাই এবং অবাঙালি জনসাধারণের মধ্যে এই আন্দোলন সম্পর্কে নানারকম ভুল ধারণা আছে। অনেক অবাঙালি এই আন্দোলন উর্দু বিরোধী মনে করিয়া এই আন্দোলনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এবং বিরোধী ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। অতএব রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে অবাঙালি ও বাঙালির মধ্যে যে ভুল ধারণা আছে, তাহা দূর করার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদের আন্দোলন যে পাকিস্তানের প্রত্যেক জাতিই যাহাতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করার অধিকার পায়, তাহারই জন্য আন্দোলন তাহা খুব ভাল করিয়া বাঙালি-অবাঙালি সকলকেই বুঝাইতে হইবে।

(ক) এই আন্দোলনের আর একটি বিশেষ দুর্বলতা এখনো রহিয়া গিয়াছে। কারণ এই আন্দোলন এখনও পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে প্রসার লাভ করে নাই। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন এখনও প্রধানত শহরে ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। পাকিস্তানের মজুর ও কৃষক শ্রেণী এখনও এই আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। পাকিস্তানের মজুর (বিশেষ করিয়া রেল মজুর) ও কৃষক শ্রেণী যাহাতে এই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আন্দোলনকে সঠিকপথে নিয়া যাওয়ার জন্য আগাইয়া আসিতে পারে, তার জন্য আমাদের পার্টির তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার।

'উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার' পেছনে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর কি মতলব, তাহা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের নিকট এবং বিশেষ করিয়া বিভিন্ন জাতির মজুর কৃষক শ্রেণীর নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত জরুরি। পাকিস্তানের বাঙালি, পাঞ্জাবি, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি প্রভৃতি সকল জাতির জনগণকে অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বাংলার উপর আরবী হরফ চাপানো ও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ব্যবস্থা করিতেছি। পাকিস্তানের মজুর, কৃষক–অগণিত জনসাধারণ যাহাতে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে, তার জন্য শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিকে নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার ও রাষ্ট্রের কাজ চালাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। অতএব 'উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পেছনে মজুর ও কৃষক শ্রেণীকে

অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখার ও শোষণ ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখার যে মতলব শাসকগোষ্ঠীর রহিয়াছে সেই মতলবকে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরা প্রয়োজন। তবেই আমরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির সমগ্র জনসাধারণের আন্দোলনে পরিণত করিতে সমর্থ হইব।

আমাদের হুঁশিয়ারিঃ রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন যাহাতে কোন অবস্থায়ই প্রাদেশিকতার খাতে প্রবাহিত হইতে না পারে, সেই সম্পর্কে আমাদের বিশেষ হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। যদিও এবারের আন্দোলন অনেক বেশি সুস্থ আবহাওয়ার মধ্য দিয়া চলিতেছে। তবুও এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে এই আন্দোলনে প্রাদেশিকতার মনোভাব আনার জন্য সরকারের তরফ হইতে প্রচেষ্টা আছে এবং থাকিবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও তাই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনকে প্রাদেশিকতার পথে নিয়া যাওয়ার চেষ্টা নিবে। এই আন্দোলনের উপর প্রাদেশিকতার ছাপ দিবার জন্য সরকারের তরফ হইতে প্রচেষ্টা চলিয়াছে। অতএব এই বিষয়ে আমাদের খুব হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

সকল ভাষার সমমর্য্যাদা দান—এই শ্লোগানের উপর বিশেষ জোর দিয়া আমাদের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির ভাষা ও কৃষ্টির উন্নতির জন্য সমান সুযোগ ব্যবস্থার উপরই আমাদের প্রধান জোর দিতে হইবে। তাই আমরা এই আন্দোলনকে প্রাদেশিকতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া অগ্রসর করিয়া নিতে সমর্থ হইব।
(খ) আন্দোলনে বিভ্রান্তি ও বিভেদ আনার জন্য সরকারি প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ হুঁশিয়ার হওয়া প্রয়োজন।

'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' সম্পর্কে ভুল ধারণা ও জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য সরকার প্রচার করিতেছেন যে 'ইসলামী তমুদ্দুন' ও 'মুসলিম সংহতির জন্য উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হইতেছে। সরকারের এই যুক্তি যে কত অসার তাহা জনসাধারণের নিকট ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সকল

মুসলমানের একই ভাষা নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমান বাস করিতেছে। অতএব একই ভাষার মাধ্যমে কখনও বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির কৃষ্টিগত উন্নতি হইতে পারে না। বরং সকল ভাষার সমমর্যাদা ও সকল জাতির নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্র কার্য পরিচালনার সুযোগ না দিলে সংহতির পরিবর্তে বিভেদ বাড়িবে। একমাত্র সকল ভাষাকে রাষ্ট্রের সমমর্যাদা দানের ভিতর দিয়াই সকল ভাষাভাষী জাতির ঐক্য গড়িয়া ওঠা সম্ভব। অতএব 'ইসলামী তমদ্দুন' মুসলিম সংহতির নাম করিয়া উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা যে খাটে না; তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে।

আর একটা বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এই আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী নানা ভাবে প্রচেষ্টা চালাইবে। আন্দোলনে বিভেদ আনার জন্য ও দমননীতি প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাঙালি-অবাঙালির বিরোধ উস্কাইবার নানা রকম প্রচেষ্ট শাসকগোষ্ঠী করিবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির তরফ হইতে যে সকল ষড়যন্ত্র চলিতে পারে সেই সম্পর্কে পূর্ব হইতেই আমাদের সজাগ থাকিতে হইবে এবং তাহাদের সকল ষড়যন্ত্রকেই বানচাল করিতে হইবে। এই আন্দোলনের পেছনে যাহাতে বাঙালি-অবাঙালি সকল ভাষাভাষীর জাতির ঐক্য গড়িয়া ওঠে তাহারই চেষ্টা নিতে হইবে।

কমরেডস,
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের স্লোগানকে আরও বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরা প্রয়োজন।

পাকিস্তানের সকল ভাষার সমমর্যাদা চাই, *পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির নিজ নিজ শিক্ষা করার ও রাষ্ট্র কার্য পরিচালনার অধিকার চাই, *বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই—এই তিনটি স্লোগান একই সঙ্গে জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরা প্রয়োজন তবেই রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে পাকিস্তানে সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিবে।

২১শে ফেব্রুয়ারির সাধারণ ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন।

আমাদের কাজ

১. মজুর শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ করিয়া বাঙালি-অবাঙালি রেল মজুরদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে মজুর শ্রেণী যাহাতে বিশেষ ভূমিকা লইয়া অগ্রসর হইতে পারে, তার জন্য আমাদের তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বাঙালি-অবাঙালি রেল মজুর রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিলে এই আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে আগাইয়া যাইবে। অতএব লিফলেট, পোস্টার ও ছোট ছোট বৈঠক মারফৎ রেল মজুর এবং অন্যান্য মজুর শ্রেণীর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

২. গ্রামাঞ্চলে কৃষক শ্রেণী যাহাতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আগাইয়া আসে, তার জন্যও আমাদের তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। ২১শে ফেব্রুয়ারি গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলিতে ও যাহাতে হরতাল পালিত হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন। এখন হইতেই সভা মারফৎ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

৩. উর্দু ভাষাভাষী ছাত্র শিক্ষক সাহিত্যিকদের মধ্যে ভালভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রগতিশীল উর্দু সাহিত্যিক, শিক্ষক ও ছাত্রদের নিকট হইতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বিবৃতি আদায়ের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। উর্দু ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে উর্দু ভাষায় প্রচারপত্র পোস্টার ইত্যাদির...দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

৪. রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া জেলায় জেলায় ও স্থায়ীভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষাা কমিটি গঠন করুন।

৫. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রচার, সাধারণ ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা করার ব্যবস্থা করুন।

৬. প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উস্কানি সত্ত্বেও ২১শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ সভা ও শোভাযাত্রা যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে চলে, সেদিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। ২১শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘটকে শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সর্বদলীয় কমিটির নেতৃত্বে ভলান্টিয়ার দল গড়িয়া তোলার উপর জোর দিন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালিত হইলে এই আন্দোলনের পেছনে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি ও বিভিন্ন শ্রেণী সমবেত হওয়ার দারুণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া পাকিস্তানের প্রত্যেক ভাষাভাষী জাতির জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন ও আগাইয়া যাইবে। অতএব রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য এবং আন্দোলনকে সারা প্রদেশব্যাপী গণভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার জন্য প্রত্যেকটি পার্টি ইউনিট ও পার্টি সভ্য সম্মিলিতভাবে কার্যকরী প্ল্যান লইয়া অগ্রসর হউন।

এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া বহু কর্মী ও পার্টি মিলিট্যান্ট বাহির হইয়া আসিবেন। অতএব এই নতুন কর্মীদের পার্টি গ্রুপে সংগঠিত করা ও পার্টি নীতিতে শিক্ষিত করিয়া তোলা পার্টির এক বিশেষ দায়িত্ব। পার্টি ইউনিট ও গ্রুপগুলোকে সংগঠিত করা এবং পার্টির মেম্বার ও নতুন নতুন মিলিট্যান্টদের শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য প্রত্যেক ডি ও সি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

বিপ্লবী অভিনন্দন-সেক্রেটারিয়েট
ই. বি. পি. ও সি.
পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

তাং ১১-০২-৫২

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে সাড়া দিন

সকল ভাষার সমমর্যাদা

ও

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা দাবিতে

২১শে ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশব্যাপী

ধর্মঘট, হরতাল, সভা ও

শোভাযাত্রা করুন

আওয়াজ তুলুন:

- ইংরেজি ভাষাকে আর রাষ্ট্রভাষা রাখা চলবে না।
- পাকিস্তানের সকল ভাষার সমমর্যাদা চাই।
- বাঙালি, পাঞ্জাবি, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি, উর্দু ভাষী প্রভৃতি সকল জাতিকেই নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার ও রাজকার্য পরিচালনার অধিকার দেওয়া চাই।
- বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই।

বাংলার জন্য আন্দোলন উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। ইংরেজির বদলে উর্দু বাংলা-সকল ভাষাকে রাষ্ট্রে সমমর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন।

ইংরেজ পাক-ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিকে পশ্চাৎপদ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য একটি ভাষা-ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিয়াছিল। লীগ সরকারও একই উদ্দেশ্যে এখন পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু রাখিয়াছেন এবং একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহিতেছেন।

একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইবে এবং ইহার ফলে পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নতিই ব্যাহত হইবে।

অতএব পাকিস্তানের বিভিন্নভাষাকে সমমর্য্যাদা ও রাষ্ট্রভাষা করার দাবির আন্দোলনে পাকিস্তানের বাঙালি, পাঞ্জাবি, পাঠান, সিন্ধি বেলুচি, উর্দু ভাষী-সকল জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে আগাইয়া আসুন।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

পূর্ববঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

অত্যাচারী নূরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে

সারা পূর্ববঙ্গ ব্যাপী তুমুল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন।

২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে ঢুকিয়া বারবার গুলি টিয়ারগ্যাস ও বেপরোয়া লাঠি চালাইয়া জুলুমবাজ নূরুল আমিন সরকার ভাষা আন্দোলনের ১৪ জন দেশপ্রেমিক কর্মীদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছে। শহীদদের খুনে আজ লাল হইয়া উঠিয়াছে আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলন। নিজ মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাহারা জাতির বুকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যে ঢাকা নগরী আমাদের প্রিয় শহীদদের খুনে লাল হইয়া উঠিয়াছে সেই ঢাকা নগরীর বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নূরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের জবাব দিবার জন্য আগাইয়া আসুন। লীগ সরকার জনগণের জীবনের কোন সমস্যাই সমাধান করে নাই বরং তাহাদের জীবনের সঙ্কটকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আজ আমাদের রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনকে নূরুল আমিন সরকার রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিতে চায়। এই জুলুমবাজ সরকারের অবসান ছাড়া জনগণের বাঁচার ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন পথ নাই। দল মত নির্বিশেষে সকল প্রতিষ্ঠান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণ একই সঙ্গে আওয়াজ তুলুন:

- নাজিম-নূরুল আমির সরকার গদি ছাড়।
- অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা চাই।
- হত্যাকারীর শাস্তি চাই; বেসরকারি তদন্ত কমিশন চাই, হত ও আহতদের জন্য পুরা ক্ষতিপূরণ চাই।
- অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি চাই।
- ১৪৪ ধারা ও সমস্ত দমনমূলক আইনের প্রত্যাহার চাই।

জুলুমবাজ লীগ সরকারের অবসানের দাবিতে হত্যাকারীর শাস্তির দাবিতে নিজ মাতৃভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে সারা প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট সভা শোভাযাত্রা করিয়া প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলুন। শহীদদের অসমাপ্ত আন্দোলনকে আগাইয়া নিয়া যাওয়ার জন্য শহীদদের নামে শপথ লউন।

পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি
পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি

২১-০২-১৯৫২

শিশু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে একতার দুর্ভেদ্য, প্রাচীর গড়ে তুলুন

পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করেছেন

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে ছাত্র জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর নুরুল আমীন সরকার রাইফেলধারী পুলিশ ও মিলিটারী লেলিয়ে ঢাকা শহরে এক নৃশংস রক্তাক্ত বিভীষিকা সৃষ্টি করেছেন। গুলি মেরে ২৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। মাতৃভাষার ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য অত্যাচারী লীগ সরকারের বুলেটে যারা জীবন দান করলেন সেই বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। শহীদদের পবিত্র স্মৃতি দেশবাসীর মনে চিরজাগরুক থাকবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদের যে বীজ তারা দেশের মাটিতে বপন করে গেলেন জীবনের বিনিময়ে তা প্রত্যেক পাকিস্তানবাসীকে আগামী দিনের আজাদী ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে।

নরহত্যা প্রতিবাদে তাষার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য রেলশ্রমিক থেকে শুরু করে শহরের গরীব বস্তিবাসী, কর্মচারী ও ছাত্র জনতার যে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠের বজ্র কঠোর ঘোষণা ঢাকার অলিতে গলিতে ধ্বনিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি তাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে। সর্ব শ্রেণীর জনতার এহেন সংগ্রামী ঐক্য পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বহু পরীক্ষিত ও শক্তিশালী হাতিয়ার এই ঐক্যের জোরেই জনতার দাবি হাছেল হবে আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন সেই ঐক্যকে সংহত ও শক্তিশালী করা। কিন্তু স্বৈরাচারী লীগ সরকার ও ভাড়াটিয়া প্রেস এই ঐক্যকে ব্যাহত করার জন্য নানা বিভ্রান্তির প্রচার চালাচ্ছে। সরকার দেখেছে লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাসের সামনে জীবন তুচ্ছ করে এগিয়েছে সংগ্রামী জনতার কাফেলা। জনতার ঘৃণাকে রক্তের বন্যায় ডুবাতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। তাই নতুন উদ্যমে আজ জনতার মনে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।

সরকারি প্রেসনোটে অহরহ প্রচার চালাচ্ছে ছাত্র জনসাধারণ অবাঞ্ছিত শক্তি দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পুলিশকে ঘেরাও করার ফলেই গুলি চলে, ইহা সত্যের অপলাপ, প্রকৃত ঘটনা দেশবাসী জানেন যে পুলিশ ও মিলিটারিই মেডিকেল কলেজে প্রবেশ

করে গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যা করেছে। ইউনিভার্সিটি কার্জন হলে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চালানো হয়। সরকার সমর্থিত মর্নিং নিউজ পত্রিকা অপ্রচার চালাচ্ছে কমিউনিস্টরাই এই হাঙ্গমার উস্কানিদাতা। জনতার ন্যায্য সংগ্রামে সাহায্য করার জন্যই কমিউস্ট পার্টির সৃষ্টি তাই গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পার্টি গর্ব অনুভব করে। গণ আন্দোলন থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্যই এবং নিজেদের গদি টিকিয়ে রাখার জন্যই সরকার পার্টিকে কার্যত গত ৩ বছর পর্যন্ত বেআইনি করে রেখেছে। কমিউনিস্ট পার্টি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিরোধী। পার্টি জনতার আন্দোলনকে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতেই পরিচালনা করে। কিন্তু লীগ সরকারই পার্টিও গণআন্দোলনের উপর হিংস্র দমননীতি চালিয়ে আসছে।

সরকার ও প্রতিক্রিয়ার এই ধরনের প্রচার বা গণ-আন্দোলনের উপর হিংস্র আক্রমণ এই নতুন নয়, ৪৭ সনের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পায়ে আত্মসমর্পণ করে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার গোষ্ঠী ও কোটিপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য পাকিস্তানের গদিতে বসেই লীগ নেতারা দেশের মধ্যে বুলেট ও লাঠির নীতি প্রচলিত করেছে। সাড়ে চার বছর লীগ সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে অনাহার ও চরম দুঃখ ও অশান্তি সৃষ্টি করেছে; এই জনস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদেই আজ পূর্ব বাংলার শহরে গ্রামে গড়ে উঠেছে জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটি যে সমস্ত দাবি দাওয়া প্রচার করছেন আমরা তার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমরা সমস্ত জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি।

সরকারি বিভেদনীতিকে পরাস্ত করার জন্য অবাঙালি ভাইদের মধ্যে অবিভ্রান্ত প্রচার চালান যে বর্তমান আন্দোলন উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে নয়-এই আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী পদলেহী লীগ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে। সর্বত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন। প্রদেশের সর্বত্র আন্দোলনের ঢেউ নিয়ে যান। ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন।

সমস্ত রাজনীতির দল ও সংগঠনের নিকট আমাদের নিবেদন গণসংগ্রামের পুরোভাগে স্থান নিন। দেশের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন, নুরুল আমিন

সরকারকে পদত্যাগ করাতে ও জনতার দাবি মানতে বাধ্য করুন।

ছাত্র জনসাধারণ ও সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে আমরাও ঘোষণা করি,

- অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার ও সকল ভাষার সমান মর্য্যাদা চাই।
- গুলি চালনার বেসরকারি তদন্ত কমিশন চাই।
- ১৪৪ ধারা ও মিলিটারির প্রত্যাহার চাই।
- শহীদদের ক্ষতিপূরণ দাও।
- বন্দিদের মুক্তি দাও, নিরাপত্তা আইন নাকচ কর।
- নূরুল আমিন সরকার পদত্যাগ কর।

ভাইসব! আপনাদের সুদৃঢ় প্রতিবাদ ও অজেয় সংকল্পের মুখে লীগ সরকার ইতি মধ্যেই পশ্চাদাপসরণ করেছে। পূর্ব বাংলা পরিষদে বাংলা ভাষার ন্যায্যতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু দেশবাসীর ন্যায্য দাবিগুলি মিটাতে সরকার এখনও গড়িমসি করছে। শহীদগণের জীবন উৎসর্গের প্রেরণায় নতুন সংকল্প নিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলুন, শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটকে সফল করুন। আপনাদের ন্যায্য দাবি মানতে সরকার বাধ্য হবে। শহীদের পবিত্র সংকল্প জয়যুক্ত হবে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

পূর্ববঙ্গ কমিটি

পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

সালাউদ্দিন-জব্বার-বরকত-রফীকুদ্দিন প্রমুখ বীরদের হত্যার জবাব দিন

নূরুল আমিন সরকারের পদত্যাগ দাবি করুন

ধন্য! ধন্য! ঢাকার ছাত্র সমাজ। ধন্য ঢাকার সহরবাসী নর-নারী জালেম নুরুল আমিন সরকার আপনাদের ভাষার অধিকারের লড়াইকে বন্দুকের গুলিতে স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। আপনারা জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া জালেম সরকারের বন্দুকের সামনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। গুলির জবাবে আপনারা হরতাল করিয়া ঢাকা নগরীর যানবাহন, অফিস আদালত, দোকান পাট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ সালাউদ্দিন-জব্বার-বরকত-রফীকুদ্দিন প্রমুখ বীরগণ নিজেদের তরুণ বুকের কলিজার তাজা খুনে লাল অক্ষরে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন বাংলা ভাষার অধিকার কায়েম কর। শহীদের রক্তে লেখা এই বাণীকে আজ সার্থক করুন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে আরও তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলুন।

রক্ত পিপাসু নূরুল আমিন সরকার ১৪৪ ধারা জারি, কাঁদুনে গ্যাস, লাঠি ও গুলি দ্বারা আপনাদের শান্তিপূর্ণ মিছিল করার অধিকারকে পদদলিত করিতে চাহিয়াছিল। আপনারা বীরের মতো তাহার জবাব দিয়াছেন। পুলিশের স্টেনগান রাইফেল উপেক্ষা করিয়া শহীদের রক্তে রঞ্জিত পতাকা হাতে নিয়া আপনারা হাজার হাজার জনতার মিছিল করিয়াছেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কর। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি চাই, নূরুল আমিন সরকার ধ্বংস হোক প্রভৃতি দাবিতে হাজার হাজার কণ্ঠে আওয়াজ তুলিয়া আপনারা ঢাকার নগরীর আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছেন। আপনাদের মিছিল চলিয়াছে অজেয় কাফেলার পর কাফেলার মত। আপনাদের প্রতিজ্ঞা ও ঐক্যের সামনে জালেম নূরুল আমিন সরকার ভীত, সন্ত্রস্ত। আপনাদের শক্তিতে ভীত এই সরকার আজ বাংলা ভাষার সুপারিশমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

কিন্তু এই সরকারকে বিশ্বাস নাই। ঢাকার ছাত্র ও যুবসমাজ অশান্তি চায় নাই। ভাষার অধিকারের জন্য গত ২১শে জানুয়ারি ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ছাত্র ও যুব সমাজ শান্তিপূর্ণভাবেই শোভাযাত্রা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু নুরুল আমিন সরকারই অশান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে, এই সরকারের পুলিশ অফিসাররাই ২১শে ফেব্রুয়ারী গোলমাল বাধাইবার জন্য শান্তিপূর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বারবার লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস চালাইয়াছে, এই সরকারের হুকুমেই পুলিশ গুলি করিয়া সালাহউদ্দিনের মাথার খুলি উড়াইয়া দিয়াছে, এই সরকারের পুলিশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের ভিতরও গুলিবর্ষণ–করিয়াছে। এই সরকারের পুলিশ বাহিনী ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় একবার নয়, দুবার নয়, বারবার হাইকোর্টের সামনে, মিটফোর্ড স্কুলের সামনে, ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে, কাপ্তান বাজারের মোড়ে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রীদের উপর লাঠি চালাইয়া কিশোর বালকদের কচিমাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। সঙ্গীনে বিদ্ধ করিয়া, গুলি করিয়া আবার নিরপরাধ নাগরিকদের হত্যা করিয়াছে। এই জালেম সরকারই মুষ্টিমেয় বিদেশী ও দেশী শোষকদের মুনাফার জন্য পূর্ব বঙ্গের ঘরে ঘরে অনাহার ও দুঃখের অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। গণ সমর্থন হারাইয়া নূরুল আমিন সরকার নিজের গদি টিকাইয়া রাখার জন্য আজ ঢাকাবাসী সন্তান-সন্ততিদের তাজা খুনে ঢাকার রাস্তাঘাট লাল করিয়া দিতেছে। নূরুল আমিন সরকার আজ এত ঘৃণিত হইয়াছে যে তাহারা পুলিশের গুলিতে নিহতের সংখ্যা চাপিয়া যাইতেছে এবং মৃতব্যক্তিদের দাফন কাফন করার সুযোগ না দিয়া তাহাদের লাশ গায়েব করিয়াছে। পৈশাচিক নৃশংসতায় নূরুল আমিন সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও হার মানাইয়াছে। মুষ্টিমেয় শোষকদের এই লীগ সরকারের এখনই অবসান প্রয়োজন।

শ্রমিক, কৃষক ভাইসব! ছাত্রছাত্রীগণ! সকল দলের বন্ধুগণ! সমস্ত নাগরিক উর্দুভাষী ভাইসব আজ লীগ সরকারের পৈশাচিকতার সামনে দ্বিধা নয়, সংশয় নয়, অনৈক্য নয়। আজ শহীদগণের জীবনদান আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করুক। শহীদদের রক্তের বন্ধনে সকল দল, সকল মতের নর-নারীর ভিতর গড়িয়া উঠুক অটুট ঐক্য আজ লাখ লাখ কণ্ঠে গর্জিয়া উঠুন।

- ○ গুলিবর্ষণের বেসরকারি তদন্ত চাই।
- ○ সালাহউদ্দিন-জব্বার ও অন্যান্য বীরদের হত্যাকারীদের বিচার চাই নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ চাই।
- ○ ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার কর।
- ○ নিরাপত্তা আইন নাকচ কর।
- ○ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই।
- ○ রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।
- ○ নূরুল আমিন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করুক।

ভাইসব! যতদিন বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠিত না হয়, যতদিন ১৪৪ ধারা উঠাইয়া নেওয়া না হয়, যতদিন বন্দিদের মুক্তি দেওয়া না হয়, ততদিন এই শান্তিপূর্ণ হরতাল চালাইয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সমস্ত দাবি হাসিল করার জন্য এই লড়াইকে আজ শ্রমিকের বস্তিতে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ভিতর উর্দু ভাইদের ভিতর, সারা পূর্ব বঙ্গের সকল নর-নারীর ভিতর ছড়াইয়া দিন। কারখানায় ধর্মঘট ও শত শত সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া উপরোক্ত দাবিগুলো অমোঘ করিয়া তুলুন। প্রতি সভা হইতে ঘোষণা করুন নূরুল আমিন সরকার গদি ছাড়।

আজ প্রয়োজন সংগঠিত আন্দোলন। তাই পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায়, মহল্লায় গ্রামে গ্রামে স্কুল-কলেজে গড়িয়া তুলুন সকল দলের সকল মতের মিলিত সংগ্রাম পরিষদ। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে শহীদদের প্রেরণায় গড়িয়া তুলুন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। তাহারা সারা পূর্ব বঙ্গে সংগ্রামের বাণী ছড়াইয়া দিক। আজ যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে সেই সংগ্রাম ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া উঠুক। ইহাই সালাহউদ্দিন-বরকত-জব্বার-রফীকুদ্দীন প্রমুখ বীরদের হত্যার যোগ্য জবাব।

২৩ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ কমিটি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেছেন

শহীদের তাজা খুনে বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বঙ্গবাসীর সংগ্রাম ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু জাতির এই ঐতিহাসিক আন্দোলনকে বিকৃতরূপ দেওয়ার জন্য সাংবাদিক সততা বিসর্জন দিয়ে নির্লজ্জের মতো "মর্নিং নিউজ" পত্রিকা মিথ্যাতথ্য পরিবেশন করছে।

২১শে তারিখের বিবরণে "মর্নিং নিউজ" লিখেছে–শুধুমাত্র হিন্দুদের দোকানগুলি বন্ধের ভিতর দিয়েই ঐদিন হরতাল পালিত হয়। এরূপ মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন ও সাম্প্রদায়িকতার উস্কানির জন্যই "মর্নিং নিউজ" প্রেস জনতা কর্তৃক ভস্মীভূত হয়। প্রথম থেকে পত্রিকাটি আন্দোলনকে বিকৃত করা ও জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য সুপরিকল্পিত অপপ্রচার চালায়, সরকারি প্রেস নোটের প্রতিধ্বনি করে তারা বুঝাতে চায় যে এই আন্দোলনের নেতা হিন্দু ও কিছু কম্যুনিস্ট; জনসাধারণ আন্দোলনে বিশেষ কোন অংশগ্রহণ করেনি। ইহা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর আন্দোলন নয়।

২৩শে ফেব্রুয়ারি "মর্নিং নিউজ" এই একই উদ্দেশ্যে অপর একটি মিথ্যা খবর প্রকাশ করে যে ভারত থেকে ১০০ জন কম্যুনিস্ট পূর্ববঙ্গে এসেছে এবং ২১শে তারিখ রাত্রে নেতৃস্থানীয় কম্যুনিস্টরা সভা করে আন্দোলন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মিথ্যা খবর দিয়ে তারা বলতে চেয়েছে যে ভারত থেকে এসে কম্যুনিস্টরা এই আন্দোলন পরিচালনা করছে। আরো প্রচার করা হয়েছে যে, হিন্দুরা পাকিস্তানে যানবাহন অচল করে দেবার জন্যে রেলগাড়ি চলাচল বন্ধ করেছে।

দেশবাসী জানেন যে, এই আন্দোলন সারা পূর্ব বঙ্গবাসীর আন্দোলন; বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দ্বারা এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। আজ যাহারা শহীদ হয়েছেন তারা এই দেশেরই সন্তান। যারা বুলেটের সামনে বুক পেতে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তারাই দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে পরিগণিত হচ্ছেন। সরকারের ভাড়াটিয়া "মর্নিং নিউজ" এদেরকেই বলেছে–"গুণ্ডা"। আজ আন্দোলনে যারা

নেতৃত্ব করছেন বিভিন্ন দল ও মতের প্রতিনিধি। কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীরাও অন্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনতার পাশে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে। কম্যুনিস্ট পার্টি চিরদিনই সংগ্রামী জনতার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে, জেলে গিয়েছে শহীদ হয়েছে। সরকার এটা জানে বলেই কম্যুনিস্ট পার্টির শত শত কর্মী ও নেতাকে বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটক রেখেছে।

জনসাধারণের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য লীগ নেতারাও মর্নিং নিউজের মতো তাদের ভাড়াটিয়া পত্রিকাগুলি অহরহ প্রচার করে থাকে যে কম্যুনিস্ট পার্টি "দেশের শত্রু"–"সন্ত্রাসবাদী" ইত্যাদি। কিন্তু গত ৪ বছরে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও কোটিপতি ব্যবসায়ীর স্বার্থে এবং ইংরেজদের নেতৃত্বে পরিচালিত লীগ সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপ গত কয়েক দিনের নরহত্যা ও রক্তপাত প্রকাশ করেছে কারা দেশের শত্রু। সাম্রাজ্যবাদের বদলে লীগ সরকারই দেশদ্রোহিতার নীতি অনুসরণ করছে। অপরদিকে কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি হলো সকল দল মত–শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, জাতীয় ধনিক শ্রেণীর সম্মিলিত "মোর্চা" গঠন করে গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা ও পাকিস্তানকে স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা।

পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির
পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি

২৪ শে ফেব্রুয়ারি

সার্কুলার নং ১১ ২৫/০২/১৯৫২

প্রিয় কমরেড,
গত ২১শে ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকা নগরীতে ভাষার অধিকারের জন্য গণ সংগ্রামের যে জোয়ার চলিয়াছে তাহা পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সরকার ভয়ে মরিয়া হইয়া একদিকে পুলিশ মিলিটারীর জোরে এবং আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। অপরদিকে ঐক্যবদ্ধ বিরাট গণসংগ্রামের সামনে রাজনৈতিকভাবে পিছু হটিয়াও সরকার নিজের গদি টিকাইয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। ইহা এই গণসংগ্রামেরই বিরাট জয়। যদিও গণপরিষদ দ্বারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই সংগ্রাম শেষ হইবে না।

তদুপরি...এখনও এই সংগ্রামের আরও কয়েকটি দাবি আদায় করা বাকি রহিয়াছে। "রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ" সেই দাবিগুলো উত্থাপন করিয়াছেন। এই সব দাবি আমরাও পূর্ণ সমর্থন করি। সেই দাবিগুলো হইল (১) এই আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের ও আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে সমস্ত ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার, আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি, (২) ১৪৪ ধারা ও কারফিউ প্রত্যাহার (৩) গুলিবর্ষণের তদন্তের জন্য বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠন ও হত্যাকারীদের শাস্তি, (৪) আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য কোন সরকারি কর্মচারীকে শাস্তি প্রদান না করা এবং পুলিশের গুলিতে নিহত ও আহতদের জন্য যোগ্য ক্ষতিপূরণ।

এই দাবিগুলো হাসিলের জন্য এই গণসংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া নিয়া যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন। সংগ্রামকে আগাইয়া নিয়া যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যে কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগ্রামকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য সেই কর্মপদ্ধতিও আমরা উপযুক্ত বলিয়া মনে করি এবং সেই কর্মপদ্ধতিতেই সারা পূর্ববঙ্গে সংগ্রামকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য আমরা সকল কমরেডকে আহ্বান করিতেছি।

দ্বিতীয়ত এখন প্রয়োজন আরও সংগঠিত নেতৃত্ব ও আরও সংগঠিত সংগ্রাম। সেজন্য পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জোরদার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন এবং যে সব কর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাদিগকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে সংঘবদ্ধ করুন। সমস্ত কমরেডই বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে কাজ করুন এবং সংগ্রাম পরিষদগুলিকে জনগণের ঐক্যের ও সংগ্রামের হাতিয়াররূপে গঠন করিয়া তুলুন।

তৃতীয়ত সরকার আন্দোলনে বিভেদ আনার জন্য যে অপপ্রচার করিতেছে যেমন, "এই আন্দোলন পাকিস্তানের বাইরের লোকদের প্রেরণায় চলিতেছে, প্রভৃতি ঘৃণ্য প্রচারের জবাব দিন। পোস্টার, ইস্তাহার, বৈঠক, সভা প্রভৃতির ভিতর দিয়া জনগণকে বলুন যে সরকারের এই অপপ্রচার পূর্ববঙ্গের সংগ্রামী জনতা ও সংগ্রামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা। জনগণ নিজের ভাষার ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার জন্য নিজেদের প্রেরণায়ই সংগ্রাম করিতেছেন এবং লীগ সরকারই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ও তাদের দেশের মুষ্টিমেয় শোষকের স্বার্থে পূর্ববঙ্গের জনগণের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালাইতেছে। এই ব্যর্থ প্রচার দ্বারা সরকারের আগুনে মুখোশ খুলিয়া দিন ও লীগ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণাকে আরও তীব্র করিয়া তুলুন। উপরোক্তভাবে সারা পূর্ববঙ্গে এই সংগ্রামকে আগাইয়া নিলে আজ উপরোক্ত পাঁচটি দাবি নিশ্চয়ই হাসিল হইবে।

এই সংগ্রাম চালাইয়া নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে-(১) নূরুল আমিন মন্ত্রীসভা গদি ছাড়, (২) অবিলম্বে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে ও যুক্ত নির্বাচন প্রথায় অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। সর্বত্র সভা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান করুন ও এই দাবিগুলোকে পূর্ব বাংলার জনগণের দাবিতে পরিণত করুন। বর্তমান সংগ্রাম হইতেই নূরুল আমিন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ, বন্দিমুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবি সজোরে উঠিয়াছে। আইন সভার লীগ দলেরও বিরাট ভাঙ্গন আসিয়াছে। সেই পটভূমিকায় উপরের দুইটি স্লোগানের ভিত্তিতে দেশে বিরাট গণআন্দোলন সৃষ্টি করিয়া নূরুল আমিন সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারিলে দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আন্দোলনে বিরাট অগ্রগতি হইবে।

পরিশেষে আজ যে সমস্ত কর্মী এই আন্দোলনে অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের ভিতর পার্টি সাহিত্য প্রচার করুন, তাহাদিগকে পার্টির প্রতি টানিয়া আনুন এবং তাহাদিগকে পার্টি গ্রুপে গ্রুপে সংগঠিত করিতে চেষ্টা করুন। এই বিরাট গণসংগ্রামের ভিতর দিয়া জনগণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কায়েম করার পথে আরও অগ্রসর হইবে, পার্টির শক্তি বাড়িবে এবং প্রতিক্রিয়া শক্তি দুর্বলতর হইয়া পড়িবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া সকল কমরেড ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

বৈপ্লবিক অভিনন্দন
পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি, পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য

পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিতেছে ঃ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ও নূরুল আমিন সাহেবের বেতার বক্তৃতায় কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে সমস্ত মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ উক্তি করা হইয়াছে, আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।

বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনকে ধ্বংস করা ও পূর্ববঙ্গবাসীর এই মূল গণতান্ত্রিক ও জাতীয় দাবিকে পদদলিত করার জন্যই নূরুল আমিন সরকার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও চরম দমননীতির আশ্রয় লইয়াছেন।

লীগ সরকারের এই জঘন্য জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের সাফাই গাহিবার জন্য ও অপকীর্তি ঢাকিবার জন্য লীগ ও নূরুল আমিন সাহেব প্রদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া পূর্ব বঙ্গের বাঙালি অবাঙালি জনগণের অভূতপূর্ব গৌরবময় দেশপ্রেমিক আন্দোলনকে বিকৃতভাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও নূরুল আমিন সাহেব কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ যুবলীগ, ছাত্রলীগ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলা ভাষা আন্দোলনের সমর্থনকারী দেশপ্রেমিকদের বিদেশী দালাল, রাষ্ট্র বিরোধী, পাকিস্তানের শত্রু প্রভৃতি বলিয়া স্বার্থ স্বর্বস্ব লীগ নেতাদীগকে একমাত্র দেশপ্রেমিক বলিয়া জাহির করার অপচেষ্টা করিতেছেন। ভাষার দাবি সমর্থন ও নূরুল আমিন সরকারের গুলি চালনার প্রতিবাদ করায় লীগ পরিষদ দলের আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, মাদার-বকস, প্রাক্তন লীগ সম্পাদক আবুল হাসেম ও অন্যান্য লীগ ভক্ত নাকি রাতারাতি রাষ্ট্র বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন? রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তাহাদিগকে জেলে আটক করা হইয়াছে। নূরুল আমিন সরকারের হত্যাকাণ্ডের স্বপক্ষে যাহারা বলিলেন না তাহারাই রাষ্ট্র বিরোধী এবং তাহাদের স্থান হইবে নূরুল আমিনের জেলে। মুষ্টিমেয় লীগ নেতারা ছাড়া দেশের আর সকলেই নাকি আজ রাষ্ট্র বিরোধী।

ভাষা আন্দোলনকে বিকৃত রূপ দিয়া ধ্বংস করার জন্য লীগ ও নূরুল আমিন সাহেব আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা প্রচার চালাইয়াছেন এবং তিনটি মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছেন। (১) বাহির হইতে অনুপ্রবেশ (২) সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, (৩) পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধ্বংস।

ছাত্র, শ্রমিক ও শিশু হত্যাকারী নূরুল আমিন সরকারের লীগ নেতাদের এই সব জঘন্য উদ্ভট মিথ্যা অভিযোগের উত্তর দিতেও কমিউনিস্ট পার্টি ঘৃণা বোধ করে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহীদদের যাহারা শহীদ বলিয়া গণ্য করে নাই, শহীদদের লাশগুলোকে পর্যন্ত যাহারা মা বাবা-আত্মীয়-স্বজনকে শেষ দেখা দেখিতে দেন নাই এবং দাফন কাফন ও জানাজা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন তাহাদের আজ দেশবাসী ভালভাবেই চিনিয়াছেন। তবুও দেশবাসীর নিকট আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ঠভাবে জানাইবার জন্য আমরা এই বিবৃতি প্রকাশ করিতেছি।

কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টিকে কোন দেশেই বাহির হইতে আমদানি করিতে হয় না। শোষণ ও অত্যাচারের অবসান করার জন্য প্রত্যেক দেশে সাম্যবাদী ভাবধারা ও কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। মুসলিম লীগের বর্তমান নেতারা যখন নবাবী, নাইটগিরি ও খান বাহাদুরী করিয়া দেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোলামির জিঞ্জির দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখনই এই পূর্ববঙ্গের পাক-জমিতে শ্রমিক কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একদল বিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জেহাদের মধ্য দিয়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ববঙ্গের জনগণের আজাদী, রুজি, রুটি, জমি, শিক্ষা প্রতিটি দাবির লড়াইয়ে জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করিয়া চলিয়াছে। এই জন্য জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের মুখোশ কমিউনিস্ট পার্টি জনসাধারণের সামনে খুলিয়া ধরে বলিয়াই সরকার দমন নীতির সাহায্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে কার্যত বেআইনি করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্যান্য দল ও প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিয়া ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী ছাত্র ও জনতার পাশে দাঁড়াইয়া লড়াই করিয়াছে এবং তার জন্য গর্বও বোধ করে।

পূর্ববঙ্গের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত দেশপ্রেমিক সন্তানদের লইয়াই পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত। প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিজ নিজ দেশের জনতার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে নিজ নিজ দেশের ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং বাহির হইতে অনুপ্রবেশের অভিযোগ জনগণকে ভুয়া অপপ্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত করিবার অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরদিকে লীগ সরকারই আমাদের দেশকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতর রাখিয়াছেন, আমাদের দেশে বিদেশী শক্তি ব্রিটিশ পুঁজির শোষণকে অব্যাহত রাখিতেছেন, বিশ্ব ব্যাংকের লোন, ট্রু ম্যানের চতুর্থ দফার টাকা, কলম্বো পরিকল্পনার টাকা প্রভৃতি আনিয়া দেশে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ব্যবস্থা পাকা করিতেছেন। সামরিক বিভাগের কর্তৃত্বে ব্রিটিশ অফিসারদের বহাল রাখিয়া, বিলাত ও আমেরিকা হইতে অসংখ্য তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতা আমদানি করিয়া এই লীগ সরকারই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে তাহাদের টালটলায়মান শাসন ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

(২) কমিউনিস্ট পার্টি চিরদিন সন্ত্রাসবাদী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তাহাই প্রমাণ করিবে। কমিউনিস্টরা গণ-আন্দোলনে বিশ্বাসী, আর সন্ত্রাসবাদী পথ গণ-আন্দোলনের বিরোধী পথ। সন্ত্রাসবাদী পথে কোন দেশের জনগণের মুক্তি আসিতে পারে না। গণ-আন্দোলনের পথই কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র পথ। আমরা সরকারকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে, তাহারা কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার ও প্রচার পুস্তিকা হইতে একটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করুন যে কমিউনিস্ট পার্টি সন্ত্রাসবাদ বিশ্বাসী।

পক্ষান্তরে লীগ মন্ত্রিসভার গত চার বৎসরের ইতিহাস একটানা হিংস্র দমননীতি ও সন্ত্রাসের ইতিহাস। প্রচণ্ড দমন নীতি চালাইয়া জনগণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া ভাষা আন্দোলনকে দমন করার অপচেষ্টা করিতেছেন। সরকারের দমননীতি ও 'মর্নিং নিউজ' এর জঘন্য প্রচারই জনতার মনে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য দায়ী। ছাত্র ও জনতার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া আন্দোলনকে ভুলপথে পরিচালনার জন্যই সরকার ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছেন। ছাত্র সমাজের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া ছাত্র সমাজকে সন্ত্রাসবাদের পথে ঠেলিয়া দেওয়াই হইল নূরুল আমিন সাহেবের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙ্গার

উদ্দেশ্য। কারণ সরকার জানেন যে, আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের পথে গেলে আন্দোলনকে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দমন নীতির সাহায্যে ধ্বংস করা তাহাদের পক্ষে সহজ হইবে।

(৩) আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিদ্বেষ প্রসূত। কমিউনিস্ট পার্টি তাহার কর্মনীতিকে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে পাকিস্তানকে শিল্পে ও কৃষিতে উন্নত দেশ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়িয়া তোলার জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করিবে। পাকিস্তানের নবাব, জমিদার, মুষ্টিমেয় কোটিপতি ব্যবসায়ী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিভূ ও স্বার্থ রক্ষক লীগ সরকারের বদলে পাকিস্তানের মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক বিভিন্ন দলের মিলিত গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা ও স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই হইল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য।

পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি নবাব, জমিদার, মুষ্টিমেয় কোটিপতি ব্যবসায়ী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সকল দল, মত, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করিয়া প্রকাশ্য ও বৈধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহায্যে তাহাদের মকসদে পৌঁছিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু দেশের জনগণের দুশমন এই লীগ সরকারই কমিউনিস্ট পার্টির উপর নৃশংস দমন নীতি ও মিথ্যা প্রচার চালাইয়া, গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণ করিয়া কার্যত পার্টিকে অবৈধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পূর্ববঙ্গের আপামর জনসাধারণের সমর্থন লীগ হারাইয়াছেন। জনগণ সর্বত্র নূরুল আমিন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করিয়াছেন। লীগ পরিষদ দলেও ভাঙ্গন ধরিয়াছে। লীগ পরিষদ দল হইতে পদত্যাগকারী সদস্যদিগকে ও বিভিন্ন বিরোধীদলের নেতাদের জেলে আবদ্ধ করিয়াও লীগ মন্ত্রিসভা পরিষদের সম্মুখীন হইতে সাহস পাইতেছেন না। তাই গভর্নর অনির্দিষ্ট কালের জন্য পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়া জনগণের আস্থাহীন এই নূরুল আমিন মন্ত্রিসভাকেই গদিতে টিকাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এই রকম অবস্থায় নূরুল আমিন মন্ত্রীসভার আর এক দিনের জন্যও গদি আঁকড়াইয়া থাকা সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বহির্ভূত কাজ। আমরাও জনগণের দাবি অনুযায়ী অবিলম্বে নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করিতেছি। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দ্বারা যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ও প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়া, অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন আহ্বান করিয়া নূরুল আমিন মন্ত্রিসভাকে ও মুসলিম লীগকে আমরা পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের সম্মুখীন হওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করিতেছি। আজ দেশবাসী ভোটের মধ্য দিয়াই তাহাদের রায় প্রকাশ করিবেন।

নূরুল আমিন সরকার ও মুসলিম লীগ তাহাদের জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ ও অপকীর্তি ঢাকার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার শুরু করিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ দীর্ঘ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতায় লীগ সরকারের যে চরিত্র দেখিয়াছে, তাহা শত মিথ্যা প্রচারেও ঢাকা পড়বে না। সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার শ্রেণী, মুষ্টিমেয় কোটিপতি ব্যবসায়ীর অনুচর ও স্বার্থ রক্ষক নূরুল আমিন সরকারের পতন অনিবার্য।

নিজেদের খুন দিয়া পূর্ববঙ্গের ছাত্র ও জনসাধারণ যে ভাষা আন্দোলনকে গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছেন, যে ভাষার দাবিতে সারা পূর্ববঙ্গে অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্র বিরোধীদের কাজ ইত্যাদি মিথ্যা প্রচার চালাইয়া ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনকে ও জনগণের দাবিকে বানচাল করা যাইবে না। এই ভাষা আন্দোলনের জয় সুনিশ্চিত।

১০ই মার্চ্চ, ১৯৫২

পি, ও, সি
সার্কুলার নং ১৩
১৩-০৪-১৯৫২

ভাষা আন্দোলন

প্রিয় কমরেডস,

পাক গণপরিষদের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব নেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ এই প্রস্তাব দ্বারা লীগ সরকার ভাষার প্রশ্নকে ধামাচাপা দিবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কৌশলে বিদেশী ভাষা ইংরেজিকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আরও দীর্ঘকাল চাপাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিতেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ইংরেজি ভাষাকে চাপাইয়া রাখিয়া আমাদের দেশের সকল জাতীয় বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল এবং পরাধীনতার নাগপাশ দীর্ঘকাল টিকাইয়া রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিল, লীগ সরকার সাম্রাজ্যবাদের সেই নীতি ও সেই হাতিয়ারই ব্যবহার করিয়া পাকিস্তানের সকল জাতির জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতির পথ রুদ্ধ করার জন্যই সচেষ্ট হইয়াছে।

'ভাষা সমস্যা জটিল সমস্যা' এখনই সিদ্ধান্ত লওয়ার জরুরি প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নাই', 'জোর করিয়া চাপানো চলে না', 'যুক্তি দিয়া সকলকেই বুঝাইতে হইবে, অতএব সময়ের প্রয়োজন', 'তাড়াতাড়ি করিয়া ইংরেজি ভাষা বদলানো সম্ভব নয়' এই ধরনের নানা যুক্তির আড়ালে প্রতিক্রিয়াশীল লীগ ও লীগ সরকার ভাষার দাবিকে ধামাচাপা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং নিজেদের আসল মতলব ঢাকিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ও নাজিমুদ্দিন সাহেবের বক্তৃতা হইতে লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি পরিষ্কারভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। লীগ তাহার পূর্ব নীতিই অনুসরণ করিয়া চলার জন্য বদ্ধপরিকর। বাংলা ভাষার দাবি তাহারা কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। ইংরেজী বা উর্দু এই দুইটি ভাষার একটিকে পাকিস্তানের বাঙালি, পাঞ্জাবি, পাঠান, সিন্ধি বেলুচি প্রভৃতি সকল ভাষাভাষী জাতির উপর চাপাইয়া রাখাই লীগ সরকারের মতলব। কারণ পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্র কার্য পরিচালনার সুযোগ না দিয়া সকল জাতিকে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখা ও এই পশ্চাৎপদতার সুযোগে সামন্তবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখাই হইল ভাষার প্রশ্নে লীগ সরকারের নীতি। ভাষার প্রশ্নে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত নীতিই প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকারের নীতি।

পূর্ববঙ্গবাসী সকলেই গণপরিষদের সিদ্ধান্তের দিকে চাহিয়াছিল। সমগ্র পূর্ব বঙ্গবাসীর জাতীয় দাবি ও গণতান্ত্রিক দাবি উপেক্ষা করিয়া লীগ সরকার গণপরিষদে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিক্ষোভকে ব্যাপকভাবে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য 'সর্বদলীয় কমিটির' নেতৃত্বে সভা ও কনভেনশন আহ্বান করিয়া গণপরিষদের সিদ্ধান্তের ও লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপ খুলিয়া ধরা ও আন্দোলন গড়িয়া তোলা অত্যন্ত জরুরি।

ভাষার দাবিতে পূর্ববঙ্গে যে অভূতপূর্ব গণআন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যে আন্দোলন বিরাট জাতীয় আন্দোলনের রূপ নিয়াছে, তাহাকে অগ্রসর করিয়া নিয়া যাওয়া পার্টির এক প্রধানতম কর্তব্য।

ভাষা আন্দোলনের মূল শক্তি ও দুর্বলতা

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সমগ্র পূর্ববঙ্গে গণজাগরণ সৃষ্টি হইয়াছে এবং পূর্ববঙ্গবাসীর ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনাই এই আন্দোলনের ভিতর রূপ নিয়াছে; বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রে সমমর্যাদা দেওয়ার ভিত্তিতেই এই আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে; তাই পাকিস্তানের আজাদ পাকিস্তান পার্টি প্রগতিশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও প্রগতিশীল ব্যক্তিরা বাংলাভাষার দাবির প্রতি পরিপূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন।

কিন্তু পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে পূববঙ্গের উর্দুভাষী জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের বড় অংশের মধ্যে ভুল ধারণা রহিয়া গিয়াছে। কারণ পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আমরা এখনও পরিষ্কার ধারণা জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিতে পারি নাই। যার ফলে মুষ্টিমেয় সচেতন অংশ ছাড়া অনেকের মনে প্রধানতঃ এই ধারণা জন্মিয়াছে যে উর্দু ও বাংলা এই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য দাবি করা হইতেছে এবং সেই ভাষা সকলের শিক্ষা করিতে হইবে। প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকার এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া রাখার জন্য অনবরত প্রচার চালাইতেছে। সেজন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ স্বভাবতই ভাবিতেছে যে বাংলাভাষা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে। অতএব, ভাষা সমস্যা ও তার সমাধান পরিষ্কারভাবে পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবেই ভাষা

আন্দোলনের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের আগ্রহ বাড়িবে এবং তাহারাও নিজ নিজ জাতীয় অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাষার সংগ্রামে আগাইয়া আসিবে।

'ইংরেজি ভাষাকে আর রাষ্ট্রভাষা রাখা চলবে না,' 'রাষ্ট্রে সকল ভাষার সমমর্যাদা চাই,' নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও রাষ্ট্র কার্যের অধিকার চাই', 'ইংরেজি, উর্দু, বাংলা কোন ভাষাই অন্য ভাষাভাষী জাতির উপর চাপানো চলবেনা',-এই দাবিগুলোর ভিত্তিতে পাকিস্তানের বাঙালি, পাঞ্জাবি, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি, উর্দু ভাষাভাষী সকল জাতিরই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া উঠা সম্ভব এবং এই আন্দোলনের ভিতর দিয়াই পাকিস্তানের সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন ও জাগ্রত হইয়া উঠিবে। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতিরই জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

অতএব, ভাষা আন্দোলন সারা পাকিস্তানে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন হিসেবে গড়িয়া উঠার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার জন্য পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনকে আরও সঠিক ও সংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা নিতে হইবে।

ভাষা সমস্যার সমাধান

১. পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে রাষ্ট্রে সমান মর্যাদা দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে চলিবে।

২. বাঙালি, পাঞ্জাবি, পাঠান, সিন্ধি, বেলুচি, উর্দু ভাষাভাষী প্রভৃতি সকল জাতিকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার ও রাষ্ট্রে কার্য পরিচালনার অধিকার দিতে হইবে। কোন ভাষাই অপর ভাষাভাষী জাতির উপর চাপানো চলিবে না।

উপরোক্ত গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতেই পাকিস্তানে ভাষা সমস্যার বিচার করিতে হইবে এবং এই নীতির ভিত্তিতেই সারা পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। (এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে মার্কসপন্থী ও প্রচার পুস্তিকা মারফত করা হইবে।)

বর্তমান স্তরে আন্দোলন ও সংগঠনগত কাজ

আন্দোলন

(ক) গণপরিষদের সিদ্ধান্তের পরিষ্কার অর্থ হইল-ইংরেজি ভাষাকে আরও দীর্ঘদিন পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু রাখা। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষীর জাতিরই জাতীয় অধিকারকে পদদলিত করা যাইতেছে এবং প্রত্যেক জাতিরই জাতীয় বিকাশ ও উন্নতির পথ আরো দীর্ঘকাল রুদ্ধ করিয়া রাখারই ব্যবস্থা হইয়াছে। অতএব, ইংরেজি ভাষা আরও দীর্ঘকাল চাপাইয়া রাখার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত নীতি চালু রাখার বিরুদ্ধে বিদেশী ভাষা চাপাইয়া রাখার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষীর জাতির জাতীয় অধিকার বোধ ও জাতীয় চেতনাকে রূপ দিয়া ভাষা আন্দোলনকে সমগ্র পাকিস্তানবাসীর আন্দোলনে অগ্রসর করিয়া নিতে হইবে। "ইংরেজি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আর চাপাইয়া রাখা যাবে না। পাকিস্তানের সকল ভাষাকে রাষ্ট্রে সমমর্য্যাদা দেওয়া চাই'–এই দাবির ভিত্তিতে সমগ্র পাকিস্তানে আন্দোলন গড়িয়া তোলার উপর বর্তমানে বিশেষ জোর দিতে হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানবাসীর যে স্বাভাবিক ঘৃণা আছে, সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত নীতি চালু রাখার বিরুদ্ধে সেই তীব্র ঘৃণাই জাগ্রত করিয়া ভাষা আন্দোলনকে পাকিস্তানের সকল জাতির জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসেবে গড়িয়া তোলার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা নিতে হইবে।

'ইংরেজি ভাষা চালু করা চলবে না', 'সকল ভাষার সমমর্যাদা চাই, 'বাংলাকে রাষ্ট্রে সমমর্যাদা দেওয়া সম্পর্কে অবিলম্বে ঘোষণা চাই'–নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ ও রাষ্ট্র কার্যের অধিকার চাই'–প্রভৃতি শ্লোগানের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গে আন্দোলনকে আরও অগ্রসর করিয়া নিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের' তরফ হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে 'প্রচার মিশন' পাঠাইবার উপর জোর দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে 'ভাষা আন্দোলনে ধৃত সকল বন্দিদের মুক্তি চাই', 'গুলি চালানোর নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্যে তদন্ত চাই' শহীদ পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ চাই–প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতেও পূর্ববঙ্গ আন্দোলন গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।

(খ) ভাষা আন্দোলন যাহাতে আরও ব্যাপক, বৈপ্লবিক ও সংগঠিত রূপ নিতে পারে তার জন্য শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী যাহাতে সংগঠিতভাবে ভাষা আন্দোলনে তাহাদের যোগ্য অংশ ও ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে তার জন্য পার্টির তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন।

(গ) মজুর, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী–সকল শ্রেণীর জীবনে সঙ্কট যে কত গভীর আকারে দেখা দিয়েছে এবং সরকারের প্রতি জনসাধারণের বিক্ষোভ যে আজ কতটুকু বাড়িয়াছে তাহা ভাষা আন্দোলনে জনতার অংশগ্রহণের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবল দমননীতি, গুলি, বেয়নেট উপেক্ষা করিয়া হাজার হাজার জনতা ভাষা সংগ্রামে আগাইয়া গিয়াছে। .... মন্ত্র দ্বারা ভাষা আন্দোলনের ব্যাপকতাকে রুদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নয় ইহাই ভাষা আন্দোলন প্রমাণ করিয়াছে। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত–সকল মেহনতি জনতা ভাষা আন্দোলন হইতে নিজস্ব দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করার প্রেরণা ও উৎসাহ পাইয়াছে।

অতএব বর্তমান মজুর কৃষক, মধ্যবিত্ত ছাত্র, কেরানী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের নিজ নিজ দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়িয়া উঠার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাকে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা নিতে হইবে। সারা পূর্ববঙ্গে রেল আন্দোলন গড়িয়া উঠার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে সেই আন্দোলনকে অগ্রসর করিয়া নিয়া যাওয়ার জন্য পার্টির সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। মজুর ও কৃষক শ্রেণীর আন্দোলন ও শ্রেণী সংগঠন গড়িয়া তোলার উপর আমাদের বিশেষ জোর দিতে হইবে। ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া পূর্ববঙ্গের ছাত্র সাধারণের চেতনার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে এবং যে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা ছাত্র সমাজকে নতুনভাবে আলোড়িত করিয়াছে তাহাকে সংগঠিত রূপ দেওয়া আজ অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন। ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র ঐক্য গড়িয়া তোলার আগ্রহ দারুণভাবে বাড়িয়াছে,–অতএব এই সম্ভাবনাকে রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টা নিতে হইবে।

(ঘ) সর্বোপরি ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া জনগণের চেতনার মধ্যে যে বিরাট

পরিবর্তন আসিয়াছে এবং লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ বিক্ষোভ ও ঘৃণা জাগিয়াছে, তাহাকে আরও বাড়ানো সুস্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য লীগের শ্রেণী চরিত্র জনসাধারণের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলিয়া ধরা অত্যন্ত জরুরি।

'লীগ সরকারের অবসান চাই', 'অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা চাই', নির্বাচনে সকল দলও প্রতিষ্ঠানকে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া চাই,' 'সকল আটক বন্দি ও রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি চাই', 'পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা চাই', 'প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকারের বদলে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা চাই'–প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে অবিলম্বে প্রচার আন্দোলন শুরু করা দরকার।

সংগঠন

(ক) ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া যে সর্বদলীয় ঐক্য ও সর্বদলীয় সংগঠন রূপ নিয়াছে তাহাকে আরও মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে। এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া সর্বদলীয় ঐক্যের উপর জনসাধারণের যে আস্থা জন্মিয়াছে তাহাকে আরও বাড়াইয়া তোলার চেষ্টা নিতে হইবে। সর্বদলীয় কমিটির মধ্যে সংস্কারবাদী মনোভাব দেখা দিবে, তাহার বিরুদ্ধে কমিটির ভিতরে ও বাহিরে হইতে লড়াই করিতে হইবে। এইভাবে সর্বদলীয় কমিটিকে আরও মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো সম্ভব হইবে। সর্বোপরি সঠিক নীতির ভিত্তিতে সর্বদলীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য ও আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বদলীয় ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে, তবেই সর্বদলীয় ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে। ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন আন্দোলনের সময়ে ও আগামী সাধারণ নির্বাচনের সময়ে সর্বদলীয় ঐক্য যাহাতে আরও ব্যাপক ও মজবুত ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিতে পারে, তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে।

ভাষা আন্দোলনের ব্যাপকতার তুলনায় ভাষা আন্দোলনের সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল। অতএব সংগঠন গড়িয়া তোলার উপর আমাদের বিশেষ জোর দিতেই হইবে। ভাষা আন্দোলনের ভিতর দিয়া জেলায় জেলায়, কোন কোন মহকুমায় এমনকি কোন কোন গ্রাম্য এলাকায় ও সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সেই কমিটিগুলো দমননীতির ফলে ও সংস্কারপন্থী নেতাদের পিছু হঠার ফলে অনেকখানি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। সংগ্রামশীল নেতা ও কর্মীদের লইয়া ও মজুর

কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটিগুলি পুনর্গঠন করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রচার আন্দোলন আরো সংগঠিতভাবে চালাইয়া যাওয়ার জন্য সর্বদলীয় কর্ম পরিষদের নেতৃত্বে কেন্দ্রে ও প্রত্যেক জেলায় ভলান্টিয়ার দল গড়িয়া তোলার উপর আমাদের বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন।

ভাষা আন্দোলনকে আরো অগ্রসর করিয়া নিয়া যাওয়ার জন্য ও আরও সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য ২৭শে এপ্রিল ঢাকায় 'প্রাদেশিক ভাষা কনভেনশন' হইতেছে। বর্তমান সময়ে এই কনভেনশনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত বেশি। তাই এই কনভেনশনে ভাষা আন্দোলনের সঠিক নীতি নির্ধারণ করিয়া সারা পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সারা প্রদেশব্যাপী সংগঠনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার চেষ্টা নিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে অনুরূপ কনভেনশন আহ্বান করিয়া ভাষা আন্দোলনকে সুপরিকল্পিতভাবে ও সংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা দরকার। প্রতিটি ভাষা কনভেনশন ও প্রতিটি সভায় ইংরেজি ভাষা চাপাইয়া রাখার বিরুদ্ধে ও সকল ভাষার সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সারা পূর্ববঙ্গে ও সমগ্র পাকিস্তানে আন্দোলন গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করুন। সর্বত্র সর্বদলীয় ভাষা সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তুলুন।

(খ) ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী ছাত্র ও যুবকদের অনেকের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মপন্থার প্রতি আস্থা বাড়িয়াছে এবং অনেকেই পার্টির নীতি ও কর্মপন্থা জানবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পার্টি নীতিতে বিশ্বাসী নতুন নতুন কর্মীদের লইয়া অবিলম্বে গ্রুপ গঠনের ব্যবস্থা করার দরকার। তাহাদের মার্কসবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য অবিলম্বে রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা করুন। ইহা অত্যন্ত জরুরি কাজ। তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মপন্থা প্রচারপত্র, পুস্তিকা ও আলোচনা বৈঠক মারফৎ ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

বিপ্লবী অভিনন্দন
পূর্ববঙ্গ সংগঠন কমিটি
পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

ভাষা আন্দোলন ধ্বংসকারী সরকারি দমননীতি ও কুৎসার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান

ভাইসব।
পাকিস্তানের শতকরা ৫৪ জন অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ববঙ্গের সমস্ত জনসাধারণ গত দুই মাস ধরিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে এক বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। মাতৃভাষার এই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্তের বন্যায় ডুবাইয়া দিবার জন্যই জল্লাদ নূরুল আমিন সরকারের পুলিশ মিলিটারি ঢাকায় নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র শোভাযাত্রার উপর নৃশংসভাবে গুলি চালাইয়াছে–কয়েকজন ছাত্র ও নাগরিক শহীদ হইয়াছেন। কয়েক শত লোক আহত হইয়াছেন। ৭-৮ শত লোককে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করিয়া, কার্ফিউ ও ১৪৪ ধারা জারি করিয়া লীগ সরকার দেশময় এক সন্ত্রাস রাজ কায়েম করিয়াছে।

দেশের জনসাধারণকে লুঠ করিবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ গায়ের জোরে ইংরাজি ভাষা চাপাইয়া দেশবাসীকে শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতির দিক হইতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছিল। বিশ্বস্তভাবে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বেইমান লীগ সরকার পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের উপর একমাত্র উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপাইতে চায়। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিতে যাইয়া দেশের জনসাধারণ নিরক্ষর ও বোকা বনিয়া থাকুক আর সেই সুযোগে তাহাদের উপর সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নির্বিঘ্নে চালান হইবে ইহাই বর্তমান লীগ শাসক শ্রেণীর মূল উদ্দেশ্য।

মাতৃভাষাকে খর্ব করিবার ও পূর্ববঙ্গকে দাস বানাইবার এই হীন চক্রান্ত দেশবাসী বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লয় নাই। বেয়নেট ও গুলির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সারা দেশে হরতাল, সভা ও শোভাযাত্রার মারফৎ বিক্ষোভের ঝড় তুলিয়াছে। খুনি সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের ষোল আনা লোক তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। গণ আন্দোলনের দুর্বার অগ্রগতি রোধ করিতে যাইয়া ফ্যাসিস্ট দমন নীতি যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখন নিজেদের শোষণের গদি রক্ষা করিবার জন্য লীগ সরকার বাংলা ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা ও কুৎসার অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মূল বক্তব্য হইল এই যে, ভাষা আন্দোলনের প্ররোচনা দিয়া বহু বিদেশী চর, কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, প্রভৃতি "রাষ্ট্রদ্রোহী" প্রতিষ্ঠান অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের দ্বারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী জমিদার এবং একচেটিয়া পুঁজির বিশ্বস্ত দালাল লীগ নেতৃবৃন্দ কোন তথ্য প্রমাণের ধার ধারে না। তাহাদের এই মিথ্যা প্রচার ও গলাবাজির মূল উদ্দেশ্য হইল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সমগ্র গৌরবময় অবদানকে হেয় করা। ভারতীয় ইউনিয়ন ও হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িকতার আওয়াজ তুলিয়া তাহারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে ও এইভাবে অনৈক্য ও বিভেদের অস্ত্রে বাংলা ভাষা আন্দোলনকে ধ্বংস করিতে চান। বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীরা উর্দু বিরোধী–এই মিথ্যা প্রচার দ্বারা তাহারা বাঙালি অবাঙালি সংঘর্ষের উস্কানি দিতেছেন। তাহা ছাড়া বাংলাভাষা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য প্রগতিশীল দল ও সংগঠনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কল্পিত অভিযোগ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দমন নীতির পথ পরিষ্কার করা হইতেছে। লীগ নেতৃত্বের এই কুৎসিৎ অপচেষ্টা সম্বন্ধে আমরা দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করিতেছি।

লীগ নেতাদের এই শয়তানী কায়দা নতুন নহে। লীগ সরকারের জালেমী চরিত্র বুঝিতে পারিয়া দেশের মেহনতি জনতা নিজেদের গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়ার জন্য যখনই কোন লড়াই আরম্ভ করেন তখনই মুসলিম লীগ সরকার নিজেদের শোষণের তখত নিরাপদ করিবার জন্য "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা" "ইসলাম বিপন্ন" ইত্যাদি বস্তাপচা পুরাতন বুলি আওড়াইয়া জনতাকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকে।

যে নাজিমউদ্দিন ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষার দাবি স্বীকার করিয়া লইবার ওয়াদা দিয়াছিলেন সেই নাজিমউদ্দিনই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্লজ্জের মত ১৯৫২ সালে সেই ওয়াদা খেলাপ করিলেন। আজ আবার প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ও প্রাদেশিক লীগ এসেম্বলি পার্টি বাংলা ভাষার জন্য দরদ দেখাইয়া কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিতেছে। কিন্তু লীগ নেতৃত্বের মেকি ওয়াদার মায়া কান্নাকে আর কোন মতেই বিশ্বাস করা চলে না। ইহাই হইল পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা।

পূর্ব পাকিস্তানের বাংলার দাবি হইল সমস্ত বাঙালির দাবি–তাহার আত্মনিয়ন্ত্রের দাবি। ইহাতে প্রাদেশিকতার চিহ্নমাত্র নাই। লীগ নেতৃত্বই সেই দাবির কণ্ঠরোধ করিতে গিয়া জাতিদ্রোহী কুচক্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করিয়া লীগ নেতৃত্ব তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও রেষারেষি পয়দা করিতেছেন। এইভাবে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করিয়া লীগ নেতৃত্বই পাকিস্তানকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদীদের শোষণমুক্ত প্রকৃত স্বাধীন গণতান্ত্রিক ও সুখী পাকিস্তান গড়িয়া তোলাই কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পথেই পার্টি সেই লক্ষ্যে পৌছাইতে চায়।

সেজন্যই কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করিতেছে যে:

- গণপরিষদের বর্তমান অধিবেশনেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হউক। উর্দুসহ পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষার সম মর্যাদা দিতে হইবে। আরবী হরফে বাংলা লেখার হীন চক্রান্ত বন্ধ করিতে হইবে। শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকেই চালু করিতে হইবে।

  প্রত্যেকটি বিরোধী দল ও মতের টুটি টিপিয়া ধরিয়া দেশে একনায়কী স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করিবার জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া লীগ সরকার ফ্যাসিস্ট জননিরাপত্তা আইন দ্বারা বিনা বিচারে ২০০০ (দুই হাজার) দেশপ্রেমিককে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সারা দেশে তুমুল প্রতিবাদ উঠিয়াছে। তাই আমরা দাবি করিতেছি:
- ভাষা আন্দোলনের বন্দিসহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি চাই।
- ঘৃণ্য নিরাপত্তা আইন, ১৪৪ ধারা প্রভৃতি সমস্ত পীড়নমূলক আইনের প্রত্যাহার চাই।
- অবিলম্বে খুনি নূরুল আমিন সরকারকে পদত্যাগ করিতে হইবে।
- ইংরেজ বিচারপতি দ্বারা গঠিত জন-বিরোধী তদন্ত কমিটি বর্জন করিয়া নিরপেক্ষ বেসরকারি তদন্ত কমিটি দ্বারা ঢাকার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চাই–অপরাধীদের শাস্তি চাই। ভাষা আন্দোলনের অপরাধে বন্দি ছাত্র

এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের রাষ্ট্র অপরাধে ঘৃণ্য অজুহাতে আটক তদন্তের প্রহসন করা চলিবে না।

অবিলম্বে অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন নূরুল আমিন সরকারের দুঃশাসনের অবসান ঘটাইয়া দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পথ সুগম করিতে পারে। প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দল, মত ও ব্যক্তি যাহাতে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন তাহার জন্য প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচন চাই।

উপরোক্ত দাবিসমূহ পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক সমস্ত জনতার জাতীয় দাবি। সুতরাং বগুড়ায় সমস্ত মজুর, কৃষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী সকলের নিকট কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান জানাইতেছে-আপনারা আগাইয়া আসুন। সম্মিলিতভাবে শপথ গ্রহণ করুন-যতদিন না বাংলা ভাষার দাবি পুরোপুরিভাবে পূরণ হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত সর্বদলীয় ভাষা কমিটির নেতৃত্বে আমরা ভাষার লড়াই চালাইয়া যাইব। শহরের পাড়ায় পাড়ায়, প্রতি গ্রামে গ্রামে গণসিহ. ডেপুটেশন, সভা-শোভাযাত্রা মারফৎ বন্দিমুক্তি ও পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি গড়িয়া মুসলিম লীগের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করুন। ঢাকার বীর শহীদদের আত্মত্যাগ কখনই ব্যর্থ হইবে না। ঢাকার রক্তরঞ্জিত রাজপথ ভাষার লড়াইয়ে আমাদিগকে নতুন শিক্ষা দিক। বীরপ্রসবিণী বাংলা ভাষার জয় সুনিশ্চিত হউক।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

বগুড়া জেলা কমিটি

পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি

সংযোজনী-৪

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৬৮ সালের কংগ্রেসের রিপোর্ট

নতুন রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের জন্ম

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান কায়েম হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও নিপীড়ন হইতে স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের জন্য অবিভক্ত ভারতের জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জনগণকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং ভারত উপমহাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামকে বিশ্বে ব্যাপক সাম্রজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের একই ধারায় টানিয়া আনিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির পরাজয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ফলে ভারত উপমহাদেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর কালে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর সংগ্রাম এবং দেশীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিদ্রোহ একত্রে মিলিত হওয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম দুর্বার গতিবেগ অর্জন করিয়াছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিমদশা উপস্থিত হইয়া ঔপনিবেশিক দাসত্ব হইতে সমগ্র জনগণের মুক্তি অত্যাসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা পূর্ব হইতেই তাহাদের চিরাচরিত 'বিভাগ কর এবং শাসন কর' নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের মধ্যে হিন্দু-মুসলামান সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বানচাল করিতে চেষ্টা করিতেছিল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব তাহাদের শ্রেণীগত বিভিন্ন দুর্বলতার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ঐকাবদ্ধভাবে সমবেত করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রাদায়কে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করিলেও ঐ নীতির সমর্থনে ব্যাপক জনগণকে সমবেত করিবার মত শক্তি তাহাদের ছিল না।

অপরদিকে ভারতের মুসলিম সামন্তভূস্বামী ও উদীয়মান মুসলিম ধনিক-বণিকের প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নিজেদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত ও শ্রেণীগত স্বার্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সহিত সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের দাবি উত্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের এই দাবি অবিভক্ত ভারতের ব্যাপক মুসলিম জনগণের সমর্থনও লাভ করিয়াছিল।

এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে একদিকে যেমন অবিভক্ত ভারতের জনতার স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ভারতে বৃটিশ শাসন অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি দেশ বিভাগের দাবিও জোরের সঙ্গে উত্থাপিত হইয়াছিল।

এই পটভূমিকায় ভারতীয় উপমহাদেশ ত্যাগ করিবার পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এই উপমহাদেশকে হিন্দ-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত এই দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। এইভাবে পাঁচটি বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি এবং ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম এই দুইটি স্বতন্ত্র অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এই রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা-প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ নেতৃত্ব তথা মুসলিম সামন্ত ভূস্বামী ও উদীয়মান মুসলিম বুর্জোয়াদের হাতে অর্পণ করে।

তাই, ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম বটে কিন্তু নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী শোষণও রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান রহিয়া গেল।

শাসক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতিসমূহ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশিক লুণ্ঠন আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক সকল দিক হইতেই পঙ্গু করিয়া রাখিয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হন জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁহাদের মৌল কর্তব্য ছিল উপনিবেশিক শোষণের কুফলগুলি বিলোপ করা, শিল্প ও কৃষি কাজের উন্নয়ন করত জাতীয় অর্থনীতির

পুনর্গঠন করা জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিশ্চিত করা, বিভিন্ন ভাষাভাষীয় জাতির একত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত এবং সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও সামন্তবাদের অবশেষসমূহ বিলোপ করা।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্বাধীনতা লাভের পর জনগণের ভিতর উদ্দীপনা ঐ সব মৌল কর্তব্যগুলো সম্পাদনের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আঁতাতের নীতি পরিহার করিয়া শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির সহিত সহযোগিতা ঐ সকল মৌল কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে আবশ্যক ছিল।

কিন্তু বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থরক্ষা পাকিস্তানের শাসকগণ জাতীয় উন্নয়নের পথ গ্রহণ করেন এবং নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে।

১. ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে

আমাদের দেশের কৃষিতে এখনও সামন্তবাদী অবশেষসমূহ রহিয়া গিয়াছে। ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের মূলনীতি হইল সামন্তবাদের কিছুটা সংস্কার সাধন করিয়া উহা জিয়াইয়া রাখা, জোতদার ও ধনী কৃষকদের সুবিধা দেওয়া এবং কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি চালু করিয়া ধনতান্ত্রিক পন্থায় চাষবাদে উৎসাহ দান। সরকারের এই নীতির এবং গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এই পথে সামগ্রিকভাবে দেশের কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ফলে আমাদের দেশে খাদ্য ঘাটতি স্থায়ী হইয়াছে এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট ধরনা দিয়া এই দেশে তাহাদের অনুপ্রবেশের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়।

সামরিক শাসন আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে যে ভূমি সংস্কার আইন করা হইয়াছে তাহাতে বড় বড় অভিজাত ভূস্বামীদের হাতেই বেশির ভাগ জমি রহিয়া গিয়াছে এবং নতুন আবাদি জমি প্রধানত বড় বড় সামরিক কর্মচারী ও আমলাদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। আবাদি জমির মাত্র ২ শতাংশের কম কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। এই আইনের ফলে কিছু সংখ্যাক ধনী কৃষকদের কোন

সমস্যারই সমাধান হয় নাই। তাই ভাগচাষ প্রভৃতি ধরনের সামন্তবাদী ধরনের শোষণ থাকিয়াই গিয়াছে।

পূর্ব বাংলায় জমিদারি প্রথায় উচ্ছেদ হইয়াছে এবং ইহার ফলে সামন্তবাদী ব্যবস্থা খর্ব হইয়াছে। জমিদারি মধ্যস্বত্ব প্রথার উচ্ছেদ, ধানী খাজনার স্থলে টাকায় খাজনার প্রবর্তন, বেগার প্রথার বিলোপ প্রভৃতির ফলে কৃষকরা কিছু লাভবান হইয়াছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী কৃষকদের স্বার্থে ভূমিব্যবস্থার হাতে প্রচুর পরিমাণ জমি কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। কৃষকরা জমি পায় নাই। ফলে ভাগচাষ, জমি বন্ধকী, জমি পত্তন প্রভৃতি সামন্তবাদী শোষণ খর্ব করিবার জন্য বিভিন্ন রকম আইন হওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের দুরবস্থার বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামান্য কিছু সংখ্যাক জোতদার ও ধনী কৃষকই মাত্র সরকার প্রতিষ্ঠিত কৃষি ব্যাঙ্ক, মালটিপারপাস সোসাইটি, সুবিধাজনক শর্তে ট্রাক্টর ও স্প্রেয়িং যন্ত্র ক্রয় প্রভৃতির সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। এখানে জমিদারি উচ্ছেদ আইনে পরিবার প্রতি জমির উচ্চতা সীমা ১০০ বিঘা (৩৩ একর) নির্ধারণ করা হইয়াছিল। কিন্তু সামরিক সরকার বড় বড় ভুস্বামীদের খুশি করিবার জন্য উহা প্রায় চারিগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। পূর্বপাকিস্তানে কৃষি উন্নয়ন এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির তথ্য ইহার সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের একটি প্রধান শর্ত হইল বন্যা জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি নিরোধের এবং জল সেচের স্থায়ী ব্যবস্থা করা। কিন্তু সরকার এই সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে কোন স্থায়ী ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া কেবল জোড়াতালি দিয়া চলে।

ক। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

অবিভক্ত ভারতে যে সব অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়, সেগুলি ছিল শিল্পে খুবই পশ্চাৎপদ। তদুপরি, দেশ বিভাগের পর ঐ নব অঞ্চলের বিত্তশালী হিন্দুদের দেশ ত্যাগের ফলে পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে পাকিস্তানে নতুন করিয়া এক ধনিক শ্রেণীর ও এ দেশীয় শিল্পের উদ্ভব হয়। দেশ বিভাগের পর ভারত ও অন্যান স্থান হইতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক শ্রেণীর মুসলিম ধনিকগণ তাহাদের পুঁজি নিয়া এ দেশে চলিয়া আসে এবং বেশির ভাগ করাচী এলাকায় বসতি স্থাপন করে। ইহারা ছিল প্রধানত ব্যবসায়ী। এই ধনিকগণ এবং পাঞ্জাবের কয়েকটি ধনী পরিবার নিয়া পাকিস্তানের নতুন ধনিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্ত বাহিরে হইতে আগত ও পাঞ্জাবের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরাই প্রথম হইতেই

পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বেশি সাহায্য লাভ করে। রাষ্ট্রের অকুণ্ঠ সাহায্য ও আনুকূল্য লাভ করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় এবং শ্রমিকদের উপর অকথ্য শোষণ চালাইয়া ও কৃষকদের কাঁচামাল সস্তাদরে কব্জা করিয়া ঐ ধনিকগণ পাকিস্তানে দেশীয় শিল্প, ব্যাংক প্রভৃতি গড়িয়া তোলে এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে লুঠ করিয়া অতি বৃহৎ ধনীকে পরিণত হয়।

দেশীয় শিল্প বাণিজ্য ব্যাংক ও পুঁজির তিন-চতুর্থাংশের বেশি বর্তমানে মাত্র কয়েকটি ধনিক পরিবারে কুক্ষিগত হইয়াছে এবং অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টি হইয়াছে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর উপর এই একচেটিয়া পুঁজির প্রভাবই বর্তমানে সবচাইতে বেশি। দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তানে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং এই সকল ধনিক এখানে প্রতিযোগিতাহীন সংরক্ষিত বাজার পায় তাহাও ইহাদের বিকাশে সাহায্য করে। স্বাধীনতা লাভের পর এইভাবে ধনবাদী পন্থায় আমাদের দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কতক অগ্রগতি সাধিত হয়।

শাসকগোষ্ঠী প্রধানত সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানায় ধনতান্ত্রিক পন্থায় শিল্প স্থাপনের নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু আজিকার দুনিয়ার ধনতন্ত্র যখন এক স্থায়ী ও ক্রমবর্তমান সঙ্কটে নিপতিত এবং সাম্রাজ্যবাদ অন্তিম দশায়-তখন এই ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোন অনগ্রর দেশের জাতীয় শিল্পোন্নয়ন এবং প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। পাকিস্তানের মত পশ্চাৎপর দেশে শিল্পের বাধামুক্ত বিকাশের জন্য মূল প্রয়োজন হইল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণকে খতম করা সামন্ত বাদের অবশেষগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ করা বৃহৎ পুঁজির মনোপলি গড়িয়া উঠিতে না দেওয়া, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুইটি পৃথক অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে গণ্য করিয়া যথার্থ পরিকল্পনা মাফিক দেশের উভয় অঞ্চলে শিল্পের উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভারী ও মূল শিল্প গঠন এবং ধনতান্ত্রিক পথে স্বাধীন অর্থনীতি গড়িয়া তোলা। আজিকার দুনিয়ার বেসামাল ও শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব এবং অনুন্নত দেশের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে শর্তহীন সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ আমাদের দেশে শিল্প বিকাশের এক অপূর্ব সুযোগ ও উপস্থিতি সৃষ্টি করে।
কিন্তু শাসকগোষ্ঠী দেশের উন্নয়নের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং শিল্পের ক্ষেত্রে যেসব নীতি অনুসরণ করিতে থাকে তাহাতে দেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির

শোষণ খতম করার পরিবর্তে যে পুঁজির স্বার্থ রক্ষা কর হয়, মূল শিল্প গঠনের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিকট হইতে বিনাশর্তে ও স্বল্পসুদে সাহায্য পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের বদলে সাম্রাজ্যবাদী বিশেষত মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদী নিকট হইতে ক্ষতিকর শর্তে ও উচ্চ সুদে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং মূল শিল্প গঠনে জোর না দিয়া প্রধান জোর দেওয়া হয় হালকা শিল্প ও কৃষির সহিত সম্পর্কিত শিল্পের উপর। সামন্তবাদী ব্যবস্থার পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করা হয় না এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শিল্প গঠনের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় বড় পুঁজিপতিকে নিজেদের ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প গঠনের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এমনকি সরকারি পুঁজি ওপি, আই, ডি, সি প্রভৃতির অধীনে যেসব শিল্প গঠন করা হয় ঐগুলোও লাভজনক হইয়া উঠিলে তাহাও ঐ বড় পুঁজিপতিদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। পুঁজি সরবরাহকারী সরকারি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আনুকূল্য ও দীর্ঘকালের জন্য ট্যাক্স হলিডে প্রভৃতির সুযোগও বৃহৎ ধনিকগণ ভোগ করিয়া থাকে।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বর্তমানে বিভিন্ন কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সহিত বাণিজ্য সম্প্রসারণের এবং পুঁজিবাদী শিবির হইতে অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া কিছু পরিমাণ ভারী শিল্প ইত্যাদি নির্মাণের পথে অগ্রসর হইবার নীতি লইয়াছে বটে। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শাসক গোষ্ঠী এখনও সাম্রাজ্যবাদীদের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করে নাই। পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি এখনও মূলত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহিত বাঁধা রহিয়াছে।

খ। শাসকগোষ্ঠীর এইসব প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফল হয় মারাত্মক

প্রথমত সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য গ্রহণের ফলে দেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বিশেষত মার্কিনী পুঁজি দ্রুত অনুপ্রবেশ করে। অর্থ সাহায্যের উচ্চ সুদ, পণ্য চালান ও অন্যান্য পন্থায় ঐ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশ লুণ্ঠন করে, আমাদের দেশ মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া বিশেষত মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরশীল থাকে। এই দেশে তাহাদের এই নতুন অবস্থানের সুযোগ নিয়া ঐ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ স্বার্থে আমাদের দেশকে অনুন্নত রাখিবার মানসে এখানে মূল শিল্প গঠনে বাধা দেয়। সাম্রাজ্যবাদী বিশেষত মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরশীল শাসকগোষ্ঠীর তাহা মানিয়া নেয়। ফলে এ দেশে যতটুকু শিল্প বিকাশ

হয় তাহাও হয় একপেশে, তাহা প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকে হাল্কা শিল্পের গণ্ডির মধ্যে দেশে ইস্পাত শিল্প ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্প শিল্পের স্বাধীন বিকাশ ঘটে না।

ইহা ছাড়া মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীরা সামরিক সাহায্য দিয়া আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থার ভিতর অনুপ্রবেশ করে এবং সৈন্যবাহিনীর উপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। অর্থের বলে ইহারা প্রতিক্রিয়াশীল মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও অনেক দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতাকে হাত করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজির সাথে ইহারা এখানে যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলে। প্রতিক্রিয়াশীল মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও অনেক দক্ষিপন্থী নেতা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সহযোগিতা করে। এইভাবে আমাদের দেশে মার্কিনি ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের একদল সহযোগী সৃষ্টি হয় এবং তাহাদের মাধ্যেমে ঐ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করে ও দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে।

দ্বিতীয়ত দেশের জনসংখ্যার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষক সমাজের উপর সামন্ত বাদী অবশেষসমূহের শোষণ বজায় থাকার দরুন ও একচেটিয়া পুঁজির কারসাজিতে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাইবার ফলে তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা নিম্নস্তরে থাকে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে শিল্পজাত পণ্যের বাজার সংকুচিত থাকে এবং ইহা শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে মূল শিল্প গঠন ও সারা দেশে সমবায়ে শিল্পবিকাশের নীতি গ্রহণের পরিবর্তে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে দেশের মুষ্টিমেয় বড় ধনিককে তাহাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে অধিক সুযোগ ও অবাধ অধিকার দেওয়ার ফলে সারা দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উপর মাত্র কয়েকটি ধনিক পরিবারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়া দেশের অর্থনীতিতে এক সমূহ বিপদের সৃষ্টি হবে। ইহাদের প্রতিযোগিতা ও চাপে বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মাঝারী ও ছোট পুঁজিপতিরা নিজ বিকাশের কোন পথ পাবে না। পূর্ব পাকিস্তানসহ দেশের কতকগুলি অঞ্চল শিল্প গঠনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ থাকে ও দেশে অর্থনীতিতে এক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি, শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা

পাইয়া ইহারা দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে নির্মমভাবে শোষণ করে, বাজারের কারসাজি দ্বারা কৃষিজাত কাঁচামালের দাম কমাইয়া ও ইহাদের শিল্পজাত পণ্যের দাম বাড়াইয়া কৃষক মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য জনসাধারণকে লুণ্ঠন করে এবং দেশের আপামর জনসাধারণ দুর্ভোগের বিনিময়ে অকল্পনীয় মুনাফা আহরণ করে। ফলে, ঐ মুষ্টিমেয় শোষকের হাতে প্রভূত সম্পদ জমা হয় ও অপর দিকে শ্রমজীবী মানুষের ঘাড়ে দুঃখের বোঝা বাড়ে।

চতুর্থত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহিত বাঁধা থাকাতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা বাজারের কাসসাজি দ্বারা এই দেশের রপ্তানিযোগ্য কাঁচামালের (পাট প্রভৃতি) দর কমাইবার সুযোগ পায় এবং দেশকে দেশের চাষীদের বঞ্চিত করিয়া সস্তা দরে ঐ কাঁচামাল নিয়া যাইতে সক্ষম হয়। বৈদেশিক মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয় এবং দেশের শিল্প বিকাশে বাধার সৃষ্টি হয়।

অতএব, ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর শিল্প ও বাণিজ্য নীতি শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থে রচিত হয়। এবং এই নীতি জাতীয় শিল্পের অবাধ ও স্বাধীন বিকাশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

গ। জাতীয় সমস্যা প্রসঙ্গে :

বাঙালি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পাঠান ও বেলুচ-এই পাঁচটি ভাষাভাষী জাতি ও কয়েকটি উপজাতি এবং ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুইটি অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত। স্বাধীনতা লাভের পর এই জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন বিকাশে এবং তাহাদের প্রত্যেকের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করাই ছিল সরকারের কর্তব্য। বস্তুত প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন বিকাশ ও তাহাদের প্রত্যেকের জাতিগত অধিকারসমূহের পূর্ণ স্বীকৃতি এবং পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের পথই ছিল গোটা পাকিস্তানের সমৃদ্ধি ও সংহতি সাধনের একমাত্র পথ।

কিন্তু শাসকগোষ্ঠী "মুসলমানরা একজাতি,' 'ইসলামী ঐক্য' প্রভৃতির ধুঁয়া তুলিয়া জাতিগত নির্যাতনের নীতি অনুসরণ করে এবং পাকিস্তানের জাতিসমূহের স্বতন্ত্র

জাতীয় সত্তা বিলোপ করার চেষ্টা করে' এবং "পাকিস্তানে জাতিসমূহের স্বতন্ত্র জাতীয় বিলোপ করার চেষ্টা করে এবং পাকিস্তানে একটি অবিভাজ্য ও শক্তিশালী রাষ্ট্রস্থাপনের" অজুহাতে কেন্দ্রে একটি স্বৈরাচারী এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থ কায়েম করে। ইহারা পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির অস্তিস্ত অস্বীকার করিয়া সেখানে জবরদস্তিমূলক "এক ইউনিট" চাপাইয়া দেয়, উহাদের বিভিন্ন ভাষা ও সৃষ্টির বিকাশকে স্তব্ধ করে, এখানকার সমস্ত জাতিগুলোর মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণের অধীনে সপিয়া দেয়। ইহারা পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট জাতিগুলির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত ও বাঙালি জাতি অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পদদলিত করে এবং এমন কি বাঙালি জাতির মাতৃভাষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পর্যন্ত নস্যাৎ করিবার চক্রান্তও করে।

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের এবং অবাধ বিকাশের প্রশস্ত পথ ছিল এখানকার অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, দেশরক্ষা প্রভৃতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই অঞ্চলের অধিবাসীদের হাতে ন্যস্ত করা। ইহাই ছিল গণতন্ত্রসম্মত পথ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী সে পথ গ্রহণ করে না। শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া এখানাকর সম্পদের উপর তাহাদের পেটোয়া দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের শোষণের সুবিধা করিয়া দেয়। ইহারা অবাধে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নেয়। এখানকার শিল্প, ব্যাংক, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরেও ইহাদের একচেটিয়া একাধিপত্য স্থাপিত হয়। তদুপরি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এবং পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের ব্যাপারে এক বৈষম্যমূলক নীতিও অনুসরণ করে। এই সকলের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সুষ্ঠু অর্থনীতি গড়িয়া উঠার পরিবর্তে এখানকার অর্থনৈতিক সামাজিক জীবন ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা-দীক্ষাসহ সর্ব বিষয়েই পশ্চাৎপদ থাকিয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী "মুসলমানরা একজাতি" ও "ইসলামী ঐক্যের" নামে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের যে নীতি গ্রহণ করে তাহাতে সুবিধা হয় একমাত্র এ দেশের মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের। গোটা পাকিস্তানে ইহাদের শোষণের রাজত্ব গড়িয়া

উঠে ও সমস্ত জাতিগুলিকে লুণ্ঠন ও শোষণ করিয়া ইহারা মুনাফার পাহাড় তৈয়ার করে। পক্ষান্তরে শাসকগোষ্ঠীর ঐ গণবিরোধী নীতির ফলে বিভিন্ন জাতির উপর অত্যাচার হয়। বিভিন্ন জাতির স্বাধীন বিকাশ স্তব্ধ হয়, বিভিন্ন জাতির ভিতর জাতিগত ও দুই অঞ্চলের মধ্যে অঞ্চলগত বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতর বৈষম্য গড়িয়া উঠে।

ঘ। গণতন্ত্র প্রসারের ক্ষেত্রে :

পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী প্রথম হইতেই দেশে গণতন্ত্র প্রসারের ব্যাপারে প্রবল বাধার সৃষ্টি করিয়া আসিতে থাকে। ব্রিটিশ শাসনের আমলেও দেশবাসীর যে গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল ক্রমে ক্রমে তাহারা উহাও কাড়িয়া নেয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হইলে "এক ধর্ম, এক জাতি এক দেশ এক দল, এক নেতা এই প্রতিক্রিয়াশীল জিগির তুলিয়া শাসকগোষ্ঠী তাহাদের বিরোধী সকল শক্তিকে নির্মূল করিতে চেষ্টা করে। এইভাবে তাহারা শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণী আন্দোলন ও সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে এবং সকল গণতান্ত্রিক শক্তির মুখ চাপা দিতে প্রয়াস পায়। এইভাবে তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীদের জনবিরোধী শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। এই একই উদ্দেশ্যে তাহারা দেশে কোন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনায় নানা রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার নয় বৎসর পরে ১৯৫৬ সালে একটি শাসনতন্ত্র গৃহীত হইলেও তাহাকে কার্যকরী করিতে দেওয়া হয় না। শাসকগোষ্ঠী তাহাদের এই দুষ্কর্মে ব্রিটিশ শিক্ষিত আমলাদের পরিপূর্ণ সমর্থনই শুধু পায় না, অনেক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগত এই সকল আমলারাই গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের ইন্ধন যোগায়। গণতন্ত্রকামী জনতার হাত হইতে এই স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শিক্ষিত, তাহাদের প্রতি অনুরক্ত এবং বিশেষভাবে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীদের শিক্ষা ও সাহায্যপ্রাপ্ত এবং তাহাদেরই পৃষ্ঠপোষণকারী সামরিক কর্তাদের উপর দেশের শাসনভার অর্পণ করে। গণতন্ত্র উৎখাত করিয়া স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষভাবে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদ সব সময়ই সমর্থন ও সাহায্য জোগায়। দেশের শাসনতন্ত্র উৎখাত করিয়া ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক কর্তা ও আমলাদের ক্ষমতা দখল, দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহও

সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়। আইনের শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেও দেশে স্বৈরাচারী শাসনই চলে এবং সারা দেশে দমননীতি চালাইয়া সামরিক কর্তা, পুলিশ ও আমলাদের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

ঙ। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শাসকগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে। ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করা তো দূরের কথা জনসাধারণের নিজেদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ব্যবস্থার যতটুকু বিস্তার ঘটিয়াছে শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে তাহাকেও সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করে। শিক্ষা সংকোচন সরকারের মূলনীতি। প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষার সুযোগ একেবারেই অপ্রতুল এবং ইহা খুবই ব্যয়বহুল। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার বহু বাগাড়ম্বর করে, কিন্তু দেশের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে এগুলোর প্রসার ঘটেনা। সর্বোপরি শাসকগোষ্ঠী "ইসলাম" ও যথার্থ ইতিহাসের নাম করিয়া নানা রকম কুশিক্ষা দিয়া মানুষের মনকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও নানা রকম সংস্কৃতি বিকাশে বাধা দেওয়া এবং উহাকে বিপথগামী করা তাহাদের লক্ষ্য।

শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য হইল পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহের নিজস্ব জাতিগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, জাতীয় বোধ, জাতীয় সত্তা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধিতা গণতান্ত্রিক ভাবধারার উৎসব হইতে জনগণকে দূরে সরাইয়া রাখা। শাসকগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদের আদর্শ যত দুর্বল হইয়া পড়ে ততই বেশি করিয়া ইসলাম ভিত্তিক জাতি, মুসলিম লীগের "জাতীয় আন্দোলন" পাকিস্তানের আদর্শ প্রভৃতি কথা বলিয়া তাহারা উহাকে জিয়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। একদিকে ধর্মীয় সংস্কার অন্যদিক ইয়াংকি সংস্কৃতির অনুকরণ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে এক বিকৃত সংস্কৃতি গড়িয়া তোলার চেষ্টা হয়। পুস্তক, পত্রিকা, ছবি, ছায়াছবি, সাম্রাজ্যবাদীদের পরিচালিত সাময়িক প্রমোদ ভ্রমণ প্রভৃতি বিভিন্নসূত্রে নানা রকম নোংরা প্রচার চালাইয়া দেশবাসী ও বিশেষত তরুণ সমাজের মনকে কলুষিত করিবার এবং তাহাদিগকে নীতিবোধ বিবর্জিত করিবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলে। দেশবাসীর জাতীয় সত্তাবোধ ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিলুপ্ত করিবার জন্য শাসকগোষ্ঠী এইভাবে মরণপণ চেষ্টা করে। প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিবার জন্য ইহা তাহাদের একটি মৌলিক কাজ।

চ। পাক-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে

অবিভক্ত ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্তান ও ভারত এই দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর হইতেই এই দুইটি দেশের ভিতর কাশ্মীর সমস্যা, সীমানা নির্ধারণ, সংখ্যালঘু সমস্যা প্রভৃতি নিয়া তিক্ত সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। উভয় দেশের শাসকগোষ্ঠী দুই দেশের মধ্যে তিক্ততা ও বিরোধের নীতিই অনুসরণ করে। দুই দেশের ভিতর এরূপ বিরোধপূর্ণ-সম্পর্ক হেতু দুই দেশের শাসকগোষ্ঠী সামরিক খাতে বহু অর্থ ব্যয় করে এবং জাতীয় উন্নয়নের ক্ষতি করে।

দ্বিতীয়ত এই বিরোধের ফলে উভয় দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে ভয়-ভীতি ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে, ঐ বিরোধের সুযোগ নিয়া উভয় দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিগুলি মাঝেই মাঝেই সম্প্রদায়ের সাধারণ জনগণের প্রাণহানি ধন-সম্পত্তি নষ্ট প্রভৃতি অপরাধজনক কাজগুলি অনুষ্ঠিত করে ও উভয় দেশের সংখ্যালঘু লোকদের বাস্তুত্যাগে বাধ্য করে। পাক-ভারত বিরোধের ফলে দুই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণের সর্বনাশ হয়।

তৃতীয়ত পাক-ভারত দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়া ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিরোধে আরও উস্কানি দেয়; একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগাইয়া এবং উভয় দেশকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের লোভ দেখাইয়া দুইটি দেশেই তাহাদের অবস্থান দৃঢ় করিতে চেষ্টা করে। ইহার ফলে এই দুই দেশের মধ্যে ক্ষতিকর যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে এবং এরূপ যুদ্ধের ফলে একদিনে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আরও সংকুচিত হইয়াছে, অন্যদিকে দুই দেশেরই অর্থনৈতিক অগ্রগতি আরও ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

চতুর্থত পাক-ভারত বিরোধের সুযোগ নিয়া আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী "ভারতীয় জুজুর" জিগির তুলিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করিতে সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নানারূপ রাজনৈতিক, সামাজিক নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ ভোগ করে। শাসকগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য জনতার মধ্যে ধর্মের নামে বিচ্ছেদ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টিতে উৎসাহ দান করে।

ছ। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে

পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী নীতি অনুসরণ করে।

আজিকার দুনিয়ায় মানবজাতির প্রধান দুশমন মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীদের আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীগুলি ধনবাদী বিকাশ এবং নিজেদের শ্রেণীশোষণ ও শাসন দৃঢ় করার যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল উহার পরিণামে পাকিস্তান মার্কিনি পুঁজির নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের জালে গভীরভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সামরিক জোটে ও চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপদাপন্ন হইয়াছিল। তদুপরি পাকিস্তান সাম্রাজ্যাবাদীদের যুদ্ধ ষড়যন্ত্রে জড়াইয়া পড়িয়া দুনিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের শিবিরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল।

পরবর্তীকালে পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিজ শিল্প বিস্তারের চাহিদার সঙ্গে পাকিস্তানে মার্কিন পুঁজির নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয়, পাক-ভারতের ভিতর বৈরী সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য পাক-মার্কিন সম্পর্কে অবনতি ঘটায় এবং মার্কিনি সাম্রাজাবাদীদের প্রভাব ও মর্যাদা হ্রাস ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির ফল হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্যের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাও সরকারের বৈদেশিক নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল না থাকিয়া সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও উন্নত করে। সমাজতান্ত্রিক শিবির হইতে অর্থনৈতিক সাহায্যও গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে নিজস্ব স্বাধীনপন্থা অবলম্বন করে।

সরকারের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলি হইলেও শাসকগোষ্ঠী এখনও ডলার, গম, অস্ত্র সাহায্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদী বিশেষত মার্কিনি

সাম্রাজ্যবাদীদের দুয়ারে ধরনা দেয়, উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর সাহায্যের নামে বিরাট পরিমাণ মার্কিনি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করিতে দেয়। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশির ভাগ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহিত বাঁধা রাখে এবং পাকিস্তান এখনও সেন্টো-সিয়াটো ও মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত একাধিক দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে শরিক থাকে তাই বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি পরিবর্তন হইলেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত তাহাদের সহযোগিতা ছিন্ন করে না। ইহার ফলে পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদী বিশেষত মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ হইতে মুক্ত হয় না, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার হয়, দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়; দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বিলুপ্ত হয় না এবং দেশের অভ্যন্তরে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের বিপদ বিদ্যমান থাকে।

পাকিস্তানের সমগ্র জনগণ ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের বদলে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্তবাদী ভূস্বামীদের স্বার্থে পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারিত হয়। তাই সরকারের বৈদেশিক নীতি একদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত সহযোগিতা ও অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সহিত সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন-এই দ্বৈত চরিত্র গ্রহণ করে। পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠী প্রথম হইতেই দেশের জনগণের স্বার্থেই বিরোধিতা করিয়া চলে। ইহার ফলে জনগণের উপর ইহাদের প্রভাব কম। এই সকল কারণে এইরূপ আশা করা যায় না যে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যথার্থভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করিবে। বরং দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হইয়া উঠিলে ঐ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলো আবার সাম্রাজ্যবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে এবং সরকারের বৈদেশিক নীতি আবারও চরম প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ধারণ করিতে পারে।

বস্তুতঃ প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বৈদেশিক নীতি এক অস্থিতিশীল অবস্থাকে এবং প্রধানত জাতীয় স্বার্থ- বিরোধী পথে পরিচালিত হয়।

গণজীবনের সঙ্কট

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর গণ বিরোধী নীতিসমূহের ফলশ্রুতিতে দেশের শ্রমিক, কৃষক ও

অন্যান্য মেহনতি জনগণ চরম দুর্ভোগ ভোগ করে ও উহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠে।

শ্রমিক শ্রেণী

শাসকগোষ্ঠী এই সব নীতির ফলে শ্রমিকের উপর ধনিকদের অমানুষিক শোষণ চলে। জীবন ধারণের উপযোগী নিম্নতম মজুরির অভাব, মালিকের খেয়াল খুশিমত ছাঁটাই, চাকরির স্থায়িত্বের অভাব, বাসস্থান, চিকিৎসা, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব, আইনত নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত খাটুনি, শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি, বেকারী এবং দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের আসল মজুরি প্রাক স্বাধীনতা কালের চাইতেও হ্রাস প্রভৃতি শ্রমিকদের জীবনে গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করে।

তদুপরি, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর শ্রম চলাচলের স্বাভাবিক সুবিধার এবং পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যার আধিক্য অথচ শিল্পের অপেক্ষাকৃত কম বিকাশ হেতু পূর্ব পাকিস্তানে শ্রমিকদের উপর ধনিকদের শোষণের মাত্রা বেশি হয় এবং এই অঞ্চলের শ্রমিকদের আসল মজুরি ও পশ্চিম পাকিস্তানের মজুরির হারের চাইতে কম থাকে।

অন্যদিকে, সরকারের দমনমূলক নীতির জন্য শ্রমিকগণ নিজেদের শ্রেণী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু, ধনিক শ্রেণী যে আধা অধিকার ভোগ করে তাহার সুযোগে এবং দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও সরকারের জাতিগত বৈষম্যের নীতির সুবিধা নিয়া তাহারা শ্রমিকদের ভিতর হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি, স্থানীয় বনাম বহিরাগত প্রভৃতি বিভেদ উস্কাইয়া শ্রমিকদের ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টা করে, স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের নিয়ম কানুনও মানিতে অস্বীকার করে এবং শ্রমিকদের প্রতি মানবোচিত ব্যবহারও করে না।

কৃষক সমাজ

শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের তোষণ করার যে নীতি অনুসরণ করে তাহার ফলে কৃষকদের ভিতর একটি ক্ষুদ্র সমৃদ্ধ অংশের

কিছু সুবিধা হইলেও সাধারণ কৃষক সমাজের দুর্গতির সীমা থাকে না। কৃষকদের একটা বড় অংশ ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনই থাকে এবং কাজের অভাব, বেকারী বা কাজ জুটিলেও কম মজুরি, খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের চড়া দাম প্রভৃতির নিষ্পেষণে ঐ বিপুল সংখ্যক কৃষক মানবেতর জীবন যাপন করে। যে সব কৃষকের হাতে কিছু জমি আছে তাহারাও খাজনা, ট্যাক্স, ঋণের বোঝায় জর্জরিত। অর্থকরী ফসলের ন্যায্য দাম হইতে বঞ্চিত ও দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে নিষ্পেষিত হইয়া চরম দুর্গতির ভিতর দিন যাপন করে ক্রমে ক্রমে নিঃস্ব কৃষকের পঙ্‌ক্তিতে শামিল হওয়ার পথে চলে। ভাগচাষীরা বর্গাপ্রথার দ্বারা এবং সাধারণ কৃষকরা মহাজনী প্রথার দ্বারা শোষিত হইয়া নিঃস্ব হইতে থাকে। ইহা ছাড়া, সমগ্র মেহনতী কৃষক সমাজই শিক্ষা ও নিজেদের সংগঠন গড়ার বাধা অধিকারসহ সকল প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে এবং ইহাতে কায়েমী স্বার্থবাদীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন আরো বেশি করিয়া তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। মেহনতী কৃষক সমাজ হইল জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তাই, ইহাদের চরম দুরাবস্থা সমগ্র সমাজের প্রগতির পথে এক দুরূহ সমস্যা সৃষ্টি করে।

মধ্যবিত্ত

পাকিস্তান, প্রতিষ্ঠার পরে নানাবিধ কারণে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশের দেশত্যাগ এবং এখানে ধনবাদের নতুন উদ্ভব হেতু মধ্যবিত্ত সমাজের একটা ছোট অংশ কিছু সুবিধা পায় বটে। কিন্তু, সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিসমূহ সমাজে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনে যে সঙ্কট সৃষ্টি করে তাহাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। তদুপরি, খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের আকাশচুম্বী দাম, ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা, চাকরির ক্ষেত্রে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি, শহরে বাসস্থানের অভাব ও উচ্চ ভাড়া প্রভৃতির চাপে মধ্যবিত্ত পরিবারবর্গের জীবন ধারণের মানের দ্রুত অবনতি ঘটে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অভাব ইহাদের জীবনকে আরো অসহনীয় করিয়া তোলে।

জাতীয় ধনিকগণ

দেশের সম্পদের উপর মার্কিনি পুঁজির নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ এবং কৃষকদের উপর সামন্তবাদী অবশেষগুলির শোষণে বাজারের সংকোচনের ফলে

দেশের কল্যাণকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের, বিশেষতঃ মাঝারি ও ছোট ধনিকগণের বিকাশ ব্যাহত হয়। তদুপরি শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা ও বাণিজ্যের উপর মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতির কর্তৃত্ব ও উহাদের প্রতি সরকারের আনুকূল্য হেতু ঐ ধনিকগণ নানা বিড়ম্বনা ভোগ করে ও উহাদের বিকাশের পথ আরো রুদ্ধ হয়।

এই সব সাধারণ সমস্যা ছাড়াও, পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ মনোভাব, এই অঞ্চলের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অনুন্নত অবস্থা এবং এখানে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, জ্বালানি প্রভৃতির অভাবহেতু এখানকার জাতীয় ধনিকগণ যাহাদের অধিকাংশ স্বল্প পুঁজির মালিক নিজেদের বিকাশের পথে অধিকতর বাধার সম্মুখীন হয়।

শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী চরিত্র

নিজেদের জীবনের গভীর সঙ্কট ও তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনগণ ক্রমেই ইহা উপলব্ধি করে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে যাহারা দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছে তাহারা জনগণের স্বার্থের চাইতে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ধনিক ও সামন্তবাদী ভূস্বামীদের স্বার্থকে উর্ধ্বে স্থান দেয়। ইহাদের স্বার্থের জন্যই শাসকগোষ্ঠী মার্কিনি পুঁজির সাহায্য নেয় ও দেশে সাম্রাজ্যবাদী ও বিশেষত মার্কিনি পুঁজির নয়া ঔপনিবেশিক শোষকদের স্বার্থ রক্ষার্থে শাসকগোষ্ঠী আমলা ও সামরিক কর্তাদের সহযোগে দেশে এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপন করে এবং সমগ্র শাসন ব্যবস্থা ঐ শোষকদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত থাকে।

ইহার জন্যই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরেও দেশ হইতে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ বিলুপ্ত হয় না বরং নতুন করিয়া মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতির শোষণ জনগণের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। ইহার ফলে সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহ শৃঙ্খলিত থাকে, দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হয় এবং ঐ শোষকদের শোষণে শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি জনগণের জীবনে সঙ্কট বৃদ্ধি পায়। ঐ মুষ্টিমেয় শোষকদের স্বার্থেই জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও জনগণের অধিকার

পদদলিত করা হয়। ঐ শোষকদের স্বার্থ রক্ষার্থে জনগণের ভিতরে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য শাসকগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদকে জনগণের সামনে একটা মৌলিক আদর্শ হিসেবে উপস্থিত করে এবং সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিদ্বেষ দ্বারা জনগণকে কলুষিত করার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর সামাজিক প্রগতির যেসব সমস্যা জনগণের সামনে উপস্থিত হয়, একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্তবাদীদের স্বার্থরক্ষক এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী শাসকগোষ্ঠীর শাসনাধীনে সেই সব সমস্যার কোন সুসমাধান হয় না, বরং সমস্যাগুলি জটিলতর হয়।

তাই, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি জনতা আজও নিপীড়ন, বুভুক্ষ, ও নিরক্ষর থাকে। তীব্র সঙ্কটে নিপতিত মেহনতি জনগণ প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয়, নিজেদের বিভিন্ন অধিকারের জন্য শ্রমিক, ছাত্র মধ্যবিত্ত, শহরের গরীব প্রভৃতি বার বার গৌরবময় সংগ্রাম করে এবং কোন পথে দেশী বিদেশী শোষকদের শোষণের অবসান হইয়া সামাজিক অর্থনৈতিক প্রগতির দ্বার উন্মুক্ত হইতে পারে ও জনগণের মুক্তি আসিতে পারে এই পথ আজ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য মেহনতি জনগণের মনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে।

মুক্তির পথ

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিয়া বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যেখানে জনগণ সকল রকম শোষণ ও নিপীড়ন হইতে চিরতরে মুক্তি পাইবে এবং তাহাদের জীবনে নিশ্চয়তা, শান্তি ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হইবে।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের দেশের গত ২১ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতেও দেশের শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণ এই শিক্ষা লাভ করিতেছে যে, ধনবাদের পথে আজ জনগণের মুক্তি এবং তাহাদের জানে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসে না; বরং ধনবাদ জনগণের দুঃখ-দুর্দশাই বৃদ্ধি করিয়া চলে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা হইতে জনসাধারণ ক্রমেই উপলব্ধি করিতেছে যে, সমাজতন্ত্রই জনসাধারণের পরিপূর্ণ মুক্তি ও প্রগতির একমাত্র এবং প্রকৃষ্ট পথ। তাই, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি দেশবাসীর

সম্মুখে সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শ তুলিয়া ধরিতেছে এবং বিদেশী ও দেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের সকল শোষণ ও নিপীড়নের অবসান ঘটাইয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সকলের নিকট আহ্বান জানাইতেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া অধনতান্ত্রিক পন্থায় এই মহান পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

জাতীয় অর্থনীতির স্বাধীন ও অবাধ বিকাশ এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তথা শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনসাধারণের জীবনে দারিদ্র্য ও নিপীড়ন দূর করিয়া দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক বিকাশ সাধনের জন্য সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী প্রতিক্রিয়াশীল মুষ্টিমেয় একচেটিয়া ধনিক ও সামন্তবাদী ভূস্বামীদের গণবিরোধী সরকারের অবসান ঘটাইয়া দেশে সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী, ও দেশীয় একচেটিয়া পুঁজির শোষণের বিলোপ করত দেশের স্বাধীনতা সংহত করে সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের অবাধ বিকাশ নিশ্চিত করা, সমাজ জীবনের পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য অপুঁজিবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ প্রভৃতি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌল কর্তব্যগুলো সম্পাদন করার প্রয়োজন রহিয়াছে। অনুন্নত এই দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐ কর্তব্যগুলো সম্পাদনের মধ্য দিয়াই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের পথ প্রশস্ত হইবে।

তাই, গণবিরোধী শাসকশ্রেণীগুলোকে ক্ষমতার আসন হতে অপসারণ করতঃ স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি আজ শ্রমিক কৃষক-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য মেহনতি জনগণকে আহ্বান জানাইতেছে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নিম্নোক্ত কর্মসূচি তাহাদের সামনে পেশ করিতেছে।

স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি

দেশের স্বাধীনতা সংহত ও সুদৃঢ় করিবার জন্য

১. বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির জাতীয়করণঃ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করা, দেশ হইতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘাঁটি বিলোপ, সেন্টো ও সিয়াটো প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোট পরিত্যাগ করা এবং মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় সামরিক ও অসম অর্থনৈতিক চুক্তিসমূহ নাকচ করা।

২. বৈদেশিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নীতি অনুসরণ করা, সকল দেশের সাথে সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বন্ধত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন, সমাজতান্ত্রিক শিবির, আফ্রো এশিয়ায় দেশসমূহ ও মিত্র ভাবাপন্ন অন্য সকল দেশের সাথে সহযোগিতা, আপন প্রতিবেশী ভারত ও আফগানিস্তানের সাথে সমস্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা এবং শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের সহিত এক কাতারে দাঁড়াইয়া বিশ্বশান্তির রক্ষা ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতায় নীতি অনুসরণ করা।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য

৩. রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বময় ও সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক আইন সভার হাতে ন্যস্ত করা, প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালু করা, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরাইয়া আনিবার অধিকার জনগণকে দেওয়া, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র নিশ্চিত করা এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

৪. জনগণের বাক্ স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা শ্রমিক কৃষক ও অন্যরা যাহাতে ঐ সব অধিকার অবাধে ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা; সর্ববিধ দমনমূলক আইন রহিত করা, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিসমূহ নির্ধারণের ব্যাপারে জনসাধারণ যাহাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া। নগর, শহর ও গ্রামের স্থানীয় ব্যাপারসমূহ পরিচালনার জন্য জনগণের নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা

এবং সরকারি শাসন পরিচালনার কার্যে এইসব প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা এবং কোন আইন বিধি সম্মত কিনা তাহা নির্ধারণের ভার বিচারালয়ের উপর অর্পণ করা।

৫. রাষ্ট্রের চোখে জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করা এবং ধর্মগত ও মতাদর্শগত কারণে কাহারও প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ না করা।

৬. প্রত্যেক নাগরিকের নিজ বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী মতামত ও ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অধিকার নিশ্চিত করা। কাহারও ধর্ম বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করা। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রচারণা বেআইনি করা।

৭. আমলা- পুলিশের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শিক্ষিত, তাহাদের প্রতি অনুরক্ত এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত সম্পর্কিত আমলা, পুলিশ ও সামরিক কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং দেশরক্ষা বাহিনী হইতে অপসারণ করা।

জাতিসমূহের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য

৮. পাকিস্তানের জাতিসমূহের বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা। একমাত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি গড়িয়া উঠিতে পারে। পাকিস্তানের বিভিন্ন উপজাতিসমূহের বিকাশের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

শিল্পের অবাধ উন্নয়নের জন্য

৯. রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ভারী ও মূল শিল্প গড়িয়া তোলা, শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পকে প্রধান নির্ধারণ শক্তি হিসেবে গড়িয়া তোলা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ইত্যাদির উপর গণপ্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই সব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শিল্প গঠনের মূলধন সংগ্রহ ও অর্থনীতির উপর হইতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কর্তৃত্ব বিলোপের জন্য ব্যাঙ্ক, বীমা, পাটশিল্প ও ব্যবসা বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবহন ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্প বিস্তারের জন্য পুঁজিপতিদের বিশেষত স্বল্প

পুঁজির মালিকদের উৎসাহ প্রদান ও তাহাদের সুযোগ-সুবিধা দান। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প বাণিজ্য প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এখানকার অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দেওয়া। অন্যান্য ভাষাভাষী জাতির ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতি অনুসরণ করা। সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে সকল দেশের সাথে সমতার ভিত্তিতে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে বাণিজ সম্পর্ক রক্ষা করা।

কৃষি উপকরণের জন্য

১০. ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও ভাগ চাষ প্রথা প্রভৃতিসহ সমস্ত প্রকার সামন্তবাদী শোষণের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ, জমির পুনর্বণ্টন করিয়া ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের ভিতর জমি বিতণের নীতি অনুসরণ, জমি হইতে উচ্ছেদের ফলে যে সকল অ-কৃষক ভূস্বামীর গ্রাসাচ্ছাদের ব্যবস্থা থাকিবে না তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা; কৃষকদিগকে সমবায় চাষে উৎসাহিত করা, রাষ্ট্র হইতে কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার, নামমাত্র সুদে কৃষি ঋণ প্রভৃতি দ্বারা কৃষকদিগকে সাহায্য করা, সেচ-ব্যবস্থা এবং বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস নিরোধের জন্য রাষ্ট্র হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন, খাজনা প্রথা তুলিয়া দিয়া জমিতে উৎপন্ন ফসলের মোট আয়ের উপর আনুপাতিকহারে কর ধার্যের নীতি অনুসরণ করা এবং কৃষকদের অর্থকরী ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করা।

শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য

১১. অবৈতনিক সার্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা; কম খরচে সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বহু সংখ্যক বিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, ডাক্তারি, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার সকল স্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা এবং বাংলা ভাষায় বিকাশের জন্য রাষ্ট্র হইতে সর্ব প্রকার সাহায্য দান। পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী উর্দু ভাষাভাষীদের নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও নিজেদের সংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া তোলার অধিকার দান। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন অঞ্চলে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষীদের শিক্ষা লাভ ও সাংস্কৃতিক জীবন রক্ষার অধিকার দান।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ও ভাষাভাষী জাতির নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাহাদের ভাষাগুলির বিকাশের জন্য রাষ্ট্র হইতে সাহায্য করা।

১২. সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও আমলাদের খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমাইয়া জনগণের শিক্ষা; সংস্কৃতি ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বেশি করিয়া অর্থ ব্যয় করা। চিকিৎসা সুযোগ জনগণের জন্য সহজলভ্য করিয়া তোলা।

শ্রমিক কর্মচারীদের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের জন্য

১৩. শ্রমিকদের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি, চাকরির স্থায়িত্ব, দৈনিক উর্ধ্বে ৮ ঘণ্টা কাজ, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, ধর্মঘট এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা। তাহাদের বাসস্থান, ছুটি, পরিবারসহ সকলের শিক্ষা, চিকিৎসার বন্দোবস্ত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা।

কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির জীবন ধারণের যোগ্য আয় নির্ধারিত করা, তাহাদের জীবিকা, ও চাকরির সংস্থান এবং নিশ্চয়তা বিধান ও তাহাদের উপর হইতে করভার লাঘব করা। শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

নারী সমাজরে মুক্তি ও উন্নতিকল্পে

১৪. সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষদের সহিত নারীর সমান অধিকার, সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা। সর্ববিধ সামাজিক নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ ইহাতে নারী সমাজের মুক্তির ব্যবস্থা করা। নারীদের ভিতর শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তিসমূহ

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উপরোক্ত কর্মসূচির ব্যবস্থারূপে ও জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতির শোষণ বিলুপ্ত হইয়া শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতার বিকাশ নিশ্চিত হইবে এবং দেশের কল্যাণকামীর জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থও পূরণ হইবে। তাই ঐ কর্মসূচিতে ঐ সব শ্রেণীগুলোর স্বার্থ নিহিত রহিয়াছি এবং ঐ কর্মসূচির

ভিত্তি করিয়া শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও জাতীয় বুর্জোয়ারা জনগণের প্রধান দুশমন সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটি মোর্চায় সমবেত হইয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট গড়িয়া তুলিতে পারে। ক্রমে সমবেত বিভিন্ন শ্রেণী নিজ নিজ শ্রেণী অবস্থান অনুযায়ী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে।

(ক) অনুন্নত এই দেশে শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যায় কম হইলেও এবং তাহাদের ভিতর কতকগুলি পশ্চাদপদতা থাকিলেও ধনবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদের ভিতর পারস্পরিক স্বার্থের কোন সংঘাত নাই এবং তাঁহারা একটি অবিভাজ্য শ্রেণী। সামাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাশে তাঁহাদের অবস্থান। তাঁহারা বহু সংখ্যক একসাথে ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে, একসঙ্গে বসবাস করে ও পরস্পরের সাহায্যে দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সহিত শ্রমিক শ্রেণীর কোন সম্পর্ক নাই এবং তাঁহারা কাহাকেও শোষণ করে না। বরং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীই সবচাইতে শোষিত ও নির্যাতিত, বর্তমান সমাজব্যবস্থা রক্ষায় তাহাদের কোন স্বার্থই নাই এবং সমাজতন্ত্রই শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ।
এই সকল কারণেই শ্রমিকশ্রেণী হইল বর্তমান সমাজে সবচাইতে জঙ্গি, বিপ্লবী ও প্রগতিশীল শ্রেণী। নিজশ্রেণীর মুক্তির জন্য শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের উচ্ছেদের সংগ্রাম তথা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সবচেয়ে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত অংশ নিবে এবং ঐ শোষকদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

(খ) শ্রমিকশ্রেণীর মত কৃষকসমাজ একটি অবিভাজ্য শ্রেণী নহে। কৃষকদের ভিতর প্রধানত চারটি স্তর রহিয়াছে-ধনী, মধ্য, গরীব ও ভূমিহীন। ইহাদের ভিতর স্বার্থের বিভিন্নতাও আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শোষণে সমগ্র কৃষক সমাজই নানাবিধ নিপীড়ন ভোগ করে এবং মেহনতি কৃষকসমাজ (মধ্য, গরীব ও ভূমিহীন) ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। একমাত্র দেশি-বিদেশি ঐ শোষকদের শোষণের উচ্ছেদ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হইলে কৃষকদের জমি অর্থকরী ফসলের ন্যায্য মূল্য, গ্রাম্য সমাজ জীবনের গণতন্ত্রীকরণ প্রভৃতি সমস্যার সামাধান হইতে পারে। তাই কৃষক সমাজ দৃঢ়ভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক

ফ্রন্টে শামিল হইবে। তাছাড়া কৃষকসমাজ হইল জনসংখ্যা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। সুতরাং কৃষকরা হইল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রধান শক্তি।

বস্তুত শ্রমিক ও কৃষক সমাজের এই দুইটি সবচেয়ে শোষিত নির্যাতিত ও বিপ্লবী শ্রেণীর মৈত্রীই হইবে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মূল ভিত্তি। এইরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হইলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্জন করিবে।

(গ) বর্তমান সমাজে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের কতকগুলি মোহ পিছুটান এবং রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত দুর্বলতা রহিয়াছে বটে। কিন্তু, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ত বাদ ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শোষণে ইহাদের বিকাশেরও কোন পথ নাই, বরং ইহাদের অবস্থা ক্রমে অধিকতর শোচনীয় হইতেছে। তাই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশেষ করিয়া দেশে শিল্পের বিকাশ জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিপূরক, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে ইহাদের গভীর স্বার্থ রহিয়াছে। বাস্তবেও দেখা যাইতেছে যে পূর্ব পাকিস্তান বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ইহার বিশেষত ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কোন সময়ে অগ্রণী ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে দৃঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

(ঘ) দেশের সম্পদের উপর সাম্রাজ্যবাদ ও ভূমিব্যবস্থায় সামান্তবাদের অবশেষগুলি শোষণ এবং সমগ্র অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কর্তৃত্ব হেতু জাতীয় ধনিকগণের বিশেষত মাঝারী ও ছোট ধনিকদের বিকাশ রুদ্ধ হয় বলিয়া ইহারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বাস্তবভাবে (অবজেকটিভলি) আগ্রহীশীল ও এই অর্থে তাহারা প্রগতিশীল। পূর্ব পাকিস্ত ানের নবজাত জাতীয় ধনিকগণ ঐ অর্থেই প্রগতিশীল। তাহা ছাড়া এই অঞ্চলের শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রাধান্যহেতু ইহাদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ধনিকদের দ্বন্দ্ব খুবই তীব্র এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় এই ধনিকগণ গভীরভাবে আগ্রহী। তাই জাতীয় ধনিকগণ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শামিল থাকিতে পারে। কিন্তু এই ধনিকগণ শোষকও বটে। ইহারা শ্রমিক কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলনকে ভয়ের চোখে দেখে। এইজন্য জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রামে ইহাদের দোদুল্যমানতা ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে আপোষমুখিতা থাকিবে। তাই

> শ্রমিক কৃষকদের মৈত্রীর শক্তি দ্বারা ইহাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে শামিল রাখিতে হইবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম জনগণের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করিলে জাতীয় বুর্জোয়ারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে শামিল হইবে।

সুতরাং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে ভিত্তি করিয়া শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও দেশের কল্যাণকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের নিয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্তবাদ বিরোধী একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হইবে। এই ফ্রন্ট হইবে মুষ্টিমেয় দেশি-বিদেশি কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিকামী জনগণের বৈপ্লবিক ফ্রন্ট।

স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার

আমাদের দেশে স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সে জন্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে দেশবাসীর বিভিন্ন জরুরি ও সাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক দাবিসমূহ পূরণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ফ্রন্ট সহিত ফ্রন্ট ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সকল বিপ্লব ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সুদৃঢ় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে। শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী শ্রেণী আন্দোলন ও শ্রেণী সংগঠন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মূল শক্তি হিসেবে কাজ করিবে। তাই শ্রমিক ও কৃষকদের শক্তিশালী শ্রেণী আন্দোলন ও শ্রেণী সংগঠন গড়িবার উপর শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী দেশের কল্যাণকামী জাতীয় বুর্জোয়া এবং অন্যান্য গণতন্ত্রকামী দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের সমবায়ে গঠিত স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দান করিবে এবং স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করিবে। এই ফ্রন্ট ও সরকারের উপর শ্রমিকশ্রেণী ও উহার পার্টি যে পরিমাণে তাহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে, স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক কর্মসূচিই সেই পরিমাণে কার্যকারী করা সম্ভব হইবে। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও সরকারের অভ্যন্তরে

শ্রমিক শ্রেণী ও উহার পার্টি নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সাম্রজ্যবাদ সামন্তবাদ একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী কর্মসূচি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হইয়া অধনতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব হইবে। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণী ও উহার পার্টিকে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কাজে ত্যাগ নিষ্ঠা ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা এই ফ্রন্ট ও জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্ব অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। তবে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে এই সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত থাকিতে হইবে। যে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রথম হইতেই শ্রমিক শ্রেণীর একক নেতৃত্ব নাও থাকিতে পারে। ব্যাপক কৃষকসমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী এবং গণতান্ত্রিক মধ্যাবিত্ত বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক, মৈত্রীর ভিত্তিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ এবং এইজন্য অগ্রণী ভূমিকা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রমিক-কৃষক মেহনতি জনগণের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণী সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণই হইবে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির শক্তির উৎস। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীর যৌথ নেতৃত্ব থাকিলেও উহাকে সঠিক পথে অগ্রসর করিয়া লইবার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হইলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও সরকারে অন্তর্ভুক্ত জাতীয় বুর্জোয়া ও গ্রাম্য ধনিক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাহাদের শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করিতে চাহিবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের সংগ্রামে নানারূপ দোদুল্যমানতা দেখাইবে, এমনকি এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাহারা বহুবিধ অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। তাই শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে শ্রমিক, কৃষক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য মেহনতি জনগণকে দৃঢ় সংগ্রামের পথে সমবেত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিয়া অধনতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য শ্রমিক শ্রেণী ও উহার পার্টিকে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে ক্রমে নেতৃত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তবায়ন

ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা সারা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিকে নিপীড়ন করে এবং মুষ্টিমেয় শোষকদের স্বার্থে সকল ভাষাভাষীর সমস্ত মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার নাকচ করে, তাহাদের জাতিসত্তা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে ও তাহাদের জীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। তাই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গকে পরাস্ত করিয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার জন্য পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ও অঞ্চলের জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। শ্রমিক শ্রেণী ও উহার পার্টিকে সমস্ত প্রকার জাত্যাভিমানের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন বৈশিষ্ট্য এখানকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা ও প্রকৃতি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতর অসম সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এখানকার জাতিসমূহে লেনিনবাদী আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির স্বীকৃতি প্রভৃতি বাস্তব বিষয় বিচার করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিকে পূর্ব বাংলায় স্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

পূর্ব বাংলায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হইলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগ্রামও অগ্রসর হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হইলে এখানকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবও অনুপ্রাণিত হইবে।

নতুন দুনিয়ার নতুন সুযোগ

বর্তমান দুনিয়ার জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে এক অভূতপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এখন আর তাহাদের খুশিমত দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এখন বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশের অধিক (একশত কোটি) মানুষ তাহাদের ভাগ্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পথ বাছিয়া নিয়াছেন। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্বের শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ছাড়াইয়া যাইবে। জনপ্রতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রধান শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মোড়ল এবং বর্তমান দুনিয়ার সবচাইতে বড় শোষক ও প্রতিক্রিয়ার সব চাইতে বড় স্তম্ভ শ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী শক্তি মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদকে ছাড়াইয়া যাইবে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সাধারণ অর্থনৈতিক সঙ্কট আজ এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। এই দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নিঃস্বার্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া শান্তিকামী নতুন নতুন নিরপেক্ষ স্বাধীন দেশ জাতীয় শিল্পের বিকাশ করিয়া তাহাদের দেশের অর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত করিতেছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য ঐ সকল দেশকে অধনতান্ত্রিক পন্থায় স্বাধীন জাতীয় বিকাশের পথ গ্রহণের সুবিধাও করিয়া দিতেছে। "আজ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রামী শক্তিগুলোই সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান মর্মবস্তু ধারা এবং প্রধান বিশেষত্বগুলিকে নির্ধারণ করে। সাম্রাজ্যবাদ যত রকমই চেষ্টা করুক ইতিহাসের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। আমাদের এই কালের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সমাজ বিকাশের নির্ধারক উপাদান হইয়া উঠিতেছে। গত কয়েক বৎসরের খতিয়ান হইল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরাক্রম এবং আন্তর্জাতিক প্রভাবের দ্রুত বৃদ্ধি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আঘাতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙ্গনের প্রবল প্রক্রিয়া পুঁজিবাদী দুনিয়ার শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমাগত অবনতি আর ক্ষয়। সামাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রাপ্ত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আঘাতে ঔপনিবেশিকতাবাদ ধসিয়া পড়িতেছে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের পরাধীন ও অনগ্রসর দেশগুলির দুর্বার মুক্তি আন্দোলন চীন, উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনামে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য এবং ভিয়েতনামের জনগণের মহান ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আমাদের দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় এবং সমাজতান্ত্রিক শিবির ও জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতি ও বিজয় আমাদের দেশবাসীকে প্রভাবান্বিত করিতেছে। এমনকি, আমাদের দেশের ধনিক শ্রেণীর মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাহায্য জাতীয় অর্থনীতি ও শিল্প বিকাশের পক্ষে মনোভাব দেখা যাইতেছে। জাতীয় শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদিদের নানা ধরণের বাধা এবং আমাদের দেশকে কুক্ষিগত রাখিবার জন্য ইহাদের নানাধিক

কৌশল বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটগুলি এবং দেশের অন্তন্তর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্বন্ধে দেশের মধ্যে সচেতনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বিশেষত বাঙালি, বেলুচ, পাঠান, সিন্ধি প্রভৃতি জাতির জনগণের মধ্যে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে এবং এই আন্দোলনে ক্রমেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আন্দোলনে রূপান্তরিত হইতে শুরু করিয়াছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক জন্য আন্দোলন ক্রমেই ব্যাপক ও তীব্র হইতেছে। ভারতের দালালি ও ষড়যন্ত্র আন্দোলনকে চাপা দেওয়া ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। শ্রমিক কৃষকদের শ্রেণীর সংগ্রাম বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার উন্মেষ ঘটিতেছে।

বর্তমানের এই সুবিধাজনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এবং দেশবাসী চিন্তার এই পরিবর্তনের মুখে, দেশবাসীর মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য আমরা যদি স্বাধীন জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য দেশবাসীকে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানাইয়া উহার কর্মসূচিতে জনপ্রিয় করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে অবশ্যই সাড়া পাওয়া যাইবে।

সংযোজনী-৫

হানাদারদের খতম করুন।
বাংলাদেশকে মুক্ত করুন ।।

ভাইসব,

পাকিস্তানের শোষকদের সীমাহীন শোষণ ও অত্যাচার হইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য গত দুই মাসের অধিককাল যাবৎ এক বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হইয়াছে।

বাংলাদেশের জনগণ নিজেদের জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ গণতান্ত্রিক পথে বহু সংগ্রাম করিয়াছেন। নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির ন্যায্য দাবি দাওয়া পূরণের আশা নিয়া বাংলাদেশের জনগণ গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোটও দিয়াছিলেন।

কিন্তু পাকিস্তানের শয়তান শোষকগোষ্ঠী গত ২৩ বৎসর যাবৎই বাংলাদেশের জনগণের সমস্ত ন্যায্য দাবিকে পশুশক্তি দ্বারা দমন করিয়াছে। পরিশেষে নির্বাচনের পরে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার বদলে ঐ শয়তানরা গত ২৫শে মার্চ হইতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও বর্বর যুদ্ধ শুরু করিয়াছে।

এই অবস্থাতেই বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ অতি ন্যায্য সঙ্গতভাবে হাতিয়ার হাতে নিয়া পাকিস্তানের হানাদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইতেছেন। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এই মুক্তিযুদ্ধে শরিক রহিয়াছেন ও ইহাকে সমর্থন জানাইতেছেন। ইহার জন্য বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের জনগণকে মোবারকবাদ জানাইতেছে এবং মুক্তিযুদ্ধে যাহারা প্রাণ দিয়াছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতেছে।

বাংলাদেশের জনগণের এই স্বাধীনতা সংগ্রামকে পিষিয়া মারার জন্য বর্বর ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের হানাদার সৈন্যরা বাংলাদেশে গণহত্যা, শহর-গ্রামে হাজার

হাজার ঘরবাড়ি পোড়ান, ব্যাপক লুটতরাজ ও আমাদের অগণিত মা-বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি নারকীয় কার্যকলাপ চালাইতেছে। ইহারা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ জনগণকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ খুনি শয়তানদেরই অস্ত্র ও অর্থ জোগাইয়াছে ও জোগাইতেছে। চীনের নেতারাও ইহাদেরই ঢালাও সমর্থন জানাইয়াছে। তাহাদের সাহায্য ও সমর্থন পাইয়া পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র আজ সোনার বাংলাকে শশ্মানে পরিণত করিয়াছে।

বাংলাদেশের জনগণ এই নরপশুদের ক্ষমা করিতে পারে না। যে রক্তের বন্যা ইহারা বাংলাদেশে বহাইয়াছে তাহার যোগ্য প্রতিশোধ নিতে হইবে। বাংলাদেশের জনগণের রক্তের ঋণ দুশমনদের রক্তেই পরিশোধ করিতে হইবে।

বাংলাদেশের জনগণের সামনে আজ দুইটি পথ খোলা রহিয়াছে। হয় হানাদার সৈন্যদের নির্মূল করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করিতে হইবে, নতুবা সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে পাকিস্তানের শোষকদের গোলাম হইয়া থাকিতে হইবে।

কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ গোলামির চাইতে মরণকে শ্রেয় বলিয়া মনে করেন। তাই, তাহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথই বাছিয়া লইয়াছেন। বাংলাদেশের জনগণের এই সংগ্রাম হইল তাহাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম, তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়িয়া তোলার সংগ্রাম।

সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সরবরাহকৃত অর্থ ও অস্ত্রবলে বলীয়ান পাকিস্তানি শোষকদের দখলদারি সৈন্যদের সশস্ত্র যুদ্ধ দ্বারা নির্মূল করিয়াই বাংলাদেশের জনগণের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম বিজয়ী হইতে পারে। তাই এই সংগ্রামে বিজয়ের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে আরও অনেক ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কিন্তু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণ আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও উহার জন্য সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। জন কয়েক দালাল ছাড়া বাংলাদেশের সমস্ত মানুষই আজ পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। সামরিক শাসকচক্রের কোন সমর্থনই বাংলাদেশে নাই।

পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত জনগণ ও নিপীড়িত জাতিগুলো তাহাদের গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের জন্য পাকিস্তানের শাসকচক্রের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। পাকিস্তানের যে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ আজ সংগ্রাম করিতেছেন সেই শাসকচক্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণেরও শত্রু। তাই বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি তাহাদের সমর্থন ও পাওয়া যাইবে।

ইহা ছাড়া দুনিয়ার প্রগতিশীল জনগণ বাংলাদেশে পাকিস্তানের শোষকচক্রের গণহত্যা প্রভৃতি অমানুষিক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিয়া বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাহাদের সমর্থন ও সহানুভূতি জানাইয়াছেন। তাই হানাদার সৈন্যদের হাতে আজ যত অস্ত্রই থাকুক না কেন, ইহারা বাংলাদেশের জনগণের উপর যত অত্যাচারই করুক না কেন উপরোক্ত তিনটি কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয় সুনিশ্চিত। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের এই দৃঢ় আস্থা নিয়েই আজ বাংলাদেশের জনগণকে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। যে কোন মূল্যেই হোক বাংলাদেশের স্বাধীনতা কায়েম করিতে হইবে। এই সংগ্রামে জয়ের জন্য আজ সবচেয়ে প্রয়োজন হইল শত্রুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি প্রভৃতি সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের এবং আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমস্ত সংগ্রামী শক্তির অটুট একতা ও সংঘবদ্ধতা। এরূপ একতা স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। দুশমনদের বিরুদ্ধে আজ গণ ঐক্যের লৌহদৃঢ় প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের জনগণের নিকট আবেদন জানাইতেছে যে,

১. সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দুশমনদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। শহরে পাড়া ও গ্রামগুলোকে এক একটি দুর্ভেদ্য যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করুন। সেজন্য শহরে পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামে গ্রামে দলমত নির্বিশেষে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিয়া গোপনভাবে মুক্তি সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তুলুন।
২. জনগণের মধ্যে ফাটল ধরাইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামকে নষ্ট করার জন্য ইয়াহিয়া

সরকারও তাহাদের দালাল মুসলিম লীগ, জামাতে-ইসলাম প্রভৃতিরা সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত হানাহানি, উস্কানি দিতেছে এবং বহু স্থানে লুটতরাজ প্রভৃতি করাইতেছে। সকলে মিলিয়া ইহা প্রতিরোধ করুন। পাড়ায় বা গ্রামে কোন দুষ্কৃতিকারী যাহাতে লুটতরাজ, খুনা-খুনি করিতে না পারে তাহার জন্য মুক্তিসংগ্রাম কমিটির পক্ষ হইতে গোপনভাবে স্থানীয় বাহিনী গঠন প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করুন এবং দুষ্কৃতিকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দিন।

৩. হানাদার সৈন্যদের সাথে সবদিক দিয়া অসহযোগিতা করুন এবং ইয়াহিয়া সরকারের সকল প্রকার কাজকর্মের প্রচেষ্টা অচল করিয়া দিন। যে সব দালাল হানাদার সৈন্যদের সহিত সহযোগিতা করে ও করিবে মুক্তিসংগ্রাম কমিটিতে তাহাদের বিচার করুন ও তাহাদের খতম করিয়া দিন।

৪. মুক্তিফৌজ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সকল প্রকার সাহায্য করুন। ইহাদের সম্পর্কে সকল খবরাখবর সম্পূর্ণ গোপন রাখুন। অন্যদিকে শত্রুদের সকল খবর মুক্তি যোদ্ধাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিন।

পরিশেষে বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়ের নিকট কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান জানাইতেছে যে, হানাদার সৈন্যরা যখন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে শশ্মানে পরিণত করিতেছে ও আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করিয়া দিতেছে তখন আপনারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। আপনারা ইহার বদলা নিন। হাজারে হাজারে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করুন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা হানাদার সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করিয়া স্বাধীন ও নতুন বাংলা গড়িয়া তুলুন।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টি, তারিখ: ২৫ শে মে'৭১ ঢাকা।

গেরিলা যোদ্ধাদের অবশ্য পালনীয় নীতিমালা

১. জনগণের উপর আস্থা রাখতে হবে। তাদের উপর নির্ভর করেই সমস্ত লড়াই চালাতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক লোক সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থাকতে হবে।

২. জনতার নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে লোকালয় বা বস্তি এলাকার ভিতরে কোন আক্রমণ সংঘঠন পরিহার করাই উচিত। তবে অনিবার্য প্রয়োজন হলে জনতাকে জানিয়ে ও তাদের সাথে পরামর্শ করে operation চালানো যাবে।

৩. সমস্ত চলাচল ও action সাধারণভাবে রাত্রেই করতে হবে। বিশেষ ব্যবস্থা বা প্রয়োজন হলে দিনে চলাচল বা action করা চলবে।

৪. প্রত্যেকটা operation-এর পূর্বে সমস্ত খবর ও তথ্যাদি বিশেষভাবে জানতে হবে। পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট প্রস্তুতি নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক যোদ্ধার কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে এবং পরীক্ষা (check up) করে দেখতে হবে।

৫. শত্রুর শক্তির উপর পূর্ণ প্রাধান্য না হলে, অন্তত শতকরা ৭৫ ভাগ সাফল্য নিশ্চিত না হলে কোন action-এ যাওয়া চলবে না। সব সময় সর্বনিম্ন ক্ষতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে action-এ যাওয়া দরকার।

৬. আহত সহযোদ্ধাকে ফেলে আসা চলবে না।

৭. সম্পূর্ণ নিরাপদে যাওয়ার ও ফিরে আসার এক বা একাধিক পথ এবং পরে একত্রিত হওয়ার নিরাপদ স্থান পূর্বে নির্ধারণ না করে কোন operation-এ যাওয়া উচিত হবে না।

৮. যেখানে থাকবে সেখানে সব সময় নিজেদের আত্মরক্ষা ও আক্রমণ শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

৯. মূল আশ্রয়স্থল থেকে এর action স্থান ন্যূনতম ১০ মাইল দূরে নির্ধারণ করতে হবে। Action-এর স্থান থেকে মাঝপথের (ফিরতিপথের) মিলন ক্ষেত্রের দূরত্ব কমপক্ষে ৫ মাইল হওয়া দরকার। নিজেদের বিকল্প আশ্রয়স্থল না থাকলে বর্তমান আশ্রয়স্থলে আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত operation চালানো যাবে না।

১০. বিশ্বস্ত লোক ছাড়া পথ প্রদর্শক নিয়োগ করা চলবে না।

১১. সাধারণ লোকের কোন রিপোর্ট পরীক্ষা না করে গ্রহণ করবে না। নিজের লোক দিয়েই পরীক্ষা করতে হবে।

১২. শুধুমাত্র সংশ্লিষ্টরা ছাড়া কারুর কাছে গোপন বিষয় প্রকাশ করা চলবে না।

১৩. কেহ অবস্থান ঘাঁটি ত্যাগ করলে বা গ্রেফতার হয়ে গেলে, তক্ষুনি সকলকে অবস্থানস্থল ছেড়ে অন্য নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হবে।

১৪. গুরুত্ব অনুসারে আক্রমণের লক্ষ্য হবে (ক) অস্ত্র সংগ্রহ (খ) যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করা (গ) শত্রুর সর্বপ্রকার যুদ্ধ সহায়ক ও বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সম্পদ (ঘ) শত্রুর সংশ্লিষ্ট শাসনযন্ত্র থানা স্টাফ (ঙ) শত্রু সেনার খণ্ডদল, দালাল ও রাজাকার বাহিনীর নেতৃবর্গ। সৎ ও বন্ধু রাজাকার বা পুলিশদের স্বপক্ষে আনতে হবে।

১৫. শহর এলাকায় লক্ষ্য ও কাজ হবে ঃ ধ্বংসাত্মক কাজ, অনুপ্রবেশ, সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ।

১৬. শত্রু যখন ছোট ছোট দলে চলাচল করে এবং যখন কোন প্রকার আক্রমণের আশঙ্কা করে না তখনই শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে।

১৭. Action গ্রুপের বেশির ভাগ লোককে বিশেষত অনভিজ্ঞ nervous লোকদের ambush ও raid এর সময় action-এর সামান্য আগ পর্যন্ত cocking থেকে বিরত রাখবে।

১৮. অসত্য খবর প্রচার করা, পরাজয়ের খবর গোপন করা, বিজয়কে বাড়িয়ে দেখা কখনো চলবে না।

১৯. শত্রুর চলাচল অবস্থায় অগ্রগামী শত্রুদলের প্রথম ব্যক্তিকে হত্যা করার নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে।

২০. হঠাৎ আক্রমণের উদ্যোগ শত্রুর আগে নিজেকে নিতে হবে। শত্রুকে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় একটা নির্দিষ্ট ধরনের action-এ অভ্যস্ত করে নেবার পর বিদ্যুৎগতি ও নির্মমভাবে একই জায়গায় অন্য ধরনের action করতে হবে।

২১. শত্রু যাতে ব্যাপক ও বিপুলভাবে গুলিবর্ষণ করে গোলাগুলি নষ্ট করে এবং অবশেষে নিজের অবস্থান ছেড়ে দেয় তার চেষ্টা করতে হবে। অন্যদিকে, সবসময় গোলাগুলি বাঁচানোর দিকে নিজেদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

২২. স্মরণ রাখতে হবে যে শত্রুকে বিভ্রান্ত না করে বিস্মিত ও বোকা না বানিয়ে তাকে ঘায়েল করা যাবে না। তার জন্য দরকার নিজেদের বিচক্ষণতা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং উদ্ভাবনী শক্তি।

২৩. শত্রু সৈন্য কোন নতুন এলাকায় আসলে তাকে পথ-ঘাট চিনে নেয়ার আগেই আক্রমণ করা বাঞ্ছনীয়।

২৪. কখনো শত্রুর ঘেরাওর মধ্যে পড়বে না।

২৫. লড়াইয়ের কৌশল সব সময়ই নমনীয় ও পরিবর্তনযোগ্য রাখতে হবে। কষ্ট সহিষ্ণুতা, নমনীয়তা বিচক্ষণতা ও গোপনীয়তার নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

২৬. উপরোল্লিখিত সমস্ত নিয়মাবলী সাধারণ নীতি হিসেবেই (guide lines only) দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অবস্থায় গেরিলা নেতা নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনা খাটিয়ে তাহার নেতৃত্বে পূর্ণ দায়িত্ব নিজেই পালন করবেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্য পালনীয় রাজনৈতিক নীতিমালা

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের বুক হইতে পাকিস্তান সরকারের দখলদারি হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া দেশকে মুক্ত করা এবং সাধারণ মানুষের সুখ শান্তির ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের এই বাহিনী গঠিত। বাংলাদেশকে একটা স্বাধীন, সুখী, সমৃদ্ধিশালী, শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের প্রতিজ্ঞা। আমাদের এই বাহিনী জনসাধারণের নিজেদের বাহিনী। এই বাহিনী শুধুমাত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালাইবে না, দেশের জনসাধারণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত করাও ইহার কাজ। এই বাহিনীর প্রত্যেক সৈনিককে নিম্নোক্ত রাজনৈতিক নীতিমালা অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে।

এক। আমাদের লক্ষ্য

মনে রাখিতে হইবে, আমাদের আজিকার সশস্ত্র লড়াইয়ের লক্ষ্য হইল, আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে একটা স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহার সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রকৃত মুক্তি সাধন করা।

দুই। আমাদের শত্রু

- এই সশস্ত্র লড়াইয়ে আমাদের শত্রু হইলঃ পাকিস্তানের সামরিক সরকার ও সামরিক বাহিনী, তাদের এ দেশীয় দালালরা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তান সরকারের সহযোগী অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।
- শ্রেণীগতভাবে আমাদের শত্রু হইল ঃ পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও সেখানকার সামন্ত ভূস্বামীরা এবং এই উভয় শ্রেণীর সহযোগী দালালরা।
- দলগতভাবে আমাদের শত্রু হইল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজাম ইসলাম ও পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।
- মনে রাখিতে হইবে, চীনের নেতারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছে ও আমাদের শত্রুকে সাহায্য করিতেছে। দেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী এখানকার চীনপন্থীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে।

তিন। আমাদের শক্তি

- এই সংগ্রামে আমাদের প্রধান শক্তি হইলঃ বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ, তথা এখানকার শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক সমাজ, ছাত্র, যুবক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, ধনিকশ্রেণী ও জোতদারগণ।
- এই সংগ্রামে প্রধান শক্তি হিসেবে যাহাদের উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে তাহারা হইলেন শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবক ও মেহনতি সাধারণ মানুষ।
- মনে রাখিতে হইবে, জনতার শিবিরে সবচেয়ে দুর্বল অংশ হইল বড় বড় জোতদারগণ। ইহাদের ভূমিকা সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে।

চার। আমাদের মিত্র

- এই সংগ্রামে আমাদের নিকটতম মিত্র হইল পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত জাতিসমূহ ও সেখানকার শোষিত জনগণ। আমাদের একই শত্রুর দ্বারা তাহারাও নিপীড়িত ও শোষিত হইতেছে।
- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী ভারতের জনগণ, গণতান্ত্রিক শক্তি ও সরকার; সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরে দেশসমূহ; ভিয়েতনামসহ বিশ্বের স্বাধীনতা, শান্তি, ও গণতন্ত্র ও প্রগতিকামী জনগণ, তাহাদের দল সংগঠন ও রাষ্ট্রসমূহ আমাদের নির্ভরযোগ্য মিত্র।

পাঁচ। সরকার সম্পর্কে

- বর্তমান বাংলাদেশ সরকারকে আমরা বৈধ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকার হিসেবে স্বীকার করি।

ছয়। আমাদের সহযোগী

- স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ বাহিনী, মুক্তিবাহিনী এবং দেশের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে যাহারা অংশগ্রহণ করিতেছেন তাহাদের সহিত সর্বস্তরে সহযোগিতা করিয়া কাজ করিব।

সাত। জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট সম্পর্কে

- বাংলাদেশকে পরিপূর্ণভাবে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ও

সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী শক্তির সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করা আমাদের নীতি। সর্বক্ষেত্রে নীতির স্বপক্ষে কাজ করিতে হইবে।

– আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ভাসানী গ্রুপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ এবং অন্যান্য সংগ্রামরত শক্তির সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করার জন্য চেষ্টা চালাইতে হইবে।

আট। কতকগুলি বিধি–নিষেধ

নিম্নোক্ত বিধি–নিষেধগুলো বাহিনীর প্রত্যেক যোদ্ধা ও সংগঠককে অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে। জনগণের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতে হইবে। জনসাধারণের উপর কোন প্রকার জুলুম জবরদস্তি ও অন্যায় আচরণ করা চলিবে না।

জনসাধারণের স্বেচ্ছামূলক সাহায্য গ্রহণ করা চলিবে। মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় নারী জাতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম চলিবে না। অবাঙালি জনসাধারণ যাহারা শত্রুর সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় তাহাদিগকে পক্ষে পাওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে। অবাঙালি জনসাধারণকে ঢালাওভাবে শত্রু বিবেচনা করা চলিবে না।

বিভিন্ন পেশা ও স্তরের জনসাধারণের সহিত একত্রে থাকিতে গিয়া যথাসম্ভব তাহাদের কাজকর্মে শরিক হইতে হইবে। কোন প্রকার হুকুমদারি চলিবে না। গ্রাম্য দলাদলির উর্ধ্বে থাকিতে হইবে। কোন যুক্তিতেই ইহাতে জড়িত হওয়া চলিবে না। সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে থাকিতে হইবে। কোন যুক্তিতেই এই ধরনের সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না, কাহারও ধর্ম বিশ্বাস ও রীতি-নীতিকে ক্ষুণ্ন করা চলিবে না। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দিকে সব সময় নজর রাখিতে হইবে। এ ব্যাপারে অমনোযোগী হইলে চলিবে না।

সংযোজনী-৬

১৯৭২ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট

২৫শে মার্চ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে। ঐ দিন হইতেই গণতন্ত্র, বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে পরিণত হয় এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের রূপ নেয়।

প্রথম অবস্থায় সংগ্রাম ছিল প্রধানত স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু, তবুও বিভিন্ন জেলায় শত্রু পক্ষকে সাময়িকভাবে পরাভূত করা সম্ভব হয়। উক্ত সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল প্রধানত ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের শক্তির দ্বারা। উক্ত সংগ্রামে জনসাধারণও কোন কোন জেলায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে, শক্তিশালী পাক বাহিনীর আক্রমণের মুখে উক্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাময়িক পশ্চাৎপসরণ। সারা বাংলাদেশে শুরু হয় ব্যাপক হত্যা, অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা।

ব্যাপক হত্যা, অত্যাচার ও ধ্বংসলীলার ফলে প্রায় এক কোটি লোক দেশ ত্যাগ করিতে এবং ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। প্রধানত পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসামের সীমান্ত অঞ্চলে শরণার্থীরা আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত সরকার ও ভারতের জনগণের উপর শরণার্থীদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করা একটা কঠিন সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। নানা প্রকার অসুবিধা, সমস্যা এবং বিরাট অর্থনৈতিক চাপ সত্ত্বেও ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ শরণার্থীদের নানা প্রকার সাহায্য করে এবং ত্যাগ স্বীকার করে।

১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ভারতের জনগণ, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যে আগাইয়া আসে। ভারত সরকারের সাহায্যে মুক্তিবাহিনী একটি সংগঠিত বাহিনী হিসেবে গড়িয়া উঠে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ অনেকটা সংগঠিতভাবে অগ্রসর হয়।
হাজার হাজার যুবক মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং সামরিক ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আগাইয়া আসে এবং বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে। সংগ্রামের এই

পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে সংগঠিত মুক্তি বাহিনী গড়িয়া উঠে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে ও পরিচালনাধীনে বিভিন্ন গেরিলা বাহিনী গড়িয়া উঠে এবং কোন কোন এলাকায় স্থানীয়ভাবেও গেরিলা বাহিনী গড়িয়া উঠে। বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তি বাহিনী ও গেরিলা বাহিনী ছড়াইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানে গেরিলাদের তৎপরতা শুরু হয় এবং তাহারা অনবরত শত্রু পক্ষকে নাজেহাল করিতে থাকে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুক্তিবাহিনী ও গেরিলারা যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই তাহারা জনগণ হইতে খাদ্য, আশ্রয় ও অন্যান্য সকল প্রকার সাহায্য পাইয়াছেন। সমূহ ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদের সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিয়াও জনগণ মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা বাহিনীকে সর্ব প্রকার সাহায্য করিয়াছেন। জনগণের এরূপ ব্যাপক সাহায্য ও সমর্থনের ফলে মুক্তিযোদ্ধরা শত্রুর বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইয়াছে। মুষ্টিমেয় দালাল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ছাড়া বাংলাদেশের সমগ্র জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহাই ছিল আমাদের মুক্তিসংগ্রামের শক্তি ও সাফল্যের মূল বুনিয়াদ।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমস্যাকে সামনে রাখিয়া এবং প্রধানত মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনেই সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। সোভিয়েত সরকার প্রথম হইতেই পাকিস্তানের সামরিক জান্তার গণ-হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলে। ইহা ছাড়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত এই উভয় রাষ্ট্রই বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়িয়া তোলে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের পর বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যৌথ প্রচেষ্টা কার্যকরীভাবে শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে দৃঢ়তার সহিত আগাইয়া আসার ফলে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং সকল দেশের প্রগতিশীল শক্তি, সাহায্য ও সমর্থন করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া আসে।

এ দিকে বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে দাঁড়ায় ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশ; আর অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সামরিকজান্তার পক্ষে পড়ায় মার্কিন সম্রাজ্যবাদী শক্তি ও চীনা নেতৃত্ব। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে তাহাদের নয়া-উপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। আর চীনের মাওবাদী নেতৃত্বে মার্কসবাদ লেনিনবাদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পূর্ব হইতেই বৃহৎ জাত্যাভিমান ও অন্ধ সোভিয়েত বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করতেছিল। ভারতের বিরুদ্ধেও চীনের নেতৃত্বে অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল শত্রুতার নীতি। এই সব নীতির পরিণতিতে চীনের নেতৃত্ব পূর্ব হইতেই পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গের সাথে মিত্রতা গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের শাসকবর্গকে সর্বপ্রকার সাহায্য করে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপর্যস্ত করার জন্য তাহারা মার্কিন সাম্রাজবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মিলাইতেও দ্বিধা করে নাই।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও চীনের নেতৃত্ব পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাইয়া বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু, উক্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দেয় সোভিয়েত ও ভারতে যৌথ রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনা। জাতিসংঘের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও চীন নেতৃত্বে বাংলাদেশের হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো প্রদানের ফলে। মার্কিন সপ্তম নৌবহরের হস্তক্ষেপ করার ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টাও সোভিয়েতের পাল্টা প্রস্তুতি ও হুমকির ফলে ব্যর্থ হইয়া যায়। ফলে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে ও পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম দ্রুত সাফল্যলাভ করার মূল কারণগুলি হইল:

১. স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বাংলাদেশের জনগণের দৃঢ় ঐক্য।
২. মুক্তিযোদ্ধাদের মরণপণ সংগ্রাম।
৩. মুক্তি সংগ্রামে ভারতের জনগণ, গণতান্ত্রিক শক্তিও ভারত সরকারের সাহায্য ও দৃঢ় সমর্থন এবং মিত্র বাহিনীরূপে ভারতীয় বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ।
৪. মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের দৃঢ় ও কার্যকর সাহায্য ও সমর্থন।

স্বাধীনতা ও সংগ্রামের মূল্যায়ন সম্পর্কে

কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে মূল্যায়ন করিয়াছিল, সংগামের মধ্য দিয়া তাহার মূল বিষয়গুলো সঠিক বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। সংগ্রামের চরিত্র বলিতে গিয়া মূল্যায়নে বলা হইয়াছিল যে, "বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ ধারণের উপাদান বর্তমানে আছে।"

পাটির উক্ত বিশ্লেষণ সঠিক বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে আঘাত করে এবং সেই জন্যই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে সরাসরিভাবে সাহায্য করে এবং হস্তক্ষেপ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। এমনকি সপ্তম নৌবহর পাঠাইতেও দ্বিধা করে নাই। ইহার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে।

সংগ্রামে শত্রু মিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে পার্টির বিশ্লেষণ মূলত সঠিক ছিল। মূল্যায়নে শত্রু হিসেবে যাহাদের চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহারা হইল "সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্ত ভূস্বামীদের শাসকগোষ্ঠীর এবং তাহাদের এই দেশীয় দালালরা।"

এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ যে শত্রু তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। তবে দলিলের পূর্বের বিশ্লেষণ হইতে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেরই অংশ এবং সাম্রাজ্যবাদকে শত্রু হিসেবে গণ্য করা হইয়াছে।

মূল্যায়নে বলা হইয়াছে, "এই সংগ্রামের মিত্র হইল মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়া, জোতাদারসহ বাংলাদেশের সমস্ত জনগণ। এদের মধ্যে দুর্বলতম অংশ হইতে পারে বড় বড় সামন্তবাদী ভূস্বামীরা।" এই মূল্যায়ন সঠিক ছিল। জোতদাররা সাধারণভাবে শ্রেণী হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে নাই। তবে কিছু কিছু বড় জোতদার বিরোধিতা করিয়াছে।

মূল্যায়নে সঠিকভাবেই বলা হইয়াছিল যে, "বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই সংগ্রামে বিশ্বের স্বাধীনতা, শান্তি, গণতন্ত্রকামী ও প্রগতিশীল জনগণ এবং দুনিয়ায় সমস্ত গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও সামজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সংগ্রামের সফলতার জন্য তাহাদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সমর্থন অবশ্য প্রয়োজন। এই সংগ্রামে ভারতের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি, জনগণ ও সরকারের সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।"

স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়া ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান মিত্র। আজিকার দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সাহায্য ছাড়া কোন মুক্তিযুদ্ধই যে সাফল্য অর্জন করিতে পারে না, তাহাও আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

মূল্যায়নে বলা হইয়াছিল যে, "এই সংগ্রামের সফলতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি ও গণতন্ত্রের শক্তিসমূহকে শক্তিশালী করিবে।" "পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করিবে।" বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অবসান হইবে এবং ভারতের সহিত বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক হইবে। "এবং বাংলাদেশের সংগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সম্পর্ক উন্নত হওয়ার সম্ভবনা আছে।"

তারপর বলা হইয়াছিল যে, "যদি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং প্রগতিশীল শক্তিসমূহ এই সংগ্রামে সঠিক ভূমিকা পালন করিতে পারেন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এই সংগ্রামে যথোপযুক্ত সাহায্য ও সমর্থন করেন, তাহা হইলে উপরোক্ত প্রতিপাদ্যগুলো কার্যকরী হইবে এবং বাংলাদেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রগতির পথও প্রশস্ত হইবে।"

উপরোক্ত মূল্যায়ন সঠিক বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। বাংলাদেশের 'কমিউনিস্ট পার্টি' এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের দেশের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে সঠিক ভূমিকা পালন করার ফলে এই উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি শক্তিশালী হইয়াছে, বাংলাদেশের সহিত ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের

সম্পর্ক উন্নত হইয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ইহার ফলে জাতীয় গণতন্ত্রের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ হইয়াছে। তবে এখনও সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র, দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, মাওবাদীদের কার্যকলাপ ও সাম্প্রদায়িত ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

মূল্যায়নে "সংগ্রামের সবলতা ও দুর্বলতা" এবং সংগ্রামের নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহাও সংগ্রামের ভিতর দিয়া সঠিক বলিয়াই প্রমানিত হইয়াছে। তবে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের প্রশ্ন সম্পর্কে মূল্যায়নে বলা হইয়াছিল যে, "এই সংগ্রামের দ্রুত ও সুনিশ্চিত বিজয়ের একটি অপরিহার্য শর্ত হইল আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর) সহ সকল সংগ্রামী শক্তির সমবায়ে সম্মিলিত জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করা।"

উক্ত অপরিহার্য শর্তটি পরিপূর্ণভাবে পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ব প্রকার সাহায্য ও সমর্থন। উক্ত কারণের জন্যই ফ্রন্ট গঠন না হওয়া সত্ত্বে আমরা দ্রুত স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

তবে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠিত না হইলেও বিভিন্ন সংগ্রামী শক্তির মধ্যে কিছুটা সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছিল এবং বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়া একটি পরামর্শ দাতা কমিটিও গঠিত হইয়াছিল।

পার্টি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের জন্য সর্বাবস্থায় ও সকল স্তরে প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিয়াছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামে নিজ উদ্বেগ নিয়া উদ্যোগ অংশগ্রহণ করিয়াছে এবং যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধ কাজের ও সংগ্রামের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। তাই, ইহার সঠিক মূল্যায়ন একান্তভাবে প্রয়োজন।

ভারত সরকারের মত একটি বুর্জোয়া সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এরূপ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার কারণগুলি কি?

মৌলিক কারণগুলো হইল নিম্নরূপ :

১. সাম্প্রদায়িত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অস্তিত্ব এবং ভারতের প্রতি পাকিস্তান সরকারের বৈরী নীতি সবসময়েই ভারতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ধর্মনিরপক্ষেতা ও প্রগতির পথে একটা প্রবল বাধা হিসেবে ছিল।

২. পাকিস্তান সরকারের সহিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মিত্রতা, পাকিস্তানকে সামরিক ঘাঁটিরূপে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবহার করার প্রচেষ্টা ও অস্ত্রপ্রদান এবং পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাইয়া ভারতের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রভৃতি উপমহাদেশের শান্তি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতিকেই ব্যাহত করিতেছিল।

৩. চীনের মাওবাদী নেতৃত্বের সহিত পাকিস্তান সরকারের ভারত-বিরোধী মিত্রতা পাক ভারত যুদ্ধের আশঙ্কাকেও বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং ইহার ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা তথা উন্নয়নের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল।

৪. প্রায় এক কোটি শরণার্থীর বোঝা ভারতের অর্থনীতির উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করে এবং বিরাট সমস্যা হিসেবে দাঁড়ায়।

৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হইলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের মিত্র রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে এই উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে এবং দুই দেশের উন্নয়নের পথেই উহা সহায়ক হইবে।

উক্ত কারণগুলোর জন্যই ভারতের সরকার ও ভারতের জনগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যগুলি হইল:-

১. সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ও সমর্থনের জন্যই ভারত সরাসরিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মিত্র শক্তির ভূমিকা পালন করিতে দৃঢ়তার সহিত আগাইয়া আসিতে সমর্থ হয় এবং ইহার ফলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এত দ্রুত সাফল্য অর্জন করিতে পারে।

২. সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ও ভারতের উন্নয়নের পক্ষে একটি বিশেষ পদক্ষেপ। এই চুক্তি একদিকে যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, তেমনি অন্যদিকে ভারতে সামগ্রিক উন্নয়নের পথেও বিশেষ সহায়ক হয়।

৩. সোভিয়েত ইউনিয়ন তাহার আন্তর্জাতিক কর্তব্যবোধ হতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়াল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যকারী ভূমিকার ফলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে যে, সাম্রাজ্যবাদী ও মাওবাদী হস্তক্ষেপের চক্রান্ত ছিল তাহা ব্যর্থ হয়, ভারত ও বাংলাদেশের সোভিয়েত ইউনিয়ন বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হয় এবং ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মৈত্রী গড়িয়া উঠার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য বাংলাদেশের জনগণের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং বর্তমানে সোভিয়েত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়া সমাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের আকর্ষণ বৃদ্ধির সুযোগ হইয়াছে।

বর্তমান পরিস্থিতি

দেশের স্বাধীনতার পর দেশ ও জনগণের অবস্থা নিম্নরূপ:–

জনগণের অর্থনৈতিক সঙ্কট খুবই তীব্র ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা অচল অবস্থায় আছে; আমদানি রপ্তানি এখনও ভালভাবে চালু হয় নাই। বেশির ভালো মিল ও কারখানা মেশিন পার্টস এবং অবাধ ও কাঁচামালের অভাবের দরুন অচল হইয়া আছে। ফলে অধিকাংশ মজুর ও কর্মচারী বেকার অবস্থায় আছে। কৃষকদের অবস্থাও খুবই শোচনীয়। কৃষকের হাল গরুর সমস্যা খুবই প্রবল। ফসলহানির জন্য খাদ্য সমস্যাও খুব প্রবল। শরণার্থী ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অবস্থা আর ও শোচনীয়। জিনিসপত্রের দর মারাত্মকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। ফলে মুষ্টিমেয় ধনী ছাড়া সকল স্তরের জনসাধারণের আর্থিক সঙ্কট তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন সমস্যা

(১) শান্তি শৃঙ্খলা

দেশে শান্তি শৃঙ্খলা এখনও পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে অবস্থা পূর্বের

তুলনায় অনেক উন্নত হইয়াছে। শেখ মুজিবুর রহমান দেশে আসার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তি বাহিনী অনেক স্থানে প্রশাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়া নেয়। মুক্তি বাহিনীর মধ্যে যে সব খারাপ ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোক আছে, তাহারা অনেক ধনী লোকের উপর হামলা করিয়া টাকা-পয়সা আদায় ইত্যাদি করিয়াছে। টাকা-পয়সা আদায় করিয়া অনেক শত্রু পক্ষের লোককেও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণ তাহাদের কার্যকলাপে খুবই ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল। শেখ মুজিব আসার পর পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি আরও খারাপ। কারণ, রাজনৈতিক দল ছাড়াও অনেক খারাপ লোকের হাতে অস্ত্র গিয়াছে। তাই, গ্রামাঞ্চলে জোর-জুলুম ও খুন ইত্যাদি শহরের তুলনায় বেশি হইতেছে। বদর পার্টি ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নেতাদের মধ্যে যাহারা গ্রেফতার হয় নাই, তাহারা গোপনে থাকিয়া গোপন কার্যকলাপ ও সংগঠন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা মুক্তিবাহিনী সাজিয়া প্রগতিশীল শক্তি ও কমিউনিস্টদের উপর হামলা করার ষড়যন্ত্র করিতেছে। বদর বাহিনী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে প্রচুর অস্ত্র আছে। ইহাদের ধরার ব্যবস্থা এখনও ভালোভাবে হয় নাই। জামাত, মুসলিম লীগ, রাজাকার বাহিনীর নেতাদের একটা অংশ সমাজে আবার নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা আওয়ামী লীগ এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের অধিকার ব্যবস্থা করিতেছে। তাহারা কৌশলে ভারত বিরোধী প্রচার চালাইতেছে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। এই সম্পর্কে জনগণকে ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সজাগ করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিশেষ প্রয়োজনীতা রহিয়াছে। অবাঙালিদের মধ্যে যাহারা প্রতিক্রিয়াশীল, তাহাদের হাতেও অনেক অস্ত্র রহিয়াছে। ইহাও বাহির করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা এখনও গ্রহণ করা হয় নাই। পূর্বের তুলনায় শান্তি শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে। শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার মত অবস্থা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) পুনর্বাসন সমস্যা

ভারতে যাহারা শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেরই বাড়িঘর ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে, জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং জমিজমা বেহাত

হইয়া গিয়াছে। যাহারা এখানে ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকের বাড়িঘর পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে যে সকল শরণার্থী দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই এখন পর্যন্ত আশ্রয় শিবিরে বাস করিতেছেন। সেখানে চূড়ান্ত অব্যবস্থা চলিতেছে। আশ্রয় শিবিরে এত শরণার্থীদের থাকার মত কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং খাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। রেশন যেটুকু বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাও দেওয়া হয় না। আশ্রয় শিবির হইতে চলিয়া যাওয়ার জন্য শরণার্থীদের চাপ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু, তাহাদের ধ্বংস প্রাপ্ত বাড়িঘরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় সাহায্য বা ঘরবাড়ি তৈরির মত কোন প্রকার ব্যবস্থা হয় নাই। শরণার্থী ছাড়া এখানে যাহাদের বাড়িঘর ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের পুনর্বাসনেরও কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত হয় নাই।

অতএব, শরণার্থীদের ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা একটা বিরাট সমস্যা। মিত্র দেশগুলোর সাহায্য ছাড়া এই সমস্যার সমাধান করা খুবই কঠিন। এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত সমস্যা হইল বেহাত জমিজমা জমির মালিককে ফিরাইয়া দেওয়ার সমস্যা এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়ার সমস্যা। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া কিছু কিছু সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিরও প্রচেষ্টা চলিতেছে। অতএব, এই সমস্যাটি খুবই জটিল সমস্যা এই সমস্যা সমাধানের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

(৩) কল কারখানা চালু করার সমস্যা

কোন কোন কলকারখানার মেশিন চুরি হইয়া গিয়াছে, কোনটার পার্টস নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন মিলের যন্ত্রপাতি ঠিক থাকা সত্ত্বে কাঁচামালের অভাবে মিল চালু হইতে পারিতেছে না। অধিকাংশ কলকারখানা যন্ত্রপাতির পার্টসের অভাব ও কাঁচামালের অভাবহেতু চালু হইতে পারিতেছে না।

এছাড়া, যেসব মিল ও কারখানার মালিক অ-বাঙালি ছিল এবং যাহারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই সব মিল চালু করার জন্য সরকার (Administratior) পরিচালক নিয়োগ করিয়াছেন।

এই রকম রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে যে, কোন কোন অসাধু Administratior নাকি মিল চালু না করিয়া মিলের কাঁচামাল বা অনান্য জিনিসপত্র বিক্রি করিয়া ফেলিতেছেন, অনেক পাটজাত দ্রব্য মিল কারখানার গুদামে এখনও অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া আছে। মিল কারখানাগুলো চালু না হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর তীব্র সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে। তাই, অবিলম্বে মিল কারখানা চালু কারার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতির অংশ এবং কাঁচামাল আমাদানির দ্রুত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং মিল কারখানা চালু করা ও পরিচালনার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়া কারখানা পরিচালক কমিটি করা দরকার।

ইতিমধ্যে সরকার যে সব মিল কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সব মিলে যে সকল পরিচালনা কমিটি (Management Committee) গঠন করা হইতেছে, তাহাতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি বা লোকজন নেওয়া হইতেছে। ঐ সব প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থান্বেষী এবং তাহারা ঐ সব মিল কারখানা নিজেদের মালিকানায় নিয়া আসার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

বাঙালি মিল মালিকদের মধ্যে যাহারা শত্রুপক্ষে ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আওয়ামী লীগের কোন কোন অংশের সহিত সমঝোতা করিয়া কেবল নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই করিতেছে না, তাহারা নিজদের মিলগুলো নিজদের হাতে নিয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিতেছে।

(৪) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা

দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক আকারে বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছে। কোন কোন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দ্বিগুণ বা তিনগুণ দরেও বিক্রি হইতেছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ও মিল কারখানাগুলি ঠিকমত চালু না হওয়ার ফলে বাজারে কোন কোন জিনিসের অভাব সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অসাধু ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে।

যে সব শিল্পজাত বা গুদামজাত মাল সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে গিয়াছে সেই সব মালের পারমিট অনেক ক্ষেত্রে অব্যবসায়ী রাজনৈতিক কর্মীদের দেওয়া হইতেছে। তাহাদের নিকট হইতে ব্যবসায়ীরা পারমিট কিনিয়া অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য অস্বাভাবিকভাবে ঐ সব দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতেছে। ব্যবসায়ীরা কোন

কোন ক্ষেত্রে মাল মজুত করিয়াও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিতেছে। যাতায়াত ব্যবস্থা ঠিক মত চালু না হওয়ার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য অবিলম্বে ভারতের সহিত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করা দরকার এবং মজুত মালও উদ্ধার করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার।

যাতায়াত ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। অতএব, যাতায়াত ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া রেল চালু করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

(৫) যাতায়াত সমস্যা

ছোট বড় বহু সেতু, বিশেষ করিয়া বড় বড় সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সমগ্রভাবেই বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। রেল ও রোড যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্ণভাবে চালু হওয়া সেতুগুলো মেরামতের উপর নির্ভর করিতেছে। তাই যাতায়াত ব্যবস্থা পূর্ণভাবে চালু করার বেশ কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় প্লেন ও স্টিমাররে অভাবে প্লেন সার্ভিস চালু করা সম্ভব হইতেছে না এবং স্টিমার সার্ভিসও পূর্ণভাবে চালু করা যাইতেছে না। যাতায়াত ব্যবস্থা পূর্ণভাবে চালু না হওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সর্ব প্রকার কাজই দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। তাই, যাতায়াত ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি মিত্র দেশগুলির সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত জরুরি হইয়া পড়িয়াছে।

(৬) বাংলাদেশে অবস্থানকারী অবাঙালি ও পাকিস্তানে অবস্থানকারী বাঙালিদের সমস্যা

অবাঙালি জনসাধারণ সাধারণভাবে পূর্বেও শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতা করিয়াছে এবং মুক্তি সংগ্রামের সময়েও তাহারা সাধারণভাবে পাক বাহিনীকে সমর্থন ও সাহায্য করিয়াছে। অন্যদিকে বাঙালিদের মধ্যে একটা অবাঙালি বিরোধী মনোবাব বিভিন্ন কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বাধীনতার পর অবাঙালি জনগণের অবস্থা ও সমস্যা এক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

অবাঙালি জনসাধারণের মধ্যে একটা অংশ ধনী এবং ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য একটা অংশ খুবই গরীব এবং শ্রমজীবী। রেলে এবং চটকলে অনেক অবাঙালি মজুর কাজ করিত। তাহারা আজ সকলেই বেকার। অবাঙালিদের মধ্যে একটা অংশ খুবই প্রতিক্রিয়াশীল এবং এখনও তাহারা অস্ত্র লুকাইয়া রাখিতেছে এবং নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে। ফলে কোন কোন স্থানে বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষ বাধিয়া যাওয়ার উপক্রম হইতেছে। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থাও এখনও হয় নাই।

বাংলাদেশে প্রায় ১২/১৩ লক্ষ অবাঙালি আছেন; আর পাকিস্তানে প্রায় ৪ লক্ষ বাঙালি আছে। তাহাদের Exchange করিয়া নেওয়ার চিন্তা সরকারি মহলের আছে। এই সমাধানও কঠিন।

আমাদের মতে পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি জনসাধারণকে বাংলাদেশে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করা দরকার এবং অবাঙালিদের মধ্যে যাহারা পাকিস্তানে যাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার, আর যাহারা বাংলাদেশে থাকিবে তাহাদের থাকার অধিকার সুযোগ দেওয়া দরকার। তবে যদি অবাঙালিদের ব্যাপকভাবে পাকিস্তানে বা অন্যত্র সরাইয়া নেওয়ার ব্যবস্থা হয়, আমরা তাহাতে আপত্তি করিব না।

সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পূর্ব হইতেই বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এবং দেশপ্রেমিক দলগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও সংঘর্ষ বাধাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও তাহারা দেশপ্রেমিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য গঠনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে এবং সংঘর্ষ বাধানোর জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে বদর পার্টিও গোপনে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ চালাইয়া যাইতেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাহার এজেন্টরা এখন খুবই সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে এবং বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন সূত্রে সাহায্যের নামে আবার তাহাদের নয়া-ঔপনিবেশিক জাল বিস্তার করার জন্য প্রচেষ্টা চালাইতেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই রূপ প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ করা একান্ত জরুরি হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চীনা নেতৃত্বের কার্যাবলী

চীনা নেতৃত্ব প্রথম হইতেই বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। বর্তমানেও চীনা নেতৃত্ব স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া চলিতেছে এবং বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত আছে। চীনা নেতৃত্ব বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় পিকিংপন্থীদের সহায়তায় তাহাদের চক্রান্ত চালাইয়া যাইতেছে ও যাইবে। এই সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ার করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের নীতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত নীতি হইল গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। কিন্তু সরকারের ভূমিনীতি, শিল্প-বাণিজ্যনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি এখনও ঘোষিত হয় নাই। বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে জোটনিরপেক্ষতা ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, "সকলের সহিত বন্ধুর কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই।" তবে, কার্যক্ষেত্রে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত বন্ধুত্বের উপরই সরকার কর্তৃক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে যেসব অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সন্দেহভাজন লোক রহিয়াছেন ইহাতে জনগণের মনে, বিশেষ করিয়া বুদ্ধিজীবী মহলে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। তবে, শেখ মুজিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঐ সব নিয়োগ নাকি অস্থায়ী।

যা হোক, স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রগতির পথে গড়িয়া তোলার জন্য সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যেরূপ নতুনভাবে ঢালিয়া সাজানো উচিত ছিল সেভাবে এখনও কিছু করা হয় নাই। প্রশাসনিক ব্যবস্থাই সর্বত্র ভাল করিয়া চালু হয় নাই। ইহার ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়া আসে নাই। বাস্তুহারাদের

পুনর্বাসন, বন্ধ কারখানাগুলি চালু করা, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য কমানো, মজুত মাল উদ্ধার করা প্রভৃতি কাজ ঠিকমত হইতেছে না।

সরকার জাতীয় মিলিশিয়া গঠন ও অস্ত্র জমা নেওয়ার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা মূলত সঠিক পদক্ষেপ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু মিলিশিয়া বোর্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি বা মহকুমা কমিটি এখনও চালু করা হইতেছে না। মিলিশিয়াকে কি কাজে ব্যবহার করা হইবে বা দেশ গড়ার কাজে কিভাবে লাগানো হইবে, তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। উল্লেখযোগ্য যে, সরকার কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভার পরামর্শতদাতা কমিটিও কাজ করিতেছে না।

দেশের পুনর্গঠন ও গণজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সরকারের উচিত ছিল ঐ সকল কাজে সকল দেশপ্রেমিক দলের সহযোগিতা গ্রহণ করা। কিন্তু আওয়ামী লীগের ভিতরে একটা একদলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থাকার ফলে সে কাজ হইতেছে না। ফলে সরকারের ঘোষিত নীতির বিরোধী কাজকর্ম হইতেছে এবং পরামর্শদাতা কমিটি বা মিলিশিয়া বোর্ডের কাজকর্মও হইতেছে না।

প্রকৃতপক্ষে দেশের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সরকার এখনও কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়া অগ্রসর হইতে পারিতছেন না। ফলে গণজীবনের সমস্যাগুলি তীব্র আকারেই থাকিয়া যাইতেছে।

সরকার সম্পর্কে আমাদের নীতি

সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নীতি আমরা সমর্থন করি এবং এই নীতি বাস্তবায়নের সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, আমরা পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করিব।

পূর্বে আমাদের কর্মনীতি ছিল, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা পকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ত ভূস্বামীদের সরকারকে উচ্ছেদ করা এবং একটি সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাংলাদেশে স্বাধীন হইয়াছে,

প্রতিক্রিয়াশীল সরকার উচ্ছেদ হইয়াছে এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার হইল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে পরিচালিত একটি দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক সরকার। তবে এই দলের মধ্যে দোদুল্যমান শ্রেণী রহিয়াছে, বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদের একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই সরকারের প্রগতিশীল ভূমিকা রহিয়াছে। তাই সরকার ও আওয়ামী লীগের প্রতি সমস্ত প্রকার নেতিবাচক ও সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করিয়া দেশকে প্রগতিশীল পথে পুনর্গঠন ও গণজীবনের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য সরকার ও আওয়ামী লীগের সহিত সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

ইহা সত্য যে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ এখন পর্যন্ত একা চলা সরকার ও আওয়ামী লীগের ঐক্য বিরোধী নীতি দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। আমাদের সহযোগিতার নীতির দ্বারাই আওয়ামী লীগকে সহযোগিতার পথে টানিয়া আনা সম্ভব হইবে ।

দেশ গঠনের ক্ষেত্রে যে বিরাট সমস্যাবলী উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই দেশ গড়ার জন্য বিভিন্ন দেশপ্রেমিক দল ও শক্তি নিয়া একটা জাতীয় সরকার গঠন করা বাঞ্ছনীয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে উহা কার্যকরী হইতেছে না। তবে, দেশ পুনর্গঠন, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রভৃতি কাজে সরকারের সহিত বিভিন্ন দেশপ্রেমিক দলের কার্যকরী সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই, মন্ত্রিসভার উপদেষ্টা কমিটিকে যথাযথভাবে কার্যকরী করা এবং দেশ পুনর্গঠনের সর্ববিধ কাজে সর্বস্তরে অনুরূপভাবে কমিটি গঠনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।

সরকার, সরকারি দলের সাথে অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির সহযোগিতা যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার জন্য জনগণের ভিতর আমরা যেমন প্রচার চালাইব, তেমিন উহার একটি বাস্তবপন্থা হিসেবে মন্ত্রিসভার উপদেষ্টা কমিটি, মিলিশিয়া বোর্ড প্রভৃতিকে সক্রিয় করার জন্য প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। অন্যদিকে, দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে যে সকল দুষ্কৃতকারী বা অন্যান্য ব্যক্তিরা যে সব অনাচারমূলক ও জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করিতেছে, তাহার প্রতি সরকারের

জন্য একদিকে উপযুক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনা এবং অন্যদিকে গণজমায়েত করার নীতি আমাদের একই সংগে অপসারণ করিয়া যাইতে হইবে। সরকার ও আওয়ামী লীগের কোন নীতি বিচ্যুতি ঘটিলে বা কোন কাজে জনস্বার্থের বিরোধী হইলে উহার প্রতিকারের জন্য বন্ধুসুলভ সমালোচনা করিতে হইবে।

গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য এখন আমরা ভূমি সংস্কার, শিল্প, সংবিধান রচনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সব কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, তাহা আমরা সরকার ও জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিব। সরকার, যাহাতে তাহার ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পথে অগ্রসর হয়, তাহার জন্য আমরা চেষ্টা করিয়া যাইব। দেশকে প্রগতির পথে গড়িয়া তোলার জন্য সরকারি প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। দেশ গড়ার জন্য আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও দেশপ্রেমিক দল ও সংস্থার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আমাদের পার্টি এই ঐক্য গড়িয়া তোলার জন্য সব সময় চেষ্টা করিয়া আসিতেছে এবং এখনও সেই প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। দেশ গড়ার জন্য সকল দেশপ্রেমিক দল ঐক্যবদ্ধ হও ইহাই হইল বর্তমানে আমাদের একটি প্রধান রণধ্বনি। কিন্তু এই পথে কতগুলো বাধাও রহিয়াছে। বিভিন্ন ঐক্য বিরোধী শক্তি, আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাইয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও বিরোধ কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ হইলে চলিবে না। মনে রাখা দরকার যে, বিদেশী শত্রুরা গণতান্ত্রিক শিবিরে ফাটল ধরানোর জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছে। তাই বিভিন্ন ঐক্য বিরোধী শক্তির প্ররোচনাতে উত্তেজিত হইয়া আমরা যেন শত্রুর চক্রান্তের ফাঁদে পা না দেই। দেশ গড়ার জন্য সকল গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তির একতার জন্য আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ শক্তির মূল আঘাত পরিচালিত হইবে বাংলাদেশের জনগণের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা গড়ার জন্য আমরা যে কর্মসূচি উপস্থিত করিতে চাই, তাহা হইলঃ

১. দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনা, উহা বজায় রাখা।
২. বাস্তুহারা ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন।
৩. যোগাযোগের ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
৪. নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের সরবরাহ এবং দ্রব্যমূল্য কমানো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

৫. যে সব শিল্প কারখানা মেশিন, মেশিন পার্টস ও কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হইয়া আছে তাহা চালু করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

৬. ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার বর্তমানে জমির সিলিং পরিবার প্রতি ৫০ বিঘা নির্ধারণ এবং উদ্বৃত্ত জমি গরীব ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ। আধিভাগির স্থলে তে-ভাগার প্রবর্তন এবং বর্গাচাষীর বর্গাজমির উপর বর্গাস্বত্ব কায়েম ক্ষেতমজুরদের বাঁচার মত নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

৭. অ-পুঁজিবাদী পথে দেশের দ্রুত শিল্পায়ন। সে জন্য রাষ্ট্রয়াত্ত খাতে মূল ও ভারী শিল্প গঠন। ব্যাঙ্ক, বীমা, পাট ব্যবসা, আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য জাতীয়করণ। পুঁজিপতিদের মুনাফা নিয়ন্ত্রণ। শিল্প-কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ, শ্রমিকদের বাঁচার মত নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ এবং চাকরির নিশ্চয়তা বিধান প্রভৃতি।

৮. বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ভারত-বাংলাদেশে যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সোভিয়েত প্রভৃতি দেশে সাহায্য গ্রহণ।

৯. শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং দেশে গণতান্ত্রিকও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার।

১০. স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শান্তিবাদী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক দৃঢ় করা। সাম্রাজ্যবাদী নয়া- ঔপনিবেশিক শোষনের পথ রুদ্ধ করা।

উপরোক্ত কর্মসূচি বিশেষভাবে জনগণের সামনে ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং সরকারের নিকটও উপস্থিত করিতে হইবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দেশী ও বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইবে এবং সংগ্রাম জয়যুক্ত করার জন্য সরকারসহ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির একতা গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন।

গৃহীতঃ ৪/২/৭২
প্রচারিতঃ ৯/৩/৭২

সংযোজনী-৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা, ১৯৭২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সমগ্র জনসাধারণ ও সরকারের পক্ষ হইতে মুক্তিবাহিনীর (নিয়মিত ও গণবাহিনী) সকল সদস্যকে গভীর কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সংগ্রামী শক্তিগুলোর সদস্যবর্গ সম্মিলিত ও এককভাবে যে দেশপ্রেম, সাহস ও তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। আমাদের বীর মুক্তি যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং মুক্তিযুদ্ধে যাহারা লড়াই করিয়াছেন তাহাদের রক্ত বৃথা যায় নাই।

স্বাধীনতার সংগ্রাম জয়যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এক্ষণে তদপেক্ষা গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদিগকে এখন দেশের পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থনীতিকে দ্রুততার সহিত পুনর্গঠিত করিলে এবং স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনিলেই কেবল চলিবে না, জাতির ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অবিলম্বে দেশ গঠনের নবযুগের সূত্রপাত করিতে হইবে। আমাদিগকে এখনই গণতন্ত্র, আইনের শাসন, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিতে হইবে। ইহা একটি দুরূহ কার্য। যে দেশপ্রেম, আন্তরিকতা, উৎসর্গ, কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ আমরা সকলেই বিশেষ করিয়া মুক্তিযোদ্ধারা, মুক্তিযুদ্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মাধ্যমেই কেবল ইহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

কাজেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নতুন সমাজ গঠনকল্পে মুক্তিবাহিনীর সকল সদস্যকে তাহাদের শক্তি ও প্রয়াসকে সঠিক খাতে প্রয়োগের আবেদন জানাইতেছেন। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সরকার অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করিবেন:

দেশের স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণের জন্য আমাদের নিয়মিত সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রয়োজন আছে। আমাদের যে সমস্ত অফিসার এবং জোয়ানরা মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীরূপে অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে।

নিয়মিত ব্যাটালিয়নের জন্য আমাদের আরও অফিসার ও জোয়ানদের প্রয়োজন রহিয়াছে। গণবাহিনীর মধ্যেই জনশক্তির এক উত্তম উৎস নিহিত রহিয়াছে। তাহারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছেন। তথাপি তাহাদের আনুষ্ঠানিক ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন আছে। গণবাহিনী হইতে অফিসার ও জোয়ান নিয়োগের ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নতুন অফিসার ক্যাডার এবং অন্যদের ট্রেনিং দিবার জন্য অচিরেই জাতীয় সিলেকশন বোর্ডসমূহ গঠন করা হইবে। মুক্তি সংগ্রামের বীর সেনানীরা বাংলাদেশের নবগঠিত স্থলবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীতে নেতৃত্ব প্রদান করিবেন বলিয়া সরকার আন্তরিকতার সহিত আশা পোষণ করেন।

নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আশু প্রয়োজন। শান্তি ও শৃঙ্খলা ছাড়া আমরা একটা নতুন সমাজ পুনর্গঠন করিতে পারি না। আমরা গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই সংগ্রাম করিয়াছি। গণতন্ত্রের মূলনীতি বজায় রাখার জন্য শহীদেরা আত্মদান করিয়াছেন এবং আমরা যদি নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারি তবে গণতন্ত্র নিরর্থক। আমাদের আচরণ এখন অবশ্যই সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক হইতে হইবে এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে। আইনের শাসন মানিয়া চলে এইরূপ সকল নাগরিককে রক্ষা করিতেই হইবে। দোষীকে শাস্তি দিতেই হইবে; তবে উহা উপযুক্ত আইনসম্মতভাবেই করিতে হইবে। আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল এবং আমাদের লোকদের উপর নৃশংসতা চালাইয়াছিল তাহাদেরও শাস্তি পাইতে হইবে। তাহাদের বিচার হইবে। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন একটি বিচার পদ্ধতি, একটি প্রশাসনযন্ত্র ও জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থে একটি পুলিশ বাহিনী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি নতুন পুলিশ বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহা জনগণেরই পুলিশ বাহিনী হইবে এবং পূর্বের মত জনগণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইবার হাতিয়ার হইবে না। এরূপ গণ-পুলিশ বাহিনী আমাদের বীর গণ-বাহিনীর লোক দ্বারাই উপযুক্তভাবে সংগঠন করিতে হইবে। সুতরাং সরকার পুলিশ অফিসার ও পুলিশ গণ-বাহিনীর সদস্যগণ হইতে নির্বাচন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে নির্বাচন বোর্ড গঠন করা হইবে।

আমাদের প্রিয় দেশকে অতি দ্রুত পুনর্গঠনের জন্য এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সকল প্রাপ্য সম্পদ (মাল-মসলা ও জনশক্তি) কাজে লাগাইবার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অবশ্যই বাড়াইতে হইবে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নক্সা তৈরির জন্য আমাদের বহু সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, ডাক্তার, কারিগর এবং সর্বপ্রকার দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। বর্বর শত্রু আমাদের সমাজের রত্নস্বরূপ। বুদ্ধিজীবীদিগকে যাহারা আমাদের উন্নতির সোপানে পৌঁছাইতে পারিতেন ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল। আমরা বহু অমূল্য জীবন হারাইয়াছি। আমাদের শুধু এই ক্ষতিই পূরণ করিতে হইবে না বরং উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে আমাদের নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। যুদ্ধের ধ্বংসাবলী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মুছিয়া ফেলিতে হইবে যাহাতে আমরা নতুন সমাজ গঠনের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করিতে পারি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মনে করেন যে, মুক্তিবাহিনী প্রতিভাসমূহের এক অপূর্ব ভাণ্ডার, যাহারা দেশ পুনর্গঠন, উহার অর্থনৈতিক কাঠামো পুনরুদ্ধার এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উন্নতি লাভের জন্য এক নতুন নেতৃত্ব দান করিতে সক্ষম। সরকার আশা করেন যে, মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ, বিশেষ করিয়া যাহারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য লেখাপড়া ছাড়িয়াছিলেন, তাহাদের জাতীয় উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা উচিত। এই সমস্ত বিষয় স্মরণে রাখিয়া সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা তাহাদের শিক্ষা ও ট্রেনিং সমাপ্ত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, পলিটেকনিক শিক্ষালয় ও অন্যান্য কারিগরি কেন্দ্রে ভর্তি হইতে আগ্রহী সরকার তাহাদিগকে সকল প্রকার সুযোগ দিবেন। সরকার দেশের সকল স্থানে নতুন নতুন কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করিতেছেন। যাহারা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন তাহাদিগকে অচিরেই উপযুক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে।

উপরোক্ত নীতিগুলো কার্যকরী করার জন্য সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে, তাহারা তালিকাভুক্ত হইয়া থাকুন বা না-ই থাকুন, একটি জাতীয় মিলিশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের পরিকল্পনা নিম্নরূপ হইবে:

১. অনতিবিলম্বে একটি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হইবে এবং তালিকাভুক্ত হউক বা না হউক, সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাকে ইহার আওতায় আনা হইবে।

২. প্রত্যেক মহকুমায় সেই এলাকার গেরিলাবাহিনীর জন্য শিবির প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শিবিরগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থা এমনভাবে করা হইবে যেন এই সব যুবককে পুনর্গঠন কাজের উপযোগী করিয়া প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়া সম্ভবপর হয়।

৩. মহকুমাভিত্তিক শিবিরগুলো এলাকার গেরিলা বাহিনীর মিলনকেন্দ্র হইবে।

৪. ঊর্ধ্বপক্ষে এগারোজন সদস্য লইয়া জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হইবে। মিত্রশক্তির তরফ হইতে বোর্ডে ২ জন উপদেষ্টা থাকিবেন-একজন মুক্তিবাহিনীর পক্ষ হইতে এবং অন্য জন মিত্রবাহিনীর পক্ষ হইতে। বোর্ডের সদস্যগণকে সরকার মনোনয়ন দান করিবেন।

৫. প্রত্যেক মহকুমা শহরে জাতীয় মিলিশিয়ার জন্য মহকুমা বোর্ড থাকিবে। মহকুমা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা অনধিক এগারোজন হইবেন। সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। মিত্রশক্তির তরফ হইতে বোর্ডে দুইজন উপদেষ্টা থাকিবেন-একজন মুক্তিবাহিনীর পক্ষ হইতে এবং অন্যজন মিত্রবাহিনীর পক্ষ হইতে থাকিবেন।

৬. প্রতিটি শিবির অস্ত্রশস্ত্র কার্যোপযোগী অবস্থায় রাখা, গুদামজাত করা ও হিসাবপত্র রাখার জন্য একটি করিয়া অস্ত্রাগার থাকিবে।

৭. ট্রেনিংয়ের কার্যসূচি এমনভাবে প্রস্তুত করা হইবে যেন এই সব যুবককে নিম্নেবর্ণিত ভূমিকা পালনের উপযোগী করিয়া তোলা যায় :

(ক) যেন তাহারা দেশের দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ হইতে পারেন।

(খ) যখনই নির্দিষ্টভাবে প্রয়োজন হইবে তখনই যেন তাহারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুনর্বহালে উপযোগী হইতে পারেন।

(গ) দেশের পুনর্গঠন কার্যে সরাসরি সহায়তা হয় এমন বিভিন্ন কাজের উপযোগী হন।

৮. অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, অপুষ্টিকর খাদ্য এবং অপর্যাপ্ত বেতন ও ভাতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গেরিলাদের এক বিরাট অংশ কষ্টভোগ করিয়াছেন। সেজন্যই তাহাদের খাদ্য, বাসস্থান ও ভাতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।

সংযোজনী-৮

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর্যালোচনা রিপোর্ট

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

দেশের নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পার্টির শিক্ষার জন্য এই নির্বাচনের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ইহার জন্য নির্বাচনের পটভূমি সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হইতেছে।

নির্বাচনের পটভূমি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেশের অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। স্বাধীনতার পরে যে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয়, পাকিস্তান আমলের পূর্বতন সরকারসমূহের সহিত এই সরকারের গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই সরকার গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র-এই চারটি নীতিকে রাষ্ট্রের মূল নীতি হিসেবে দেশের শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশীয় ব্যাঙ্ক, বীমা, শিল্প প্রভৃতি জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কারের নীতি ঘোষণা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন-প্রভৃতি কতকগুলি প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দেশের প্রগতিশীল শক্তিসমূহ এতদিন যে সকল নীতির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে আওয়ামী লীগ সরকার সেইগুলোকে রাষ্ট্রীয় নীতি ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

পাকিস্তানি আমলে শাসকচক্রকে উচ্ছেদ করাই ছিল প্রগতিশীলদের নীতি ও লক্ষ্য। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামগ্রিক অবস্থার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় এবং শাসন ক্ষমতায় মিত্রশ্রেণীর সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শাসকবর্গকে উচ্ছেদের পরিবর্তে বরং দেশ ও জনগণের স্বার্থে সরকারের ঘোষিত নীতিসমূহকে কার্যকর করাই পার্টির সামনে মৌল কর্তব্য হিসেবে উপস্থিত হয়। এই কারণে সরকার কর্তৃক অনুসৃত ও ঘোষিত উক্ত নীতিসমূহকে কমিউনিষ্ট পার্টি সমর্থন করে এবং উহা বাস্তাবয়নের জন্য সকল দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যের উপর জোর দেয়। স্বাধীনতার পরপর ন্যাপও সরকারের উক্ত প্রগতিশীল নীতি ও পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন করে এবং ঐক্যের আহ্বান জানায়।

স্বাধীনতার পর ঐসব নীতি ও প্রগতিশীল পদক্ষেপকে ভিত্তি করিয়া শাসকদল আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছিল। মুক্তি সংগ্রামের সময়ে উক্ত তিনটি পার্টির মধ্যে যেটুকু সহযোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাবে এবং স্বাধীনতার পরে সরকার কর্তৃক উক্ত প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে ঐ দলগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছিল। শাসকদলের নেতৃত্বের পক্ষ হইতে ও কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার মনোভাব দেখা যাইতেছিল।

কিন্তু, পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয়করণের নীতি সফল হইয়া উৎপাদন স্বাভাবিক হইতে পারে নাই। জাতীয়করণের নীতিকে ফলপ্রসূ করিবার ক্ষেত্রে সরকার যেমন ব্যর্থতার পরিচয় দেয়-অন্যদিকে দেশের প্রগতিশীল শক্তি এবং শ্রমিকশ্রেণীও সচেতনভাবে উহা ফলপ্রসূ করার জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করিতে পারে নাই। কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রেও কৃষক সমাজ সংগঠিত ও সচেতনভাবে অগ্রসর হইয়া আসিতে ব্যর্থ হয়। এবং শেষ পর্যন্ত সরকার জোতদার শ্রেণীর চাপের নিকট কিছুটা নতি স্বীকার করে। এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধের ফলে ও পাকিস্তানি শাসকচক্র কর্তৃক অনুসৃত পোড়ামাটি নীতির ফলে উদ্ভূত বিরাজমান অর্থনৈতিক সঙ্কট উল্লিখিত কারণে আরও তীব্র আকার ধারণ করে। দেশে চরম খাদ্য সঙ্কট ও অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদন হ্রাস পায় মারাত্মকভাবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশের ভিতরে অরাজকতা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মন্ত্রীদের গতানুগতিকতা, উদ্যোগহীনতা ও অকর্মণতা এবং আমলাদের চিরন্তন তালগোল পাকানো ও অনেক ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক কাজের ফলে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এইভাবে সামগ্রিকভাবে জটিল সঙ্কট চলিতে থাকে।

শাসকদলের একটি অংশের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি এই সঙ্কটকে আরও তীব্রতর করিয়া তোলে। ফলে দুর্নীতিপরায়ণ আওয়ামী লীগ এমসিএ-দের বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষুব্ধ হইতে থাকে। মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বিক্ষোভটা বেশ তীব্রতর হইয়া ওঠে। এই সঙ্কটকে আরও তীব্রতর করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীলরা তৎপর হইয়া উঠে।

এই সঙ্কটের সুযোগে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে উগ্র বামপন্থীরা ও দক্ষিণপন্থীরা সরকার-বিরোধী, ভারত-বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারণা চালাইতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের উগ্র বামপন্থীরা (রব-সিরাজ গ্রুপ) ছাত্রলীগ এবং পরে আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে থাকে। ইহারা আওয়ামী লীগও ছাত্রলীগের মধ্যকার একটি অসন্তুষ্ট যুব-অংশকে তাহাদের পক্ষে টানিয়া নিতে সমর্থ হয়।

যেহেতু, কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ সরকারের প্রগতিশীল নীতিগুলোকে সমর্থন দান করে এবং ঐক্যের আহ্বান জানায়, সেহেতু উক্ত উগ্রপন্থীরা কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের বিরুদ্ধে সরকারের 'বি-টিম' বলিয়া কুৎসা প্রচার চালাইতে থাকে। পক্ষান্তরে, আওয়ামী লীগ পরবর্তীকালে একা চলার নীতি গ্রহণ করে, এমনকি রিলিফ বণ্টনেও যুক্ত রিলিফ কমিটি করিতে পরবর্তীকালে অস্বীকার করে। ফলে দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্য গঠনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং সঙ্কট আরও তীব্রতর হইয়া উঠে। একদিকে জনজীবনের তীব্র সঙ্কট হেতু গণমনে অসন্তুষ্টি, এমসিএ-দের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ, সঙ্কট সমাধানে সরকারের ব্যর্থতা, সরকারি দলের একা চলার নীতি, অন্যদিকে উগ্রপন্থীদের ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সরকার বিরোধী ও ভারত-বিরোধী অভিযান, উগ্রপন্থীদের পক্ষ হইতে ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বি-টিমের কুৎসা প্রচার প্রভৃতি ন্যাপের রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের পার্টির মধ্যেও উক্ত অবস্থার প্রভাব পড়িতে থাকে। তবু উক্ত পরিস্থিতি সত্ত্বেও পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পার্টির গৃহীত ঐক্যের নীতিতে অবিচল থাকে। কিন্তু, ন্যাপ তাহার পূর্ব গৃহীত দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যের নীতি হইতে ক্রমে ক্রমে বিচ্যুত হয়। ন্যাপ পূর্বে সরকার সম্পর্কে যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের পূর্বে অন্ধ সরকার-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। ফলে, ন্যাপেরও আক্রমণের মূল লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় আওয়ামী লীগ সরকার।

ঐ সময়ে বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে ন্যাপের প্রভাব কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে ন্যাপ তাহার নিজ শক্তিকে অনেক বাড়াইয়া দেখে এবং দেশের পরিস্থিতি সঠিকভাবে বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয় এবং আরও বেশি বামপন্থার দিকে চলিয়া যায়।

ন্যাপ আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বিকল্প ন্যাপ সরকার গঠনের আওয়াজ উঠায় এবং ৩০০ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ঘোষণা করে। এই অবস্থায় আসে ১লা জানুয়ারির ঘটনা। ঐদিন 'ভিয়েতনাম সংহতি দিবস' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং দুইজন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীর মৃত্যুর ফলে দেশের, বিশেষত ঢাকার ছাত্র সমাজ ও জনতার মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

উক্ত ঘটনাবলী সাময়িকভাবে হইলেও আমাদের পার্টির মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং একটি সরকার-বিরোধী ঝোঁক দেখা দেয়। অবশ্য শাসকদল সম্পর্কে একটা সন্দেহের মনোভাব আমাদের পার্টির মধ্যে বরাবরই বিরাজমান আছে। কাজেই 'ভিয়েতনাম সংহতি দিবস'-এ ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলের উপর গুলিবর্ষণের ফলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারর বিরোধী মনোভাব জোরদার হয়। সরকার বিরোধী উক্ত বিক্ষোভকে কেন্দ্র করিয়া উগ্রবামপন্থীরা জনগণের চোখে সরকার ও শেখ মুজিবকে হেয় করা এবং শাসকদল ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর ভিতর বিভেদ বাড়াইতে সচেষ্ট হয়। ন্যাপ উক্ত বিক্ষোভকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়া শাসকদের বিরুদ্ধে নির্বাচনের কাজে সুবিধা গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হয়। এমনকি, প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের ভিতরেও বিচ্যুতি দেখা দেয় এবং ২রা জানুয়ারি এই সংগঠনের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে উগ্র আওয়াজ তোলা হয়।

২রা জানুয়ারি ঘটনাতে আওয়ামী লীগের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের উপর ব্যাপক হামলা চলে। কয়েকটি স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসও আক্রান্ত হয়। এই সব হামলার ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরাট অবনতি ঘটে। এইসব ঘটনার মধ্য দিয়া আওয়ামী লীগের এক অংশের ফ্যাসিস্টসুলভ গুণ্ডামির মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটে এবং আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী অংশ সক্রিয় হইয়া ওঠে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের সম্পর্ক পারস্পরিক রাজনৈতিক শত্রুতার পর্যায়ে চলিয়া যায়। এই উভয় দল পরস্পরকে আসন্ন নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করিতে থাকে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অবনতি ঘটে।

ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের উপর আওয়ামী লীগের ঐ নগ্ন হামলার পর দেশে একটা সন্ত্রাসের ভাব দেখা দেয়। নির্বাচনে অস্ত্রের ব্যবহার, খুন, জবরদস্তি চলিতে পারে

বলিয়া গণমনে একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে ন্যাপ দারুণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং ন্যাপের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হইতে থাকে। অন্যদিকে, উগ্রবামপন্থীরা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উক্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তৎপর হইয়া উঠে।

স্বাধীনতার পর শাসকদল, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি তথা দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর ভিতর যে বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল, গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে উহার, বিশেষ করিয়া ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটিতে থাকে। ১লা জানুয়ারি ও তার পরবর্তী ঘটনার পর দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর ভিতর, বিশেষত ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের ভিতর চরম বিভেদ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, জনগণের ভিতর বিরাজ করিতেছিল একটা সন্ত্রাসের ভাব। বিভেদ ও গণমনে সন্ত্রাস এই পরিস্থিতির মধ্যেই আসে নির্বাচন।

নির্বাচনী সংগ্রাম

নির্বাচনে একমাত্র আওয়ামী লীগই সকল আসনে প্রার্থী দাঁড় করায়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মো) ২২৩টি আসনে, জাসদ ২৩৬টি এবং ভাসানী ন্যাপ ১৬৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পার্টির পক্ষ হইতে মাত্র ৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়।

নির্বাচনী প্রচার অভিযানঃ আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ হইল সর্ববৃহৎ দল। এই দল হইল সরকারি দল। তাই, নির্বাচনে এই দলের প্রচার অভিযান এর গুরুত্ব সর্বাধিক। আওয়ামী লীগের মূল শক্তি হইল জনগণের উপর বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক প্রভাব। বঙ্গবন্ধুর প্রচারই ছিল আওয়ামী লীগের মূল এবং প্রধান প্রচার। বঙ্গবন্ধুর প্রচারের মূল বিষয়বস্তু ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও জনহিতকর কার্যকলাপের উল্লেখ, ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধিতা প্রভৃতি।

নির্বাচনী প্রচার অভিযানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ হইতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালানোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কারণ, এইবারের নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এবং উগ্র বামপন্থীদের ভারত-বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচারই ছিল সবচেয়ে প্রগতি-বিরোধী প্রচার। এই দিক দিয়া বঙ্গবন্ধুর প্রচার প্রগতির শক্তিকে জোরদার করিয়াছে।

কিন্তু, স্থানীয়ভাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বহুক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া ন্যাপ ও কমিউনিস্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাইতে গিয়া কমিউনিস্ট বিরোধী ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কুৎসা প্রচারের আশ্রয় নিয়াছে। কোন কোন বিশেষ এলাকায় তাহারা সাম্প্রদায়িক প্রচারের আশ্রয়ও নিয়াছে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

ন্যাপের মূল ও প্রধান প্রচার অভিযান ছিল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ব্যর্থতার বিরুদ্ধেই ন্যাপ প্রধানত প্রচার করিয়াছে। কোন কোন এলাকায় ভাসানী ন্যাপের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও জাসদের উগ্র রাজনীতির বিরুদ্ধে ন্যাপের পক্ষ হইতে প্রচার অভিযান চালানো হইলেও শিল্প জাতীয়করণ ও ভূমি সংস্কারের বাস্তবায়ন, বাংলাদেশ-ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সুদৃঢ়করণ, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা প্রভৃতি মৌলিক বিষয়গুলি ন্যাপের সামগ্রিক প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান পায় নাই।

উল্লেখ্য যে, নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পরে গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করিয়া কৃষক জনসাধারণ ও শহরের গরীবদের উপর বঙ্গবন্ধুর প্রভাব লক্ষ্য করিয়া ন্যাপ তাহার পূর্বেকার নির্বাচনী আওয়াজ পরিবর্তন করিয়াছিল। নির্বাচনী সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে ন্যাপ বিকল্প সরকারের যে শ্লোগান তুলিয়াছিল, অবস্থার চাপে পড়িয়া নির্বাচনকালে তাহাদের পক্ষ হইতে উক্ত শ্লোগান দেওয়া সম্ভব হয় নাই। নির্বাচনকালে অবস্থার চাপে পড়িয়া ন্যাপ আইনসভায় কিছুসংখ্যক সৎপ্রার্থী প্রেরণ এবং বিরোধীদল গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর কার্যত প্রচার অভিযান চালাইয়াছিল। ন্যাপের প্রচার অভিযান জনতাকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করিতে খুব বেশি সহায়ক হয় নাই।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

উগ্র বামপন্থী বিভেদাত্মক রাজনীতিকে ভিত্তি করিয়া নির্বাচনের কয়েক মাস পূর্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গড়িয়া উঠে। এই দল আওয়ামী লীগ সরকারকে গণ-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সরকার হিসেবে চিহ্নিত করে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এই দলই প্রধান বিরোধী দল তাহা প্রমাণ করার জন্য ২৩৬টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করায়।

নির্বাচনে এই দলের প্রচারের মূল বিষয়বস্তু ছিল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তীব্র নেতিবাচক আক্রমণ, সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা এবং ইহার সঙ্গে ভারত-বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার। এই দল সোভিয়েত বিরোধী প্রচারণাও চালাইয়াছিল। সেই সঙ্গে ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে শাসকদলের 'বি-টিম' আখ্যায়িত করিয়া এই দুই দলের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। উগ্র বামপন্থী স্লোগানের আড়ালে এই দল প্রতিক্রিয়াশীল ভারত-বিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেই তাহাদের নির্বাচনের প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করিয়াছিল।

ভাসানী ন্যাপ, লেনিনবাদী প্রভৃতি

ভাসানী ন্যাপ, লেনিনবাদী প্রভৃতি ৭টি দল ও গ্রুপের সমবায়ে একটি নির্বাচনী জোট গঠিত হয়। এই জোটের প্রচারের মূল বিষয়বস্তু ছিল-ভারত-বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা, সোভিয়েত-বিরোধিতা ও সরকার বিরোধিতা। আওয়ামী লীগ সরকারকে ভারত ও সোভিয়েত এর তাঁবেদার সরকার হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য এই জোট নানা প্রকার মিথ্যা ও কুৎসা প্রচারের আশ্রয় নেয়। ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই জোটের প্রচার অভিযানের প্রধানতম অংশ ছিল উগ্র ভারত-বিরোধী, হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার। কার্যত মুসলিম লীগ-জামাতের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিই ছিল এই জোটের প্রধান রাজনৈতিক প্রচার অভিযান।

এই জোট আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি– এই তিন দলের বিরুদ্ধেই প্রচার অভিযান চালাইয়াছিল। ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাইতে গিয়া এই জোট তীব্র সোভিয়েত বিরোধী ও ভারত-বিরোধী কুৎসা প্রচার চালাইয়াছিল। এই জোট নির্বাচনকালে তীব্র সাম্প্রদায়িক ও ভারত-বিরোধী প্রচার চালাইয়া জনমনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

কমিউনিস্ট পার্টি

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র পার্টি, যে পার্টি মওলানার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী ও উগ্র বামপন্থীদের ঐক্য-জোটকে এবং বিভেদপন্থী উগ্র বামপন্থী জাসদকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং তাহাদের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে জোটের সঙ্গে প্রচার অভিযান চালায়। সরকার কর্তৃক ঘোষিত চার নীতির এবং সরকার কর্তৃক অনুসৃত জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার এবং ভারত ও সোভিয়েত এর

সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উপর কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং উক্ত প্রগতিশীল নীতিসমূহকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল দেশপ্রেমিক দলের ঐক্যের উপর জোর দেয়।

উক্ত প্রচার অভিযানই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার অভিযানের মূল বিষয়বস্তু। সরকার ঘোষিত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা, সরকারি দলের দুর্বলতা, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি প্রচার অভিযান চালায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ এবং 'জাসদ' ও ভাসানী দলের প্রার্থীরা কমিউনিস্ট প্রার্থীদের বিরুদ্ধে 'কমিউনিস্টরা ধর্ম মানে না' 'সোভিয়েত ইউনিয়নে ধর্ম নাই,' 'সোভিয়েতে গণতন্ত্র নাই', 'কমিউনিস্টরা সব কৃষকের জমি নিয়া যাইবে' প্রভৃতি নানা প্রকার কুৎসা প্রচার করে। সিলেটের আসনে আওয়ামী লীগ কমিউনিস্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারও চালায়। পার্টি এই সমস্ত কুৎসার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে।

কিন্তু, চট্টগ্রামের রাউজান আসনে রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্রে স্থানীয় পার্টির একটা বিচ্যুতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। সেই আসনে মুসলিম লীগ প্রভাবিত ভোটারদের ভোট পাওয়ার আশায় প্রচারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম লীগের নাম উল্লেখ করিয়া কোন কিছু না বলার মনোভাব পার্টির মধ্যে ছিল। ইহা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ছাড়া কিছু নয়।

পার্টির নির্বাচনী নীতি কার্যকর করা সম্পর্কে

নির্বাচনে পার্টির মূলনীতি ছিল দেশবাসীর স্বার্থের অনুকূল পার্টির কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সকল দেশপ্রেমিক শক্তি ও জনগণের ঐক্য গড়িয়া তোলা এবং দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত নির্মূল করা। এই নির্বাচনী নীতিকে সামনে রাখিয়া পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হইয়াছে "এই ঐক্যের নীতিকে সার্থক করিয়া তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে নিজ পার্টির প্রার্থীদের জয়ের জন্য দৃঢ়ভাবে কাজ করিয়া যাইবে। অন্য সকল আসনে ন্যাপ (মোজাফফর) বা আওয়ামী লীগের সৎ ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীদের সমর্থন করিবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, মাওপন্থী ও অন্য উগ্রপন্থীদের পরাজিত করার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালাইবে।"

পার্টি তাহার নিজ প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও উগ্রপন্থীদের পরাজিত করার জন্য পার্টি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। কিন্তু, ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের মধ্যে বাছাই করিয়া সৎ ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীদের সমর্থন করার যে নীতি ছিল তাহা কার্যকর হয় নাই। কারণ, দেশের প্রগতির জন্য আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমিক অংশ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির একতা গড়িয়া তোলার যে মূলনীতি পার্টি গ্রহণ করিয়াছে, সেই হইতেই পার্টির মধ্যে যে আওয়ামী লীগ বিরোধী এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের উপর রাজনৈতিক অবিশ্বাসের মনোভাব ছিল, স্বাধীনতার পরেও উহার রেশ চলিতেছিল।

তদুপরি, নির্বাচনের সময় পার্টি ও ন্যাপ পরস্পর বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। ন্যাপ ঐক্যের নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নেতিবাচক নীতি গ্রহণ করে। ইহার ফলে পার্টির ভিতর বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতিও ঘটে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য পার্টির নির্বাচনী নীতি কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। ন্যাপ বা আওয়ামী লীগ এই উভয় দলের সৎ ও দেশপ্রেমিক প্রার্থীদের বাছাই করিয়া সমর্থন করার বদলে পার্টি সাধারণভাবে ন্যাপের প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করে।

এ ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। পার্টি যে চারটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করায়, সেই ৪টি আসনের মধ্যে ৩টিতে পার্টির প্রার্থী দাঁড় করানোর মত কিছুটা শক্তি ও যৌক্তিকতা ছিল। কিন্তু, রংপুর জেলার নিলফামারী–জলঢাকা আসনে পার্টির প্রার্থী দাঁড় করানোর মত শক্তি ও যৌক্তিকতা ছিল না।

নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ

নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬ শত ৩৮ জন। সরকারি ঘোষণামতে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা হলো ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬৫ হাজার।

আওয়ামী লীগ পাইয়াছে – ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩ হাজার ৪ শত ৮৩টি ভোট।
প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৩ ভাগ।

ন্যাপ পাইয়াছে	–	১৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪ শত ৪১টি ভোট।
জাসদ পাইয়াছে	–	১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত ৭২টি ভোট।
ভাসানী ন্যাপ পাইয়াছে	–	১০ লক্ষ ১ হাজার ৩ শত ১২টি ভোট।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির ৪ জন প্রার্থী মোট পাইয়াছে ৪৭ হাজার ২ শত ২৯টি ভোট; তন্মধ্যে সিলেট আসনে ২০ হাজারের উপর এবং চট্টগ্রাম জিলার আসনে ১০ হাজারের উপর ভোট পাইয়াছে। অলি আহাদের জাতীয় লীগ পাইয়াছে ৫২,৯০৩টি ভোট। লেনিনবাদী পার্টি পাইয়াছে ২টি আসনে ১৮,৬০৮ ভোট। ১২০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী পাইয়াছে মোট ৯ লক্ষ, ১৪ হাজার ৯ শত ৯৩টি ভোট।

ভোটের বিশ্লেষণ হইতে আরও দেখা যায় যে, ন্যাপ ১৩টি আসনে, জাসদ ৬টি আসনে এবং ভাসানী ন্যাপ ১২টি আসনে ২০ হাজারের বেশি ভোট পাইয়াছে। ১৫ হাজারের বেশি ভোট পাইয়াছে – ন্যাপ ২৫টি আসনে। জাসদ – ২১টি আসনে। ভাসানী ন্যাপ – ১৭টি আসনে। ১০ হাজারের বেশি ভোট পাইয়াছে – ন্যাপ ৫৩টি আসনে। জাসদ – ৩৬টি আসনে। ভাসানী ন্যাপ – ২৮টি আসনে। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ২১৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ন্যাপের ১৫০ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। জাসদের ২৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৮০ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ভাসানী ন্যাপের ১৬৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩৩ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

ভোটের উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে ইহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, সর্বদিক হইতে ন্যাপ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। সরকারি হিসেবে প্রদত্ত ভোটের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইল মোট ভোটারের শতকরা ৫৫ ভাগ। কিন্তু, আমাদের মতে এবার প্রকৃত প্রদত্ত ভোট শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগের বেশী হইবে না। বেশি দেখানো অতিরিক্ত ভোট প্রায় সবই আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের পক্ষে দেখানো হইয়াছে। ইহাও সত্য যে, নির্বাচন সর্বত্র অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় নাই। শাসক দল প্রথম হইতেই তাহাদের দলীয় নির্বাচনী কাজে বেতার, টি,ভি সরকারি ও আধা সরকারি প্রায় সকল পত্রিকা প্রভৃতি সরকারি প্রচার যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছে। সরকারি পরিবহন বিভাগ আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তদুপরি ভোটের দিন আওয়ামী লীগ কোন কোন আসনে জোর-জবরদস্তি করিয়া ভোট কেন্দ্র দখল করিয়া বহু জাল ভোট প্রদান ও অন্যান্য অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। এমনকি ন্যাপের একজন প্রার্থীকে প্রথমে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করার পর কারচুপি করিয়া তাহাকে পরাজিত করা হইয়াছে। ভোটের দিন আওয়ামী লীগ কোন কোন আসনে ঐরূপ জবরদস্তিমূলক পথ ও অসৎ উপায় গ্রহণ না করিলে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী দলের কিছুসংখ্যক প্রার্থী জয়লাভ করিতেন বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু, ইহা অনস্বীকার্য যে, আওয়ামী লীগ জনগণের বিশেষ করিয়া গরীব কৃষক ও গরীব জনগণের এবং মহিলা ও হিন্দুদের ব্যাপক ভোট লাভ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে।

শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার জন্যই আওয়ামী লীগ জনগণের ঐরূপ সমর্থন পাইয়াছে। এমনকি, আওয়ামী লীগের বহু প্রার্থী জনধিকৃত হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তার জোরে নির্বাচিত হইয়াছেন। ভোটের বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, সাধারণভাবে আওয়ামী লীগ গ্রামের কৃষক, খেতমজুর ও শহরের গরীবদের ভোট ব্যাপকভাবে পাইয়াছে। গ্রামের জোতদারদের একটা অংশের ভোটও আওয়ামী লীগের পক্ষে গিয়াছে। মহিলা এবং হিন্দুদের ভোট আওয়ামী লীগ বেশি পাইয়াছে। কিন্তু, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একটা ভাল অংশের ভোট আওয়ামী লীগ পায় নাই। ন্যাপ শিক্ষিত মধ্যবিত্তসহ সর্বস্তরের জনগণেরই কিছু কিছু ভোট পাইয়াছে। কয়েকটি আসনে ন্যাপ কৃষকদের একটা বড় অংশকে পক্ষে টানিতে সমর্থ হইয়াছে এবং সেই সমস্ত স্থানে ন্যাপ ভালসংখ্যক ভোট পাইয়াছে।

ভাসানী ন্যাপ ও জাতীয় সমজাতান্ত্রিক দল নির্বাচনে নগ্ন সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাইয়াছিল। সেই জন্য জামাত ও মুসলিম লীগপন্থীরা এই দুইটি দলকে সাধারণভাবে ভোট দিয়াছে। বিশেষত ঐ দুইটি দলের প্রার্থীদের মধ্যে যে প্রার্থীর বেশি ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই প্রার্থীকেই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সমর্থন করিয়াছে। ভাসানী ন্যাপ ও জাসদ প্রার্থীরা যে ভোট পাইয়াছে সেই ভোটের প্রধান অংশ হইল সাম্প্রাদায়িকতাবাদীদের ভোট। তাছাড়া জাসদ উগ্রবামপন্থী স্লোগান তুলিয়া শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের কিছু ভোটও লাভ করিয়াছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা ভাল অংশ তীব্র আওয়ামী লীগ বিরোধী ও ভারত বিরোধী মনোভাব হইতে জাসদ ও ভাসানী ন্যাপকে ভোট দিয়াছে। আমাদের পার্টির প্রার্থীরা বিভিন্ন আসনে

বিভিন্ন স্তরের জনগণের ভোট পাইয়াছে। সিলেটের আসনে পার্টির প্রার্থী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও কৃষকদের ভোট বেশ ভালসংখ্যক পাইয়াছে। এখানে আমাদের প্রার্থী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভোট পাইয়াছে। দিনাজপুরের আসনে আমাদের প্রার্থী প্রধানত আধিয়ার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভোট পাইয়াছে। চট্টগ্রামের আসনে আমাদের প্রার্থী মধ্যবিত্ত ও মধ্যকৃষকের ভোট বেশি পাইয়াছে। নিলফামারী আসনে আমাদের প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোটের বেশিরভাগ হইল মধ্যবিত্ত সমাজের। উল্লেখ্য যে, এই আসনে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা আমাদের পার্টির প্রার্থীর পক্ষে ছিল, তাহাদের অনেকে ভাসানী ন্যাপের প্রার্থীর উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার এবং উক্ত প্রার্থীর জয়লাভের আশঙ্কা করিয়া পরিশেষে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য ভোট দিয়াছে। নির্বাচনের মধ্য দিয়া ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, গ্রামের কৃষক ও গরীবদের ভিতর আমাদের পার্টির ভিত্তি অতি দুর্বল।

নির্বাচনের অভিজ্ঞতা

নির্বাচন হইতে আমরা নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতা পাইয়াছি

১. জনগণের উপর শেখ মুজিবের প্রভাব এখনও বিপুল। আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা হইতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ বিক্ষুব্ধ হইলেও জনতার ব্যাপক অংশ বিশেষ করিয়া শ্রমজীবী জনগণ আওয়ামী লীগ সরকার, বিশেষ করিয়া শেখ মুজিবকে ক্ষমতায় রাখাটা বিশেষভাবে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে।

২. নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রীর পক্ষে এবং কোন কোন সময়ে সোভিয়েতের পক্ষে দেশব্যাপী প্রচার অভিযান চালাইয়াছিলেন।

   এক কথায় বলা যায় যে, 'জাসদ' ও 'ভাসানী ন্যাপ' যে রূপ তীব্রভাবে ভারত-সোভিয়েত বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাইয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিয়াছিল, সমগ্রভাবে আওয়ামী লীগ না হইলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উহার মোকাবেলায় দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বামপন্থী প্রগতিশীল দল ন্যাপ এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখায়। সামগ্রিকভাবে ন্যাপ নেতিবাচক ও সরকার বিরোধী বক্তব্য দিয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং আমাদের পার্টির কমরেডরা সাধারণভাবে ন্যাপের এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে

দাঁড়াইতে পারে নাই। বরং পার্টি উহার নিজস্ব নির্বাচনী নীতি ন্যাপ বা আওয়ামী লীগের সৎ প্রার্থীদের বাছাই করিয়া সমর্থনের নীতি কার্যকরী করিতে পারে নাই। আমাদের পার্টি তাহার চারটি আসনে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে এবং বাংলাদেশ-ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর পক্ষে সাধ্যমত প্রচার চালাইয়াছে। পার্টি তাহার প্রগতিশীল কর্মসূচিগুলোও যথাযথভাবে প্রচার করিয়াছে। কিন্তু, পার্টির এই সমস্ত প্রচার ছিল পার্টির চারটি এলাকায় সীমিত। পার্টি সারা দেশব্যাপী সার্থকভাবে উক্ত প্রচার অভিযান চালাইতে পারে নাই।

৩. পক্ষান্তরে, নির্বাচনকালে ভাসানী ন্যাপ ও জাসদের পক্ষ হইতে তীব্র ও ব্যাপক আকারে ভারত-বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানো হইয়াছে। প্রগতিশীল শক্তিগুলো উহার বিরুদ্ধে যথাযথ রাজনৈতিক সংগ্রাম করিতে পারে নাই বলিয়া সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো (জামাত, মুসলিম লীগ প্রভৃতি) ভাসানী ন্যাপ ও জাসদের নেতৃত্বে নতুনভাবে সক্রিয় ও সংহত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। ইহা দেশের পক্ষে একটা বিপদস্বরূপ।

নির্বাচনের ভিতর দিয়া ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে যে, ভাসানী ন্যাপ ও জাসদের সাম্প্রদায়িক প্রচারে ব্যাপকভাবে কৃষকসমাজ প্রভাবান্বিত হয় নাই বটে, তাহারা ব্যাপকভাবে শেখ মুজিবের পক্ষে ভোট দিয়াছে। কিন্তু জনগণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্তদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ভারত-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণভাবে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিশেষভাবে ভারত-বিরোধিতা বৃদ্ধি করার জন্য সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে ক্রমে ভারত-বিরোধিতা ও হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা জনতার মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে। তাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে।

৪. নির্বাচনের মধ্য দিয়া ইহাও বুঝা গিয়াছে যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের একটা বড় অংশ বিভিন্ন কারণে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। ইহাদের একটা অংশের উপর জাসদের উগ্র রাজনৈতিক প্রভাবও পড়িতেছে। অথচ, এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজই হইল রাজনৈতিকভাবে সক্রিয়, মুখর। একদা ইহারা সাধারণভাবে আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিল। বর্তমানে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের একটা অংশের

সরকার বিরোধী নেতিবাচক মনোভাব দেশের প্রগতির পক্ষে একটা বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকে সঠিক রাজনৈতিক পথে পরিচালনা করা প্রগতিশীলদের একটা কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়াছে।

৫. জাতীয়করণ ও ভূমি সংস্কারের নীতিকে বাস্তবায়িত করা এবং দেশের সঙ্কট সমাধানের জন্য শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা এবং জনগণকে উপরোক্ত কাজে উদ্বুদ্ধ করা সকল প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক দলেরই কর্তব্য ছিল। কিন্তু, নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধু নিজে এবং কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন দেশপ্রেমিক দল উহা জনসাধারণের নিকট জোরের সংগে তুলিয়া ধরে নাই। কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই, নির্বাচনের ভিতর দিয়া জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা এবং দেশপ্রেমিক কাজে উদ্বুদ্ধ করার যেটুকু সুযোগ ছিল, তাহা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

৬. নির্বাচনে প্রগতিশীল শক্তির, বিশেষ করিয়া ন্যাপের নৈরাশ্যজনক পরাজয়ের ফলে ন্যাপ কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি, হতাশা ও নেতৃত্ব বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়াছে। জাসদের উগ্র বামপন্থী রাজনৈতিক প্রভাব ও কিছু কিছু নতুন কর্মীর উপর পড়িতেছে। আবার নির্বাচনের অভিজ্ঞতা কর্মীদের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করিতে এবং সঠিকভাবে কর্তব্য নির্ধারণ করিতেও সাহায্য করিতেছে।

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি

নির্বাচনের পর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিম্নরূপ

১. দেশে পূর্ব হইতেই যে অর্থনৈতিক ও খাদ্য সঙ্কট চলিয়া আসিতেছিল, নির্বাচনের পর ঐ সঙ্কট আরও তীব্রতর হইয়াছে। শিল্প উপাদনের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শিল্প উৎপাদনের হারও পূর্বের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে। খাদ্য সঙ্কট বৃদ্ধির ফলে সরকার রেশনের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং চাউলের মূল্য পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের দামও কমে নাই। আমলাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সমস্যাগুলিকে জটিলতর করিতেছে।

২. উপরোক্ত সঙ্কটের সুযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা সাহায্যের মধ্য দিয়া সরকারের উপর নানাবিধ চাপ সৃষ্টি করিতেছে।

৩. মওলানা ভাসানী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি এবং উগ্র বামপন্থী ও চীনাপন্থীরাও অবিরত প্রচার চালাইয়া সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়া চলিয়াছে।

৪. নির্বাচনের পর শ্রমিক লীগ শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে কোণঠাসা করার জন্য নানাবিধ অগণতান্ত্রিক ও জবরদস্তিমূলক কার্যকলাপ চালাইতেছে। ইহার ফলে শ্রমিকদের দলগত ও ইউনিয়নগত বিরোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই বিরোধ অনেক স্থানে স্থানীয়, অ-স্থানীয় বিরোধ ও সংঘর্ষে পরিণত হইতেছে বা হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছে।

৫. নির্বাচনের পর রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা ও নক্সালীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দুইজন কমরেড ওয়ালিউর রহমান লেবু ও রূপনারায়ণ রায় যথাক্রমে হেমায়েত বাহিনী ও নক্সালীদের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। কয়েকজন ন্যাপনেতা, আওয়ামী লীগ কর্মী ও ছাত্র কর্মীও হেমায়েত বাহিনী, নক্সালী ও দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হইয়াছেন।

৬. নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করার ফলে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একদলীয় আধিপত্য বিস্তারের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। অনেক স্থানে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্যান্য বিরোধী দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালানো হইতেছে।

৭. নির্বাচনে পরাজয়ের ফলে পার্টি ও ন্যাপ কর্মীদের মধ্যে নানাপ্রকার রাজনৈতিক বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে। নির্বাচনের সময় ও পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে কতকগুলি সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালানোর ফলে আমাদের পার্টি ও ন্যাপ কর্মীদের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হইতেছে। অনেক প্রগতিশীল কর্মীর মধ্যে, বিশেষ করিয়া নতুন নতুন কর্মীদের মধ্যে নির্বাচন বিরোধী মনোভাবও সৃষ্টি হইতেছে। উগ্রপন্থী ও মাওবাদীরা এই অবস্থার সুযোগে তাহাদের হঠকারী নীতির দিকে নতুন নতুন তরুণ কর্মীদের টানার চেষ্টা করিতেছে।

প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনের পর দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্কট বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির ভিতর বিভেদ এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি, নক্সালী ও উগ্রপন্থীদের তৎপরতা বৃদ্ধি প্রভৃতি জটিল সমস্যা দেশের সামনে উপস্থিত হইয়াছে। তবে, নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত ভাল দিকগুলোও রহিয়াছে:

ক. নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় দেশের বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমিক অংশের ভিতর দেশের সঙ্কট সমাধানের প্রয়োজনে প্রগতিশীল কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা নতুন চেতনা ও চিন্তা লক্ষ্য করা যাইতেছে। ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের মধ্যকার এই নতুন চিন্তাধারা দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যের পথে সহায়ক হইবে।

খ. আওয়ামী যুবলীগের পক্ষ হইতেও সম্প্রতি সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানানো হইয়াছে। উপরোক্তভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য যে আহ্বান জানানো হইয়াছে, তাহা দেশ গঠনের গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর ঐক্য গঠনের পক্ষে সহায়ক।

গ. ইহা ছাড়া নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্য দিয়া পার্টি নীতি ও কর্মসূচি জনগণের মধ্যে পূর্ব হইতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছে। যে স্থানে পার্টির সভ্যরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন, সেইসব স্থানে জনগণের সঙ্গে পার্টির সংযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, নতুন নতুন কর্মী বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং ঐ সকল অঞ্চলে কৃষক সংগঠন ও পার্টি সংগঠন গড়িয়া তোলার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে।

করণীয়

১. নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে দেশবাসী ও পার্টি যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা মোকাবিলা করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সমগ্র পার্টিকে পার্টির গৃহীত নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা। সেই জন্য অবিলম্বে পার্টির সকল স্তরে পার্টির নীতি ও কর্মকৌশল লইয়া আলোচনা করা এবং পার্টির রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২. বর্তমানে দেশে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সঙ্কট চলিতেছে, সেই পরিস্থিতিতে জাতীয়করণ ও ভূমি সংস্কারের নীতি কার্যকর করা, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা, শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করিয়া গড়িয়া তোলা, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি কাজের সমূহ গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ঐ সব কাজে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্প, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, শিক্ষা ব্যবস্থার

পুনর্গঠন প্রভৃতির জন্য সংগ্রাম এক কথায়, দেশ ও সমাজকে নতুন করিয়া গঠন করার সংগ্রামই হইল প্রকৃত বৈপ্লবিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করাই আজ পার্টির মূল কর্তব্য। এই সংগ্রামে সফলতার জন্য শিল্প, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাস্তব গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে, তাহা বিচার করিয়া বিভিন্ন ফ্রন্টের সাব-কমিটির মাধ্যমে পার্টির পক্ষ হইতে এইসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং কেন্দ্রীয় সেক্টর ও কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন নিয়া ঐ সব পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পার্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা। ঐ সব পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য সেগুলোর পক্ষে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও অন্যান্য জনগণকে সমবেত করা ও উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু, পার্টির একক শক্তিতে দেশ গড়ার কাজ সমাধা করা যাইবে না। জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি বাস্তবায়নে ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ সফল করার জন্য একান্ত প্রয়োজন হইল আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমিক অংশসহ সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্য ও সহযোগিতা। শিল্প, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজকে ভিত্তি করিয়া ঐ ঐক্য গঠন করিতে পার্টির উদ্যোগী হওয়া। এই ঐক্য গঠন করার জন্যই আওয়ামী লীগের দোদুল্যমানতা, দুর্বলতা, অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সমালোচনা ও সংগ্রাম করা দরকার। এই সমালোচনা ও সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হইবে দেশ প্রেমিকদের ঐক্য গঠন। তাই, অবস্থার বিচার করিয়া এই সমালোচনা ও সংগ্রাম পার্টির পক্ষ হইতে এমনভাবে পরিচালনা করা, যাহাতে ঐক্য গঠনের সম্ভাবনাই নষ্ট না হয়।

প্রকৃত পক্ষে, আজ পার্টির মূল রাজনৈতিক কর্তব্য হইল-জাতীয়করণ ও ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রভৃতির জন্য সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা। সে জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজের বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করা, সেগুলোর পক্ষে জনগণকে সমবেত করা এবং সেগুলোর সফলতার জন্য আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমিক অংশসহ সকল দেশ-প্রেমিকদের ঐক্য গঠনে ব্রতী হওয়া।

৩. সাম্প্রদায়িকতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ও সকলপ্রকার বিভেদাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে সংগ্রাম করা। ভারত-

বিরোধী ও সোভিয়েত-বিরোধী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালানো। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি ও উগ্র বামপন্থী হঠকারীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিযান পরিচালনা করা।

৪. নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্য দিয়া পার্টির চারি পাশে যেসব নতুন নতুন কর্মী সমবেত হইয়াছে, তাহাদিগকে পার্টি গ্রুপে সংগঠিত করা, তাহাদের সঙ্গে পার্টি নীতি ও কর্মসূচি নিয়া আলোচনা করা এবং তাহাদিগকে গ্রামে কৃষকদের ভিতর, শহরে গরীবদের মধ্যে কাজ করিতে উৎসাহিত করা।

৫. নির্বাচনের ভিতর দিয়া যেসব অঞ্চলের জনগণের সাথে পার্টির যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেইসব অঞ্চলে কাজের উপরই বিশেষ জোর।

৬. দেওয়া এবং কেন্দ্রীভূত করা। সেই সব অঞ্চলে শ্রেণী সংগঠন ও পার্টি সংগঠন গড়িয়া তোলার উপর জোর দেওয়া এবং সেজন্য পার্টি কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস (ঢাকা)-এর ব্যবহৃত নথীসমূহ

ফাইল নং	বিবরণ	ভলিউম
৩২৯.০৯	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১, ২, ৩
নং বিহীন	১৯৭২ সালের পার্টির রাজনৈতিক লাইনের রিপোর্ট	০
নং বিহীন	১৯৭৩ সালের পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্ট	০
নং বিহীন	১৯৭৯ সালের নির্বাচনী ইশতেহার	০
নং বিহীন	১৯৮৭ সালের পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্ট	০
নং বিহীন	বিভিন্ন লিফলেট ও পোস্টার	০
৩৫০.১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১, ২, ৩
৩৫০.১ (১)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	এ
৩২৯.০৭	আওয়ামী যুবলীগ	১, ২
৩২৯.০৭	বাংলাদেশ ছাত্রলীগ	১
৩২৯.০৭	বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (প্রেস ক্লিপিং)	১
৩২৯.০৬	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১
৩২৯.৪	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	১, ২, ৪
৩২০.৫০৩	সমাজতন্ত্র	১
নং বিহীন	বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহ	১, ২
৩২৯	বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহ	১
৩২৯.০৩	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর)	১, ২
৩২৯.০২	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	১, ২, ৩, ৪
৩২৯.১১	জাতীয় জনতা পার্টি	১, ২
নং বিহীন	জনদল	১,২
৩২৯.২০৪	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১
৩২৯.০৫	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	১
নং বিহীন	জামায়াতে ইসলামী	১
নং বিহীন	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল	১

কলকাতা আর্কাইভস-এর ব্যবহৃত নথীসমূহ

1. I.B. File No.929/1925.
2. National Front, Vol. II, No 1, February 12, 1939, Bombay.
3. I.B., Government of Bengal-File No. 929/1935.
4. E.B. Legislative Assembly Proceedings 10th March-1950, Vol. iv. No. 8.
5. শারদ নক্ষত্র 1408 # xxxi/152-153# এস.সেপ ২০০১।
6. E. B. L. A. Proceedings, 10th March. 1950, Vol. IV. No. 8.
7. E. B. L. A. Proceedings, Vol. IV, No. 8.
8. Taya Zinkin: Reporting India, Chatto Windus.
9. Report on the Police Administration of the Province of East Bengal for the year 1948.
10. Inelegancy Branch (I.B.) Government of Bengal, File no. 929/1935 (year 1935)
11. Inelegancy Branch (I.B.) Government of Bengal, File no. 1201/1933 (year 1933)
12. File No P & R-14/49: "Report on the Police Administration of the Province of East Bengal for the year 1948", By Z. Hossine, Inspector General of Police, East Bengal, Government of East Bengal, Home Department, Police Branch.

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও সরকারি উৎস

13. Report on General Election of United Pakistan 1970-70, Part 1, published in 1972.
14. Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly-1954 (Dacca : Secretary, Bangladesh Election Commission, May 1977)
15. Report on the National Election in 1st Jatiya Shongshed, 7 March 1973.
16. Statistical Report, 5th Jatiya Shongshed Election Commission, 28 February, 1991.

17. Government of the East Pakistan, Assembly Proceedings, Dacca : Government of East Pakistan Press, 55-57, Vol- 9.
18. Government of East Bengal, Legislative Assembly Debates, Dacca: Government of East Bengal, 1948-52, Vols. 1-8.
19. Government of Pakistan, Debates of the National Assembly of Pakistan, 1955-56.
20. Government of Pakistan, Twenty Years of Pakistan in Statistic, Karachi in 1968.
21. The Third five years plan (1965-1970), Planning commission, Government of Pakistan, 1965
22. The Third Plan, Targets and Achievements, Planning Commission, Government of Pakistan, 1968.
23. Bangladesh Documents, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, 1971.
    ১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশিত শ্বেতপত্র, ১৯৭২।
    ২. পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্কট সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশিত শ্বেতপত্র, ৫ আগস্ট, ১৯৭১।
    ৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত সরকারি প্রেসনোট।
    ৪. ১৮ আগস্ট, ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত কমরেড আব্দুস সালামের সক্ষাৎকার।
    ৫. কমরেড মণি সিংহের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত প্রামাণ্য অনুষ্ঠান আগুনের পরশমণি।

কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও পার্টি দলিলসমূহ

ক. কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত দলিল ও রিপোর্ট

১. ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসের রিপোর্ট।

২. ভাষা আন্দোলন বিষয়ে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির বিবৃতি, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
৩. ভাষা আন্দোলন বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির বিবৃতি, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
৪. ভাষা আন্দোলন বিষয়ে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির বিবৃতি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
৫. ভাষা আন্দোলন বিষয়ে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির বিবৃতি, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
৬. ভাষা আন্দোলন বিষয়ে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ সংগঠনী কমিটির বিবৃতি, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
৭. ১৯৬৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্ট।
৮. ১৯৭১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রচারিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব শীর্ষক লিফলেট।
৯. ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ তারিখে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপত্র।
১০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মূল্যায়ন যা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, প্রকাশের তারিখ, ১৫ আগস্ট, ১৯৭১।
১১. মে ২৫, ১৯৭১ তারিখে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বিতরণকৃত 'হানাদার খতম করুন, বাংলাদেশ স্বাধীন করুন' শীর্ষক প্রচারপত্র।
১২. আগস্ট ০৬, ১৯৭১ তারিখে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বিতরণকৃত ' গেরিলা যোদ্ধাদের অবশ্যই পালনীয় নীতিমালা' শীর্ষক প্রচারপত্র।
১৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আগস্ট ৩১, ১৯৭১ তারিখে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত 'মুক্তিযোদ্ধাদের অবশ্য পালনীয় রাজনৈতিক নীতিমালা' শীর্ষক প্রচারপত্র।
১৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মূল্যায়ন যা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, প্রকাশের তারিখ ২২ আগস্ট, ১৯৭১।
১৫. ১৯৭২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্ট।

১৬. সংবিধান প্রশ্নে ১৯৭২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশিত পুস্তিকা "সংবিধান প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির অভিমত"।

১৭. ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্ট ও প্রস্তাবাবলী ।

১৮. ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহার।

১৯. ১৯৭৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্ট।

২০. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব ১৯৭৭।

২১. ১৯৭৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত "জনগণের দাবিঃ কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর," শীর্ষক পুস্তিকা।

২২. ২১.০১.১৯৭৯ তারিখে "দেশবাসী ও ভোটারদের প্রতি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন", শীর্ষক প্রচারপত্র।

২৩. ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত ও প্রকাশিত রাজনৈতিক রিপোর্ট ও প্রস্তাবাবলী।

২৪. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব, যা জুলাই ২৫, ২৬ ও ২৭, ১৯৮৩ তারিখের সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

২৫. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের সংকলন 'বেতিয়ারা', প্রকাশকাল ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

২৬. কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত "ভাষা আন্দোলনের দলিল সংকলন", প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯।

২৭. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সংগঠন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত "কতিপয় সাংগঠনিক নীতি ও সিদ্ধান্ত", ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭।

২৮. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস (বক্তব্য, অভিনন্দন বাণী ও দলিলসমূহ)", প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

২৯. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রচারিত "বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ঐতিহাসিক ৪র্থ কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিকের স্বাগত ভাষণ" শীর্ষক পুস্তিকা, এপ্রিল ৭, ১৯৮৭।

৩০. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে (১৯৮৭) গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব।

৩১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তরাজ্য শাখা কর্তৃক প্রকাশিত 'সংগ্রামের পঞ্চাশ বছর, শীর্ষক পুস্তিকা, যা ৯ আগস্ট ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়।

সংবাদ-পত্রসমূহ

দৈনিক পত্রিকাসমূহ

The Pakistan Observer;

The Bangladesh Observer;

The Daily People;

The Daily Morning News;

দৈনিক সংবাদ;

দৈনিক গণকণ্ঠ;

দৈনিক ইত্তেফাক;

দৈনিক আজাদ;

দৈনিক বাংলা;

দৈনিক জনতা;

দৈনিক গণশক্তি;

দৈনিক দেশ;

দৈনিক কিষাণ;

দৈনিক দেশ বাংলা;

দৈনিক বাংলার বাণী;

দৈনিক স্বদেশ,

দৈনিক জনপদ;

দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা;

দৈনিক বাংলার মুখ;

দৈনিক বার্তা;

দৈনিক মাতৃভূমি;

দৈনিক সংগ্রাম;

দৈনিক পূর্বাদেশ;

দৈনিক খবর;
দৈনিক মিল্লাত;
দৈনিক ভোরের কাগজ।

সাপ্তাহিক পত্রিকা

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত *সাপ্তাহিক একতা;*
পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক ত্রৈমাসিক *শিখা*, (শিখা পত্রিকাটি মাসিক হলেও মাঝে মাঝে তা তিন এবং ছয় মাস পরপরও প্রকাশিত হত);
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত *মুক্তিযুদ্ধ;*

পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক হাতিয়ার;
সাপ্তাহিক নওবেলা;
বিচিত্রা;
প্রতিচিত্র;
পূর্বাণী;
খবরের কাগজ;
আগামী।

মাসিক পত্রিকা

শিখা (আবু নাসের সম্পাদিত);
শৈলী;
নক্ষত্র (ত্রৈমাসিক, কলকাতা থেকে প্রকাশিত);
সমাজ চেতনা;
নিরীক্ষা (বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিটিউটের গণমাধ্যম সাময়িকী);
লাঙ্গল (কলকাতা, ভারত);
শিক্ষাবার্তা;
আমাদের সময়কাল।

সাক্ষাৎকার

১. মণি সিংহের পুত্র ডা. দিবালোক সিংহের সাক্ষাৎকার, ১৯ অক্টোবর, ২০০১, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

২. কমরেড হেনা দাসের সাক্ষাৎকার, ১৯ অক্টোবর, ২০০১, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

৩. নিবেদিতা নাগের সাক্ষাৎকার, ৩০ জুলাই ২০০১, ২০, দূতাবাস ভিউ, বারিধারা, ঢাকা।

৪. রমেন্দ্রনাথ মিত্র ও ইলা মিত্রের সাক্ষাৎকার, ১০ জুন, ১৯৮৬ (মূল সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন মেসবাহ কামাল, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৫. ভজন বর্মণের সাক্ষাৎকার, ২৬ মার্চ, ১৯৯৬, স্থান, জগদল গ্রাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ মূল সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন মেসবাহ কামাল, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

৬. সরদার ফজলুল করিমের অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার, ১২ আগস্ট, ২০০৪, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

৭. কমরেড মঞ্জুরুল আহসান খানের সাক্ষাৎকার। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫, তার নিজস্ব বাসভবন।

৮. কমরেড সাইফুদ্দীন আহম্মেদ মানিকের সাক্ষাৎকার, ১২ ডিসেম্বও, ২০০৪, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, গণফোরাম।

৯. আমজাদ হোসেনের খানের সাক্ষাৎকার, ২৬ জুলাই ২০০৫, যশোহর, (১৯৬৮ সালের কংগ্রেসে যে কমিটি গঠিত হয় তার সদস্য, বর্তমানে ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে জড়িত)।

১০. অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের সাক্ষাৎকার, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৪।

১১. মতিয়া চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৫, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

১২. তোফায়েল আহমেদের সাক্ষাৎকার, ২৫ নভে, ২০০৪, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

১৩. তাজউদ্দীন আহমেদের ডায়রি।

গবেষণা প্রবন্ধসমূহ

অনুপম সেন — "বাংলাদেশ সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি", *রক্তাক্ত বাংলা*, মুজিবনগর, প্রকাশকাল, ১৯৭১।

অমিতাভ চন্দ্র — "বেঙ্গল লেবার পার্টি ও বলশেভিক পার্টি-সংগঠন ও রাজনীতি (১৯৩২-১৯৪৪), *ইতিহাস অনুসন্ধান* (তৃতীয়), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে.পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ভারত।

আতাউর রহমান খান — "পাকিস্তানের অভ্যুদয় ও বিরোধী রাজনীতির সূত্রপাত", *বিচিত্রা* (ঈদ সংখ্যা), ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৯৭৭।

আনোয়ারুল ইসলাম — "১৯৭০ সালের নির্বাচন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়", *ইনিস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৪:৫।

আবুল কালাম — "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : বৃহৎ শক্তি প্রতিক্রিয়া", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস)*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩।

আহমেদ কামাল — "স্বাধীনতার সময়ে পূর্ব বাংলা", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস)*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩।

এ.টি.এম আতিকুর রহমান — "বাংলায় কমিউনিজমের উন্মেষ পর্ব ও ইয়ং কমরেডস্ লীগ: একটি পর্যালোচনা". *The Jahangirnagar Review, Part-c, Vol –x*, 1998-99, pp 41-60).

এ.টি.এম আতিকুর রহমান — "১৯৬২ সালের সমাজতান্ত্রিক নিউক্লিয়াস: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা" *প্রবন্ধ সংকলন, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা। প্রকাশকাল, জুন-১৯৯৯।

এনায়েতুর রহমান — "পাকিস্তান রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী (১৯৪৭-১৯৭১)", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রথম খন্ড), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩।

এনায়েতুর রহমান — "মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রথম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩।

কামাল উদ্দীন আহম্মেদ	"চুয়ান্ন সালের নির্বাচন: স্বায়ত্বশাসন প্রসঙ্গ" সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* (প্রথম খণ্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল ১৯৯৩।
কাজী আকরাম হোসেন	"ছাত্র ইউনিয়ন: বাহান্ন থেকে বাষট্টি: একটি পর্যায়ের উত্তরণ", *গৌরবের সমাচার ১৯৫২-১৯৭৭, ঢাকা*, রজত জয়ন্তী প্রকাশনা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ২৬ এপ্রিল ১৯৭৭।
কাজী জাফর আহম্মেদ	"বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন", *বিচিত্রা* (ঈদ সংখ্যা), ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৯৭৭।
প্রীতিকুমার মিত্র	"বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬", প্রফেসর সালাউদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১, আগামী প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭।
ধরণী গোস্বামী	"ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায় (প্রথম পর্ব)", কলকাতা, পরিচয়, বর্ষ-৪৩, সংখ্যা ২-৩, ১৯৭৩।
বদরুদ্দীন উমর	"পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তানি শাসনের প্রথম অধ্যায়", *বিচিত্রা* (ঈদ সংখ্যা), ৯ বর্ষ, ১৯৮০।
মর্তুজা খালেদ	"জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৭২-১৯৭৫)", *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫*, ফার্মা কেএমএল প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।
ডঃ মর্তুজা খালেদ	"ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্টস্ পার্টি ও বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন (১৯২৬-২৮)", রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ কর্তৃক প্রকাশিত *গবেষণা পত্রিকা*, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৬-৯৭।
মেসবাহ কামাল	"নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ", সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৬।
মুসা আনসারী	"বামপন্থী রাজনীতি", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* (প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩।
মোহাম্মদ তোয়াহা	"পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও যুব আন্দোলন" *বিচিত্রা*, নবম সংখ্যা, ১৯৭৭।

মোহাম্মদ হান্নান	"গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টিতে ছাত্র ইউনিয়ন", আবুল কাশেম ফজলুল হক সম্পাদিত *গৌরবের চল্লিশ বছর: ১৯৫২-৯২*, ঢাকা: ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৯৩।
রঙ্গলাল সেন	"ষাটের দশকে বাংলাদেশ ও বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ", আবুল কাশেম ফজলুল হক সম্পাদিত, *গৌরবের চল্লিশ বছর: ১৯৫২-৯২*, ঢাকা: ছাত্র ইউনিয়নের ৪০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, ১৯৯৩।
রাশেদ খান মেনন	"চৌষট্টির ছাত্র আন্দোলন", *বিচিত্রা*, ৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৯৭৭।
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	"একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ", সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৬।
সুস্নাত দাস	"তেভাগা কৃষক সংগ্রামের প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গ: অনুসন্ধান-বিনির্মাণ ও বিতর্কের আলোকে", *শারদ নক্ষত্র* ১৪০৮# XXXI/152-153 এস-সেপ ২০০১, কলকাতা, ভারত।
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	"বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে পরাশক্তির ভূমিকা", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, পঞ্চদশ সংখ্যা, ঢাকা, জুন-১৯৮২।
Akanda, S.A.	"The Working of the Ayub Constitution and the People of Bangladesh", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies* (IBS), Vol. IV, 1979-1980.
Akanda, S.A.	"The 1962 Constitution of Pakistan and the Reaction of the people of Bangladesh", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies* (IBS), Vol. III, 1978.
Akanda, S.A	"Was Parliamentary System of Government a Failure in Pakistan? A Case Study of a Constitutional Debates in Pakistan during Martial Law 1958-62", *The Journal of the institute of Bangladesh Studies*, Vol. VI, Annual 1982-83.

Al-Mujahid, Sharif — "Pakistan: First General Election", *Asian Survey,* Vol. XI. No. 2, Frbruary-1971.

Ali, Tariq — "Bangladesh: Result and Prospects", *New Left Review,* No. 68, July and August in 1971.

Baxter, Craig — "Eco-cultural Matrix of the Birth of Bangladesh", *Journal of the Department of Political Science*, University of Chittagong, Vol. II. 1979-85.

Chandra, Amitabha "The Naxalbari Movement", *The Indian Journal of Political Science,* Vol. 51, No. 1, Jan to March 1990.

Maniruzzaman, T. — "Crisis in Political Development and the Collapse of the Ayub Regime", *The journal of Development Areas,* Vol. V, January-1977.

Khaled, Mortuza — "Muzaffar Ahmad and the Meerut conspiracy case (1929-1933)" Rajshahi University, *Arts Faculty- Research Journal-* 1997-98.

Morshed, Golam — "Ayub Khan's Autocratic Regime and East Pakistan Regionalism. A Political Analysis", *The Rajshahi University Studies,* (Part-A) Vol. XV, 1976.

Rahim, Enayetur — "Bengal Election 1937: Fazlul Haq and M.A Jinnah: A Study of Leadership Street in Bengal Politics", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh.* Vol. XXII, No.2, August 1977.

অপ্রকাশিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

অজিত কুমার দাস — "বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি : অতীত ও বর্তমান", অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৫।

মর্তুজা খালেদ — "বাংলাদেশে বাম রাজনীতি : রাজশাহী জেলা ভিত্তিক একটি সমীক্ষা, ১৯২০-২০০০, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

কমিশনের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত গবেষণা রিপোর্ট : ২০০৫।

মোঃ শাহজাহান "বাংলাদেশের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা (১৯৬৬-১৯৭১): একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ", অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৫।

মোঃ হাবিবুল ইসলাম "বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাম আন্দোলনের অবদান (১৯৪৭-১৯৭১) একটি বিশ্লেষণ", অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৮।

সায়েরা সালমা বেগম "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ছাত্রলীগ (১৯৪৮-১৯৭১) : মূলধারা পর্যালোচনা", অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯৫।

প্রকাশিত গ্রন্থ

অজয় রায় *বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১*, (ঢাকা : সাহিত্যিকা, বাংলাবাজার, এপ্রিল-২০০৩)।

অজয় ভট্টাচার্য *নানকার বিদ্রোহ*, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রকাশকাল, অক্টোবর, ১৯৯৯)।

অজয় দাশগুপ্ত *সংবাদপত্রে হরতালচিত্র ১৯৪৭-২০০০*, (ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনিস্টিটিউট, প্রকাশকাল, জানুয়ারি, ২০০১)।

অমল সেন *কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শগত বিতর্ক প্রসঙ্গে*, (ঢাকা : হিমালয় পাবলিশার্স, প্রকাশকাল, ১৯৮৫)।

অমল কুমার মুখোপাধ্যায় *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭)*, (কলকাতা : এ মুখার্জী কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯)।

অমলেন্দু দে স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনার প্রয়াস ও পরিণতি, কলিকাতা : রত্না প্রকাশন, প্রকাশকাল, ১৯৯২।

অমিতাভ চন্দ্র *অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন (সূচনা পর্ব)*, (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, প্রকাশকাল, ১৯৯২)।

অনিল বিশ্বাস (সম্পাদিত) *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য (প্রথম খণ্ড)*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল, অক্টোবর, ২০০২)।

অনিল বিশ্বাস (সম্পাদিত) *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য* (দ্বিতীয় খন্ড), (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল, সেপ্টেম্বর, ২০০৩)।

অনিল মুখার্জি *স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি*, (ঢাকা : স্বদেশ প্রকাশনী, প্রকাশকাল, বৈশাখ, ১৩৭৯)।

অলি আহাদ *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫*, (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২য় সংস্করণ, প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই)।

আইউব রেজা চৌধুরী *কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট রাজনীতি* (প্রথম খন্ড), (ঢাকা : অগ্রগামী প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০২)।

আমজাদ হোসেন *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, (ঢাকা : পড়ুয়া প্রকাশনী, শাহবাগ, প্রকাশকাল ১৯৯৭)।

আমজাদ হোসেন *বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা : পড়ুয়া প্রকাশনী, শাহবাগ, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি, ২০০২)।

আমজাদ হোসেন *নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলন*, (ঢাকা : পড়ুয়া প্রকাশনী, শাহবাগ, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি, ২০০২)।

আমজাদ হোসেন *বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), (ঢাকা : পড়ুয়া প্রকাশনী, প্রকাশকাল, অক্টোবর, ২০০৩)।

আমজাদ হোসেন *বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), (ঢাকা : পড়ুয়া প্রকাশনী, প্রকাশকাল, অক্টোবর, ২০০৩)।

আমজাদ হোসেন *উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি*, (ঢাকা : পড়ুয়া প্রকাশনী, প্রকাশকাল, সেপ্টেম্বর, ২০০০)।

আমজাদ হোসেন *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, (ঢাকা : পড়ুয়া, প্রকাশকাল, ১৯৯৬)।

আতাউর রহমান খান *স্বৈরাচারের দশ বছর*, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রকাশকাল, ১৯৭০)।

আতাউর রহমান খান *মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, প্রকাশকাল, ১৯৯৭)।

আবুল ওয়াহেদ তালুকদার *৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাণ্ডুলিপি*, (ঢাকা : প্রকাশকাল, ১৯৯১)।

আবুল ফজল হক — *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল, ১৯৮৮)।

আবুল মুনসুর আহম্মদ — *শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু*, (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশকাল, ১৯৮১)।

এ জে মোস্তফা সাদেক — *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন*, (ঢাকা : চলন্তিকা বই ঘর, প্রকাশকাল, ১৯৮৭)।

আব্দুল হক — *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ ১৯৫৩-১৯৯৩*, (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রকাশকাল, ১৯৯৬)।

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী — *বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা*, (ঢাকা : জ্যোস্না পাবলিশার্স, প্রকাশকাল, ১৯৯৮)।

আব্দুল মমিন চৌধুরী — *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮১)।

আবুল মুনসুর আহম্মদ — *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, প্রকাশকাল, ১৯৯৫)।

আব্দুল কাইয়ুম মুকুল — *সিপিবি'র রাজনীতি : একটি সমালোচনার সমালোচনা*, (ঢাকা : প্রাচ্য প্রকাশনী, প্রকাশকাল, ডিসেম্বর, ১৯৮৬)।

আলতাফ পারভেজ (সম্পা) — *অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ, কর্নেল তাহের ও জাসদ রাজনীতি*, (ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫)।

এম আর আখতার মুকুল — *আমি বিজয় দেখেছি* (কিশোর সংস্করণ), (ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)।

এম আর আখতার মুকুল — *পূর্ব পুরুষের সন্ধানে*, (ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, ২০০১)।

এম আর চৌধুরী — *ভারতবর্ষ-পাকিস্তান পর্বে ছিল না বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট পার্টি নাই*, (ঢাকা : এম আর চৌধুরী (ডলফিন এন্টারপ্রাইজ) কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৯)।

এম এম আকাশ — *ভাষা আন্দোলন : শ্রেণী ভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*, (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রকাশকাল, ১৯৯০)।

এম.এ. জলিল — *অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা*, (ঢাকা : অন্ত প্রকাশনী, ১৯৮০)।

কে.এম. শামসুল আলম — *বাংলাদেশের ছাত্রলীগের ইতিহাস*, (ঢাকা : মুন্নী প্রকাশনী, প্রকাশকাল, ১৯৯৩)।

খালেদা হাবিব — *বাংলাদেশ নির্বাচন জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা ১৯৭১-৯১*, (ঢাকা : প্রকাশকাল, ১৯৯১)।

খোকা রায় — *সংগ্রামের তিন দশক*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬)।

গোলাম এরশাদুর রহমান — *মুক্তি সংগ্রামে নেত্রকোনা*, (নেত্রকোনা : গোলাম কামরাজ কাফি গোলাম সাদ্দাম রাফি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৫)।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় — *সমাজতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা ও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন*, (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-১৯৯২)।

জগলুল আলম — *বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা (১৯৪৮-৮৯)*, (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশকাল, ১৯৯০)।

জসীম উদ্দীন মণ্ডল — *সংগ্রামী স্মৃতি কথা: জীবনের রেলগাড়ী*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, প্রকাশকাল, ১৯৯২)।

জি.পি. মিত্র — *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও চার নগরী*, (ঢাকা : নিখিল প্রকাশন, প্রকাশকাল, নভেম্বর, ২০০০)।

মো. মাহবুবর রহমান — *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৯)।

হারুন-অর-রশিদ — *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৯৫৭-২০০০*, (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১)।

তোফাজ্জল হোসেন — *পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর*, (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, প্রকাশকাল, ১৯৮৪)।

দেব কুমার — *আত্মদান*, (খুলনা : কানাই দেবনাথ কর্তৃক প্রকাশিত, মে, ১৯৯৭)।

দেবেন শিকদার — বাংলাদেশের কাউন্সিল বিভ্রান্তি ও কমিউনিস্ট ঐক্য প্রসঙ্গে, (ঢাকা : আব্দুল মজিদ কর্তৃক প্রকাশিত, শ্রাবণ, ১৩৮৬)।

দুলাল চট্টোপাধ্যায় — *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, (কলিকাতা : প্রগেসিভ পাবলিশার্স, প্রকাশকাল, ১৯৮৭)।

নিতাই দাস — *মোহাম্মদ ফরহাদঃ জীবন ও সংগ্রাম*, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রকাশকাল, ১৯৯০)।

নিতাই দাস — *বাংলাদেশের ছাত্র ইউনিয়ন: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, (ঢাকা : প্রকাশক রঞ্জন কর্মকার, প্রকাশকাল, ১৯৮৬)।

নিবেদিতা নাগ — *নেপাল নাগ : স্মৃতি চারণা*, (কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৯৬)।

নুরুল ইসলাম — *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০ বছর*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রকাশকাল, মার্চ-১৯৮৮)।

নুরুল ইসলাম — *যে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল, ১৯৯০)।

প্রমথ গুপ্ত — *যে সংগ্রামের শেষ নেই*, (কলিকাতা : কালান্তর প্রকাশনী, ১৯৬৮)।

বদরুদ্দীন উমর — *নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, প্রকাশকাল ১৯৮৩)।

বদরুদ্দীন উমর — পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড), ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রকাশকাল, মে-১৯৯৫।

বদরুদ্দীন উমর — *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রকাশকাল, জানু-১৯৯৬)।

বদরুদ্দীন উমর — পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খণ্ড), ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রকাশকাল, জুলাই-১৯৯৫।

বদরুদ্দীন উমর — পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ (কতিপয় দলিল, প্রথম খণ্ড), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুলাই-১৯৮৫)।

বদরুদ্দীন উমর — *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ* (কতিপয় দলিল, দ্বিতীয় খণ্ড), (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুলাই-১৯৮৫)।

বদরুদ্দীন উমর — *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো বাঙলাদেশের কৃষক*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল, জুন-১৯৯৮)।

বদরুদ্দীন উমর — *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রকাশকাল, এপ্রিল, ১৯৯৬)।

বদরুদ্দীন উমর — *সামরিক শাসন ও বাঙলাদেশের রাজনীতি*, (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩)।

বদরুদ্দীন উমর — *সাম্প্রদায়িকতা*, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ফেব্রু-৯৫)।

বদরুদ্দীন উমর — *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, (ঢাকা : ঐতিহ্য, ২০০০)।

বদরুদ্দীন উমর — *জনগণের সংগ্রামের পথ*, (ঢাকা : কাশবন প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০২)।

বদরুদ্দীন উমর — *সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক অগ্রগতি*, (কলিকাতা : ১৯৭১)।

বদরুদ্দীন উমর — *বাঙলাদেশে মার্কসবাদ*, (চট্টগ্রাম : বইঘর বিপণি বিতান, ১৩৮৯)।

বারীন দত্ত — *সংগ্রাম মুখর দিনগুলি*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রকাশকাল, ১৯৯১)।

বশির আল হেলাল — *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

বি. ইউ. কে জাহাঙ্গীর *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পাকিস্তান : পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র*, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, প্রকাশকাল, ১৯৯৩)।

ভ. ই লেলিন — *সর্বহারা বিপ্লবের সামরিক কর্মসূচি*, (মস্কো, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৯৮৬)।

ভি. পুচকভ — *সংগ্রামের পঁয়ত্রিশ বছর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি*, (ঢাকা : প্রাচ্য প্রকাশনী, ১৯৮৩)।

ভি. পুচকভ — *বাংলাদেশের রাজনীতিক গতিধারা*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)।

মঈনুল হাসান — *মূলধারা '৭১*, (ঢাকা : ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, প্রকাশকাল, ১৯৯৫)।

মফিদুল হক — ডেটলাইন বাংলাদেশ : নাইন্টিন সেভেন্টিওয়ান, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০২)।

মাও জে দং — *চীনের বিপ্লবী যুদ্ধে রণনীতির সমস্যা নির্বাচিত রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (পিকিং, ১৯৬৫)।

মাখন পাল — *গণঅভ্যুত্থানের সমস্যা*, (কলিকাতা : লোকায়ত সাহিত্য চক্র, ১৯৬৯)।

এম. কামাল ও ই. চক্রবর্তী *নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সমকালীন রাজনীতি ও ইলা মিত্র*, (ঢাকা:: মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনিস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১)

মেসবাহ্ কামাল	*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা*, (ঢাকা : গণপ্রকাশনী ও সমাজ চেতনা পাবলিশার্স, প্রকাশকাল-২০০১)।
মেসবাহ্ কামাল	*আসাদ ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান*, (ঢাকা: বিবর্তন, ১৯৮৬)।
মিজানুর রহমান	*সাপ্তাহিক বাংলাদেশ : মুক্তিযুদ্ধের ৭০ দিন*, (ঢাকা : ধ্রুপদ প্রকাশন, ১৯৯২)।
মণি সিংহ	*জীবন সংগ্রাম (১ম খণ্ড)*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৮৩)।
মণি সিংহ	*জীবন সংগ্রাম (২য় খণ্ড)*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৯২)।
মীর ইলিয়াছ হোসেন	*মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)*, (ঢাকা : লতিফা পারভীন পাপিয়া কর্তৃক প্রকাশিত,১৯৯৯)।
মুজাফ্ফর আহমেদ	*আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (প্রথম খণ্ড ১৯২০-১৯২৯)*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি,১৯৬৯)।
মুজাফ্ফর আহমেদ	*ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৮৯)।
মুজাফ্ফর আহমেদ	*কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৭৫)।
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রসুল	*সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী*, (ঢাকা : বর্তমান সময়, ২০০০)
মোহাম্মদ হান্নান	*বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, ১৮৩০-১৯৫২)*, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩)।
মোহাম্মদ হান্নান	*বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড, প্রাক মুক্তিযুদ্ধ পর্ব)*, (ঢাকা : গ্রন্থলোক প্রশাসন, প্রকাশকাল, ১৯৯১)।
মোহাম্মদ হান্নান	*বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (মুক্তিযুদ্ধপর্ব)*, (ঢাকা: গ্রন্থলোক, ১৯৯১)।
মোহাম্মদ হান্নান	বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (বঙ্গবন্ধুর সময়কাল), (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০)

মোহাম্মদ হান্নান	*বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (এরশাদের সময়কাল)*, (ঢাকা-১১০০ : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি, ২০০০)।
মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রসুল	*কৃষক সভার ইতিহাস*, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯০)।
মুহাম্মদ নূরুল কাদির	*দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, (ঢাকা : মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৮)।
মুহাম্মদ শামসুল হক	*চোখে দেখা ৭১*, (চট্টগ্রাম : নেহলিন প্রকাশন, ২০০৫)।
মোস্তফা কামাল	*ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বাহান্ন*, (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, প্রকাশকাল, ১৯৮৭)।
মোহাম্মদ ফরহাদ	*ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯)।
মনোরঞ্জন রায়	*সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলন*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৭)।
মোহাঃ রোকনুজ্জামান	*জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি*, (ঢাকা : মীরা প্রকাশন, ২০০৫)।
মৌলবী আব্দুল হান্নান	*আমার জীবনে কমিউনিস্ট পার্টি*, (ঢাকা : বাংলাদেশ বইঘর, ১৯৯৩)।
রইসউদ্দীন আরিফ	*আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন (তৃতীয় খণ্ড)*, (ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৮)।
রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী	*বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮)।
রণেন সেন	*ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবৃত্ত*, (কলিকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৬)।
রণেন সেন	বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ (১৯৩০-৪৮), (কলকাতা: বিংশ শতাব্দী, ১৯৮১)।
রেবতী বর্মণ	*সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৯)।
রেহমান সোবহান	বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্কট, (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৮২)।

লেওনিদ মিত্রখিন (অনু) *লেনিন ও ভারত*, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৯০)।

লরেন্স লিফশুলৎস অসমাপ্ত বিপ্লব (তাহেরের শেষ কথা), (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৬)।

লেলিন আজাদ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি, (ঢাকা : ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭)।

লে. কর্নেল এম.এ. হামিদ *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান*, (ঢাকা : মোহনা প্রকাশনী, ১৯৯৩)।

সরদার ফজলুল করিম *সেই যে কাল : কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, (ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০০২)।

সরল চট্টোপাধ্যায় *ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯২)।

সত্যেনসেন *বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম*, (ঢাকা : কালি কলম, ১৯৭৩)।

সত্যেন সেন *বাংলাদেশের কৃষকের আন্দোলন*, (ঢাকা : কালি কলম, ১৯৭৮)।

সত্যেন সেন *সত্যেন সেন : রচনা সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড)*, (ঢাকা : কেন্দ্রীয় সংসদ, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, ১৯৮৯)।

সাঈদ-উর রহমান *পূর্ব বাংলার রাজনীতি, ঢাকা, সংস্কৃতি ও কবিতা*, (ঢাকা : আগামী, প্রকাশকাল, ১৯৮৩)।

সেলিনা হোসেন *উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

সেলিনা রহমান *উনসত্তরের গণআন্দোলন*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯)।

সিরাজুল ইসলাম *বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩)।

সিরাজুল ইসলাম *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস)*, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০)।

সিরাজুল ইসলাম *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (দ্বিতীয় খণ্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস)*, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০)।

সিরাজুল ইসলাম — *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* (তৃতীয় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস), (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০)।

সিরাজুল ইসলাম — *বাংলাপিডিয়া* (তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম এবং অষ্টম খণ্ড), (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

সিরাজুল ইসলাম — *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, (ঢাকা : ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড)।

সিরাজুল ইসলাম — *স্বাধীনতার স্পৃহা সাম্যের ভয়*, (ঢাকা : ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৮)।

সিরাজুল ইসলাম — *আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ*, (ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫)।

সিরাজউদ্দীন হোসেন — *ইতিহাস কথা কও*, (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৪৭)।

সরোজ মুখোপাধ্যায় — *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, (প্রথম খণ্ড)*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৫)।

সরোজ মুখোপাধ্যায় — *সভাপতি মাও-সেতুঙের পাঁচটি দার্শনিক প্রবন্ধ*, (পিকিংঃ বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, ১৯৭২)।

সুস্নাত দাস — *ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা*, (কলিকাতা : প্রাইমা পালিকেশনস, ১৯৮৯)।

সুব্রত ব্যানার্জী — *বাংলাদেশ*, (নয়া দিল্লী : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৯)।

সুধাংশু দাশগুপ্ত — *আন্দামান জেল থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে*, (কলিকাতা : পত্রভারতী, প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই)।

সৈয়দ আবুল মকসুদ — *মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী*, (ঢাকা : হাক্কানি পালিসার্স, ২০০৩)।

সৈয়দ আবুল মকসুদ — *রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)

শরবিন্দু দস্তিদার — *জীবনস্মৃতি (প্রথম খণ্ড)*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯)।

শরবিন্দু দস্তিদার — *জীবনস্মৃতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০২)।

শামসুল হুদা চৌধুরী — *একাত্তরের রণাঙ্গন*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৮।

শামিম শিকদার — *সিরাজ শিকদার রচনাবলী (প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড)*, (ঢাকা, ১৯৮২)।

শেখ হাফিজুর রহমান — *বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট*, (ঢাকা : জোনাকী প্রকাশনী, ১৯৮৮)।

শেখর দত্ত — *কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন প্রসঙ্গ*, (ঢাকা : প্রাচ্য প্রকাশনী, ১৯৮৫)।

শেখর দত্ত — *সংগ্রাম সংগঠন ঃ অতীত ও বর্তমান*, (ঢাকা : সূচনা প্রকাশনী, ১৯৮৭)।

হায়দার আকবর খান রনো — *শতাব্দী পেরিয়ে*, (ঢাকা : তরফদার প্রকাশন, ২০০৫)।

হায়দার আকবর খান রনো — *বিবিধ প্রসঙ্গ*, (ঢাকা : তরফদার প্রকাশন, ২০০০)।

হায়দার আকবর খান রনো — *মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম*, (ঢাকা: গণমুক্তি প্রকাশনী, ১৯৮২)।

হাসান উজ্জামান — *বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের চেতনা ও মতাদর্শিক বিকাশ*, (ঢাকা : ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১)।

হাসান উজ্জামান — *উপমহাদেশে রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তা: স্রোতের বিপরীতে মূল্যায়ন*, (ঢাকা : বুক হাউজ, ১৯৮৯)।

হাসান হাফিজুর রহমান — *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র;* (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং পঞ্চদশ খণ্ড), (ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রকাশকাল, ১৯৮২)।

হাসান হাফিজুর রহমান — *একুশে ফেব্রুয়ারি*, (ঢাকা : পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ১৯৮৯)।

হাসানুল হক ইনু — *তিন দাগে ঘেরা*, (ঢাকা : পড়ুয়া, প্রকাশকাল, ২০০২)।

হেনা দাস — *নারী-আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯৯)।

হেনা দাস — *উজ্জ্বল স্মৃতি*, (ঢাকা : মানব প্রকাশন, ১৯৯৫)।

হুমায়ুন আজাদ — *ভাষা আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি*, (ঢাকা : ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০)।

জ্ঞান চক্রবর্তী — *ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ*, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৬৮)।

Adhikari, Gangadhar (ed) — *Documents of the History of the Communist Party of India, Vol. II (1923-1925)*, (New Delhi : Peoples Publishing house, Published in 1974).

Adhikari, Gangadhar (ed) *Documents of the History of the Communist Party of India, Vol. iii-c (1928)*, (New Delhi : Peoples Publishing house, December-1982).

Ahmed, A.F. Salauddin *Bangladesh Tradition and Transformation*, (Dhaka : University Press Limited, 1987).

Ahmed, Kamruddin *The Social History of East Pakistan*, (Dacca : Crescent Book Center, 1967).

Ahmed, Moudud *Bangladesh: Constitutional Quest of Autonomy 1950-1971*, Dacca : University Press Limited, 1979.

Ahmed, Muzzaffar *Communist Party of India: Years of Foundation 1921-1933*, (Calcutta : National Book Agency, 1959).

Ambedker, B.R. *Pakistan or the Partition of India*, (Bombay : Thackery, 1946).

Balaram, N.E. *A Short History of the Communist Party of India, India : Trivamdaum*, (Prabhath Book House, 1967).

Banerjee, Sumanta *In the Wake of Naxalbari, (A History of Naxalite Movement in India)*, (Calcutta : Subarnarekha.1983).

Banerjee, Tarun Kumar &
Chowdhury, Debesh Roy *Colonial India: Ideas and Movements, Essays in Memory of Professor Buddhadeva Bhattacharya*, (Calcutta : Progressive Publishers, 1992).

Banerjee, Tarun Kumer &
Chowdhury, Debesh Roy *Colonial India: Ideas and Movement*, Calcutta : (Progressive Publishers, Collage street, May-2001).

Bhuiyan, Md. A. Wadud *Emergence of Bangladesh and role of Awami League*, (Dhaka : University Press Limited, 1982).

Callard, K.B *Pakistan: A Political Study*, London: (George Allen and Unwin Ltd, 1957).

Chatterjee, Sisir *Bangladesh: The Birth of a Nation*, (Calcutta : The Book Exchange, 1972).

Choudhury, A.K. *The Independence of East Bengal*, (Jatiya Grantha Kendra, 1984).

Dimitrov, Georgi *Selected Speeches and Articles, (With an Introduction by Harry Pollitt)*, (London : Lawrence & Wishart Limited, 1951).

Feldman, Herbert *Evaluation in Pakistan: A Study of Martial Law Administration*, (London : Oxford University Press, 1967).

Feldman, Herbert *The End and the beginning: Pakistan 1969-71*, (London : Oxford University Press, 1975).

Haque, Mahmudul *The role of the USA in the India-Pakistan Conflict 1947-71*, (Dhaka : Academic Publishers, 1992).

Hnesh, Kumer Arun (ed) *Spring Thunder Over India (anthology of articles on Naxalbari)*,(Radical Impression : 1985).

Islam, Sirajul (ed) *History of Bangladesh 1704-1991, Vol-1, Political; Vol-2 Economies; Vol-3 Social and Cultural*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1997).

Lifschultz, Lawrance *Bangladesh: Unfinished Revoluation*, (London: Zed Press, 1971).

Khaled, Mortuza *A Study in leadership Muzaffar Ahmad and the Communist Movement in Bengal*, (Calcutta : Progressive Publishers, Published July-2001).

Majumder, Ashok *Peasant Protest in India Polities*, (New Delhi : Vir Publishing House 1993).

Maniruzzaman, Talukder *The Polities of Development: The Case of Pakistan, 1947-58*, (Dacca: Green Book House Ltd., 1971).

Maniruzzaman, Talukder *Bangladesh Revolution, and its After Math*, (Dacca: Bangladesh Books International Limited, 1980).

Mohanty, Manoranjan *Revolutionary Violence (A Study of Maoist Movement in India)*, (New Delhi : Sterling Publishers PVT,1976)

Muhith, A.M.A. *Bangladesh: Emergence of a Nation*, (Dacca : Bangladesh Books International Limited, 1978).

Overstreet, Gene & Windmiller, Marshall *Communism In India*, (University of Colifornia Press : 1959).

Patric, David *Communism in India 1924-27* (Calcutta;s Ghatak, 1972).

Rashid, Harun-or *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslin League and Muslim Polities 1936-1947*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1987).

Rashiduzzaman, M. *Pakistan: A Study of Government and Polities*, (Dacca : Ideal Library, 1967).

Saha, Panchanan *History of the Working Class Movement in Bengal*, (New Delhi: Peoples Publishing House 1978).

Saxena, K.C. *Pakistan: Her Relations with India 1947-1966*, (New Delhi: Vir Publishing House, 1966).

Sayed, Khalid Bin *The Political System of Pakistan*, (Boston : Houghton Mifflin, 1967).

Sen, Ranglal *Political Elites in Bangladesh*, (Dhaka : University Press Limited, 1986).

Sengupta, Jyoti *History of the Freedom Movement of Bangladesh 1943-1973 Some Involvement*, (Calcutta : Naya Prokash, 1947).

Singh, Moni *Life is a Struggle*, (New Delhi : People Publishing house, India, October-1988).

Umar, Budruddin *Polities and Society in East Pakistan and Bangladesh*, (Dacca, Mawla Brothers, 1973).

Umar, Budruddin *Society and Polities in East Pakistan*, (Calcutta : Paprrus, 1980).

Wheeler, R.S. *The Politics of Pakistan: A Constitutional Quest*, (Ithaca : Cornel University Press, 1970).

Zaheer, Hasan *The Separation of East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism*, (Dhaka : University Press Limited, 1994).

নির্ঘণ্ট

অ

অসিতবরণ রায় ২৪১, ২৪২, ২৮৩

অনিল মুখার্জী ৩৭, ৩৮, ৫৪, ৫৬, ২২৪

অলি আহাদ ১১২

আ

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ২৬২

আশু রায় ২৯, ৩০, ৩১, ৩৮, ৪০

আতাউর রহমান খান ১১২

আবুল হাসেম ১১২, ১১৩, ১১৭

আব্দুল মতিন ১১২

আব্দুল হক ১১৮, ১২৩, ১৪৭,

আব্দুল হালিম ৩৯, ৫১

আমজাদ হোসেন ৭১, ৭৪, ৭৫, ৮৪

আব্দুস সালাম ১১৩

ই

ইউনাইটেড ফ্রন্টনীতি ৬০, ৬১, ৭৬

ইলা মিত্র ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ২৬৫, ২৬৭

ইয়ং কমরেডস লীগ ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

এ

এন ভুট্টাচার্য ৩৯, ৪১

এস জি পাটকর ৫৯, ৬১

এম এল জয়মন্ত ৫৯, ৬০

ক

কালিদাস ভট্টাচার্য ৩৫, ৩৮,

কামরুদ্দীন আহম্মেদ ১১২, ১১৪, ১১৫

ক্লাইভ জুটমিল ৪৮

কৃষক সম্মেলন ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩

কেশোরাম কটন মিল ৪৫, ৪৭, ৪৮

খ

খাজা নাজিমুউদ্দীন ১১০, ১১১, ১১২, ১১৫

খালেক নেওয়াজ ১১০, ১১২

খোকা রায় ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭২, ৮৩, ৮৭, ১৭৭, ১৮২

গ

গণ ঐক্যজোট ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১০

গণতান্ত্রিক যুবলীগ ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৫
গণ আজাদী লীগ ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৫, ১১৬
গোপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ৩০, ৩১, ৩২, ৫৫, ৫৯
গোপাল বসাক ৩১, ৩৩, ৫১

ঘ
ঘরোয়া রাজনীতি ২১৭, ২১৮, ২২১, ২৩৫, ২৩৮

ছ
ছাত্র ইউনিয়ন ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২, ১৫৪, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৩, ১৭৩, ১৭৭, ১৭৯, ১৮২, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৯১
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬৩

জ
জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ১১৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ২০৫, ৩০৮, ৩১১, ৩১৪, ৩২৪
জাতীয় পরিষদ ৩২৬, ৩২৯, ৩৩২
জটাধারী বাবা ৪২, ৪৩, ৪৫

ঞ
জ্ঞান চক্রবর্তী ৩০, ১৪৯, ১৫০, ১৫৭, ১৫৮, ১৬১, ৩৩৯, ৩৪৭,

ট
টঙ্ক আন্দোলন ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ২৫০, ২৫১

ড
ডাক ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৯
ড. প্রভাবতী দাস গুপ্তা ৪৯, ৫০

ত
তমুদ্দুন মজলিশ ১১০, ১১১, ১১২
তায়া জিনকিন ৫১
তে-ভাগা ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৩৪৭

দ
দত্ত-ব্রাডলে থিসিস ৬১, ৬২
দালাল হালাল করো ৭৪, ৭৫
৬-দফা ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৫৪, ১৫৭, ১৬২, ১৬৩
৭ দলীয় জোট ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১

৮ দলীয় জোট ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১
১১-দফা ১৫৭, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৪, ১৭০, ১৭২

ধ
ধরণী গোস্বামী ৩০, ৩৮, ২২৩, ২২৪

ন
নলীন্দ্র মোহন সেন ৩০, ৩১, ৩৮, ৪০, ৪১
নীরোদ চক্রবর্তী ৩০, ৩১, ৩৮, ৪০, ৪২
নগেন সরকার ৩৩, ৩৭, ৩৮
নুরুল ইসলাম ১১৬, ১১৮
নলিনী গুপ্ত ২৯, ৩১

প
পিয়ারী মোহন দাস ৩০, ৩১, ৩৮
পি.মুখার্জি ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯
পিয়ের ডিলানি ১০৪

ফ
ফিলিপ স্প্রাট ৫৪, ৫৫
ফজলুল হক ১০২, ১০৩, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

ব
বাইদাকোভ ২৪৩, ২৪৪
বেতিয়ারা ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১
বি টি রণদীভ ৮৪, ৮৫, ১০৭
বারীন দত্ত ১০৮, ১৪৩

ম
মণি কৃষ্ণ সেন ১৬২, ১৬৪
মোহাম্মদ ফরহাদ ১১২, ১৩৭, ১৩৯, ১৫৯, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৬, ১৭৯, ১৮২, ১৮৪, ২৩৩, ২৩৫
মোহাম্মদ তোহয়া ১১২, ১১৩, ১১৫, ১৪৭
মওলানা ভাষানী ১১২, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১৭১
মন্টু মজুমদার ১০৮
মুজফফর আহমদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩৩
মনজুরুল আহসান খান ১৭৪, ১৮৫, ২২৪, ২৩৩, ২৩৯
মেথর ও ঝাঁড়ুদার আন্দোলন ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ২৫০
মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ১৭৮, ১৮০, ১৮৫, ২২৪, ২৩৩

মুসলিম লীগ ৭৬, ৭৮, ৮১, ৮৭, ৯৫, ১০০, ১০৪, ১১০, ১১১, ১১৭, ১১৮ ১২২, ১২৩, ১২৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৫৮
মীর্জা আব্দুস সামাদ ১০৮

য

যুক্তফ্রন্ট ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১২৮

র

রাজাকার আলবদর ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬

ল

এল.এফ.ও (Legal Framework Order-LFO) ১৬৪, ১৬৫
লাস্টিং পীস ৩৫, ৯৬

শ

শেখ মুজিবুর রহমান ১১৩, ১১৭, ১২৫, ১৩৪, ১৩৮, ১৪১, ১৫৭, ১৬৬, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৮৬
শামসুল হক ১১২
শচীন বসু ১০৯, ১১৭
শহীদুল্লাহ কায়সার ১০৮, ১৬৬, ১৭৯
শ্রমিক আন্দোলন ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৮,

স

সুধাংশুকুমার অধিকারী ৩৮, ৫৬
সতেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ৩৮
সুখেন্দু দস্তিদার ৪৪, ৯৬, ১০৯, ১১৩

হ

হাতিয়ার গ্রুপ ১৬৩, ১৬৪, ১৯৬, ২১৭, ৩৪৫
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১১৬, ১১৯, ১৪৩, ২১৭, ২৮১, ৩১৮

আলোকচিত্রে

মণি সিংহ

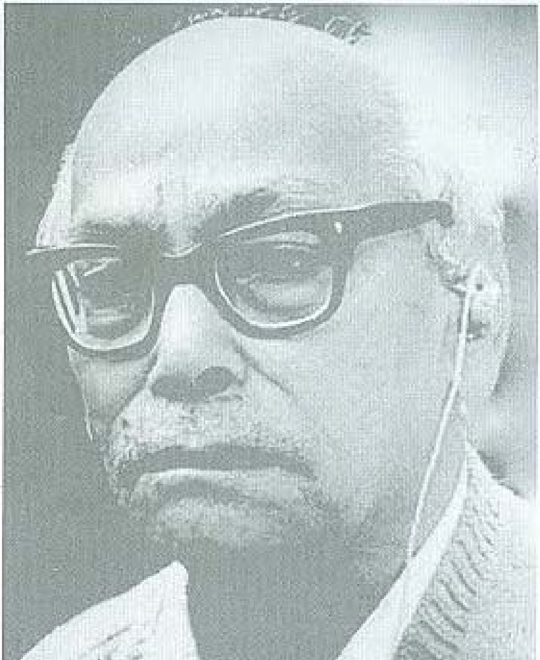

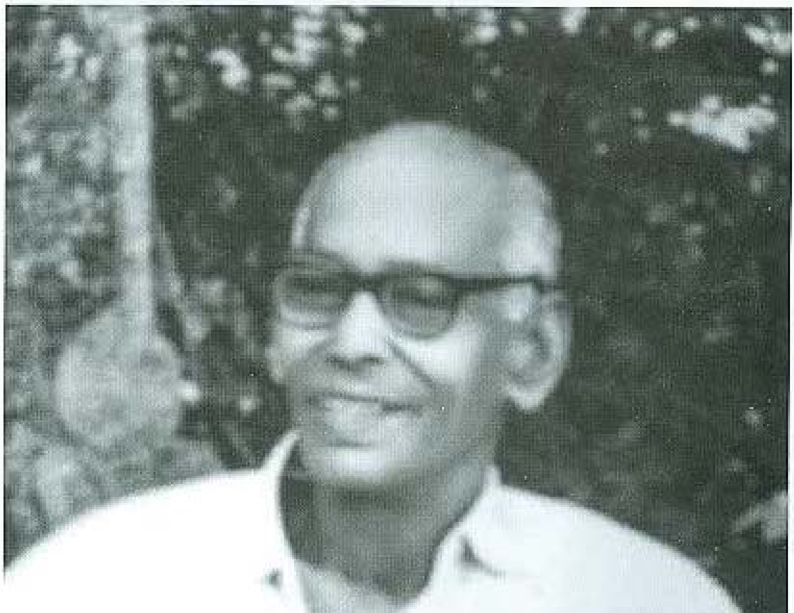

মণি সিংহ

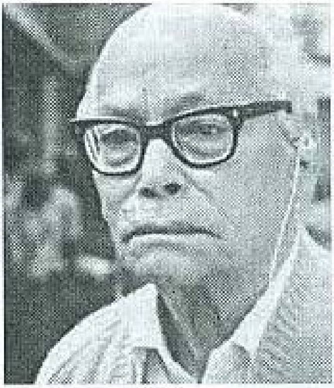

মণি সিংহ

মুজফ্ফর আহমেদ

এম এন রায়

রবি নিয়োগী

অনিল মুখার্জী

আলতাব আলী

ইলা মিত্র

ললিত সরকার প্রমথ গুপ্ত

নেপাল নাগ

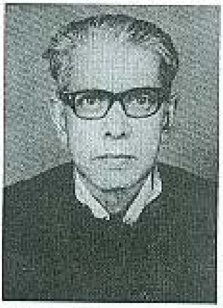

খোকা রায়

আব্দুস সালাম

অনিমা সিংহ

অমল সেন

মোহাম্মদ ফরহাদ

হেনা দাস

২০ বছর বয়সে মণি সিংহ

১৯৬৯ সালে কারামুক্তির পর জেলগেটে মণি সিংহকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় জনতা

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন পাকিস্তানি স্বৈরাচারি সামরিক সরকার কমরেড মণি সিংহসহ অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জেল থেকে বের হবার পর কমরেড মণি সিংহকে গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। ছবিতে কমরেড মণি সিংহ, কমরেড মন্মথ দে, কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জি, কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, কমরেড অমল সেনসহ অন্যান্য নেতাদের দেখা যাচ্ছে

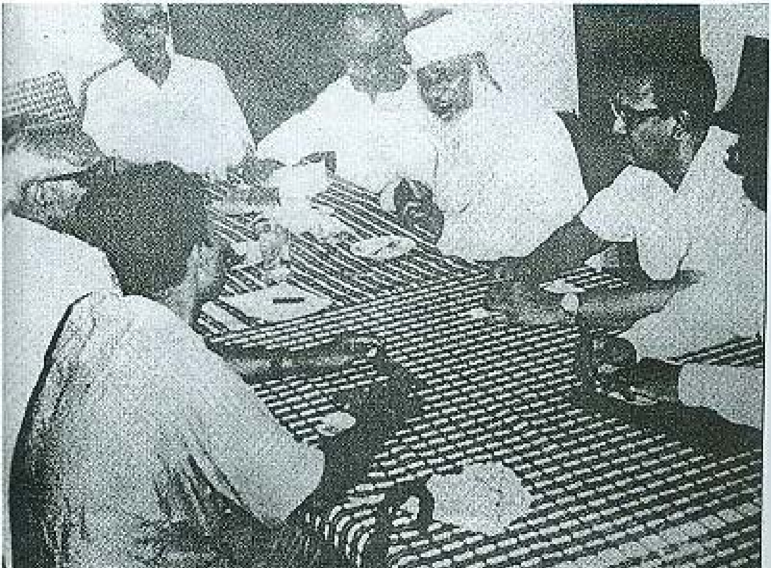

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গঠিত অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর বৈঠকে কমরেড মণি সিংহ, ১৯৭১

স্বাধীনতার পর ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম প্রকাশ্য মিছিল, ১৯৭২। মিছিলের অগ্রভাগে
সিংহ, কমরেড মো. ফরহাদ, কমরেড খোকা রায়, কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

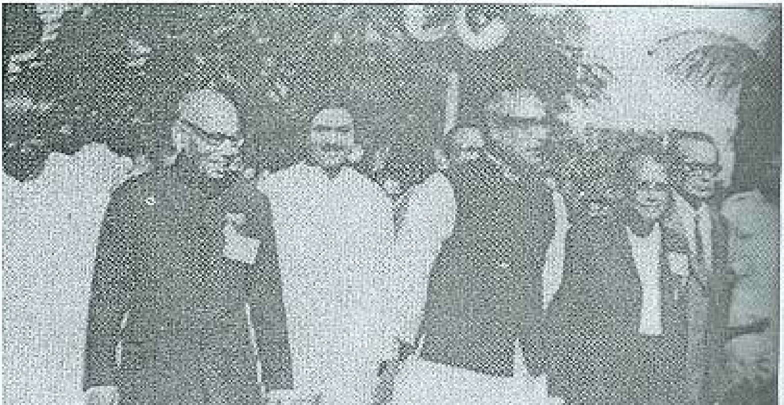

বাম দিক থেকে দ্বিতীয় কমরেড মণি সিংহ, ড. কামাল হোসেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
বারীন দত্ত, ১৯৭৩

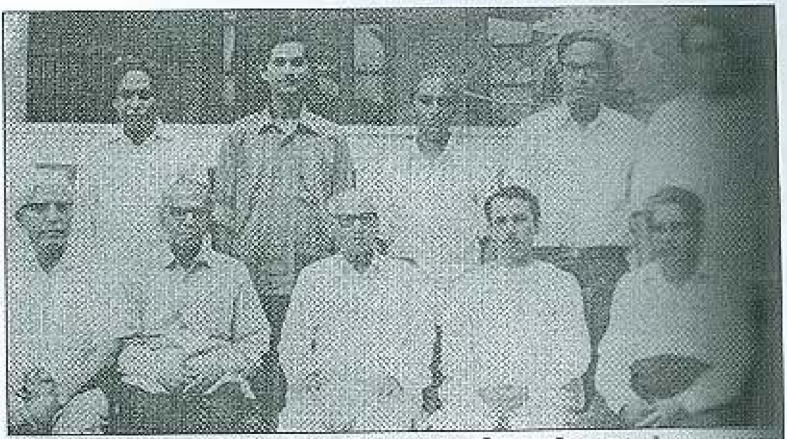

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলী। বাম দিক থেকে দাঁড়ানো [illegible] সর্বকমরেড আমজাদ হোসেন, নূরুল ইসলাম, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, অজয় রায়, [illegible] খান। বাম দিক থেকে বসা সর্বকমরেড অনিল মুখার্জী, খোকা রায়, মণি সিংহ, মো. ফরহাদ ও [illegible]

কমিউনিস্ট পার্টির সভা (১৯৭৩)। বক্তৃতা করছেন কমরেড মণি সিংহ। বাম থেকে বসা কমরেড বারীন দত্ত, কমরেড অনিল মুখার্জী ও কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস (১৯৭৩)। মঞ্চে বাম থেকে কমরেড মণি সিংহ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং কমরেড বারীন দত্ত

াংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ২০তম সম্মেলনে কমরেড গোপেন চক্রবর্তীর সাথে কমরেড মণি [illegible]
ানে মণি সিংহের বড় বোন কমরেড নির্মলা স্যান্যাল

১৯৭২ সালে পল্টনের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মণি সিংহ

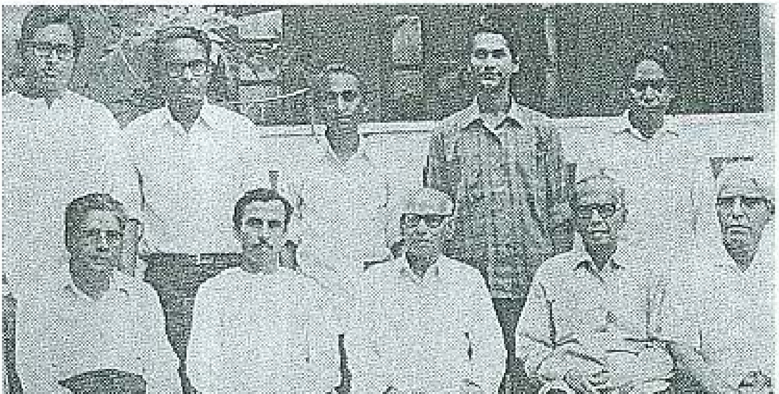

পার্টি নেতৃবৃন্দের সাথে মণি সিংহ

২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, শহীদ দিবস। ছবিতে কমরেড মো. ফরহাদ, কমরেড মণি সিংহ
কমরেড মো. নবী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

জনসভায় সুপরিচিত ভঙ্গিমায় বক্তৃতারত কমরেড মণি সিংহ। পাশে দাঁড়ানো কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম (বামে), কমরেড মো. ফরহাদ এবং কমরেড মনজুরুল আহসান খান (ডানে)

সোভিয়েত ইউনিয়নে সফরের সময়। সাথে কমরেড অনিমা সিংহ (১৯৭৫)

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে কমরেড আবদুস সালাম (ডানে) ও এ্যাড. রতন, ১৯৮০

যুব নেতৃবৃন্দ জন্মদিনে কমরেড মণি সিংহকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ছবিতে বাম থেকে সর্বজনাব মাহবুব জামান, অজয় দাশগুপ্ত, মু. হেলালউদ্দিন ও মোজাম্মেল হোসেন (১৯৮৭)

অন্তিম প্রস্থান : কমরেড মণি সিংহের মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা (১৯৯১)